THE FUNDAMENTALS OF

TAWHEED

এক

ড. আবু আমীনাহ বিলাল ফিলিপস

SEAN PUBLICATION

www.QuranerAlo.net

বইটি ভালো লাগলে অবশ্যই একটি Hard Copy সংগ্রহ করে অথবা লেখক বা প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানকে সৌজন্য মূল্য প্রদান করে সহযোগিতা করুন।

ভাষান্তর	আব্‌দ আল-আহাদ
সম্পাদনা	আবু তাসমিয়া আহমদ রফিক
শার'ই সম্পাদনা	ড. মোহাম্মদ মানজুরে ইলাহী
পৃষ্ঠা সজ্জা	মাস'উদ শারীফ
প্রচ্ছদ	মুহাম্মাদ শারীফুল 'আলম

www.QuranerAlo.net

এক

ড. আবু আমীনাহ বিলাল ফিলিপ্‌স

SEAN
PUBLICATION

সিয়ান পাবলিকেশন লিমিটেড

www.QuranerAlo.net

এক

ড. আবু আমীনাহ বিলাল ফিলিপস

গ্রন্থসত্ব © সিয়ান পাবলিকেশন লিমিটেড

প্রথম বাংলা সংস্করণ
শা'বান ১৪৩৫ হিজরি। জুন ২০১৪
দ্বিতীয় মুদ্রণ : রজব ১৪৩৬ হিজরি। মে ২০১৫
তৃতীয় মুদ্রণ : জিলক্বদ ১৪৩৮ হিজরি। আগস্ট ২০১৭
চতুর্থ মুদ্রণ : শাওয়াল ১৪৩৯ হিজরি। জুলাই ২০১৮
পঞ্চম মুদ্রণ : জুমাদা'উল উলা ১৪৪০ হিজরি। ফেব্রুয়ারি ২০১৯

ISBN: 978-984-33-6881-2

www.seanpublication.com

+88 01781183501

প্রকাশক কর্তৃক সর্বসত্ব সংরক্ষিত। প্রকাশকের লিখিত অনুমতি ব্যতীত বইটির কোনো অংশ যেকোনো উপায়েই হোক ইলেক্ট্রনিক বা প্রিন্ট মিডিয়ায় পুনঃপ্রকাশ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। স্ক্যান করে ইন্টারনেটে আপলোড করা বা ফটোকপি বা অন্য কোনো উপায়ে প্রিন্ট করা অবৈধ এবং আইনত দণ্ডনীয়। বইটির অনুমোদিত অনলাইন সংস্করণ কিনুন। কপিরাইটকৃত বই বেআইনিভাবে কিনে চৌর্যবৃত্তিকে উৎসাহিত করবেন না। ধন্যবাদ।

'EK'-Bengali version of Fundamentals of Tawheed by Dr. Abu Ameenah Bilal Philips, translated by Abd Al-Ahad, edited by Abu Tasmiya Ahmed Rafique, reviewed by Dr. Manzur-E-Elahi, published by Sean Publication Limited of Bangladesh.

সিয়ান পাবলিকেশন লিমিটেড
দোকান নং ৩, দ্বিতীয় তলা
ইসলামী টাওয়ার, বাংলা বাজার, ঢাকা।
+88 01753 344 811

www.QuranerAlo.net

ইসলামে গ্রন্থস্বত্বের বিধান

গ্রন্থস্বত্ব ইসলামি শারী'আহ কর্তৃক সংরক্ষিত একটি স্বতঃসিদ্ধ বিষয়। ইসলাম প্রত্যেক লেখকের রচিত সকল রচনাকে তাঁর ব্যক্তিগত সম্পদ বলে ঘোষণা করেছে এবং এতদসংশ্লিষ্ট সার্বিক অধিকারও তাঁর জন্য সংরক্ষণ করেছে। পাশাপাশি কেউ যেন গ্রন্থস্বত্ব আইন লঙ্ঘন করে তাঁর সে অধিকার হরণ কিংবা রহিত করতে না পারে, সে নিশ্চয়তাও বিধান করেছে। ইসলামি শারী'আতের সকল দলিল-প্রমাণ ও মূলনীতি সে প্রমাণই বহন করছে।

গ্রন্থ রচনা গ্রন্থকারের নিজেরই বুদ্ধিবৃত্তিক শ্রমের ফসল ও অর্জন। এ অর্জন একান্তভাবে তাঁরই। তাঁর অনুমতি ছাড়া অন্য কেউ কোনোভাবেই তাঁর এ সম্পদ ব্যবহার করতে পারবে না। রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

"কোনো মুসলিম ব্যক্তির সম্পদ সে নিজে খুশিমনে প্রদান না করলে কারও জন্য কোনোভাবেই তা হালাল হবে না।"

[সুহীহ আল-জামি' আস্-সগীর, হাদীস নং ৭৬৬২]

অতএব গ্রন্থকারের অনুমতি ছাড়া তাঁর রচিত গ্রন্থ হতে আংশিক বা পূর্ণ নকল করা, ছাপানো ও তা বেচাকেনা করা ইসলামি শারী'আতে নিষিদ্ধ ও হারাম; কেননা তা অন্যায় উপার্জন ও ভক্ষণের শামিল। আল্লাহ ﷻ বলেন,

"...তোমরা পরস্পরের সম্পদ অন্যায়ভাবে খেয়ো না।"

[আল-বাক্বারাহ, ২:১৮৮]

অধিকন্তু এটা শারী'আতের সীমালঙ্ঘন বলে গণ্য হবে বিধায় শারী'আতের নিষিদ্ধ কাজেরই অন্তর্ভুক্ত হবে। আল্লাহ ﷻ বলেন,

"...তোমরা সীমালঙ্ঘন করো না; কেননা আল্লাহ সীমালঙ্ঘনকারীদের পছন্দ করেন না।"

[আল-মা'ইদাহ, ৫:৮৭]

www.QuranerAlo.net

সূচিপত্র

প্রতিবর্ণীকরণ তালিকা ১১
প্রকাশকের কথা ১৩
মুখবন্ধ ১৭

প্রথম অধ্যায় ২৩
তাওহীদের প্রকারভেদ ২৩
তাওহীদ আর-রুবূবিয়্যাহ্ ২৮
তাওহীদ আল-আসমা' ওয়াস-সিফাত ৩৩
তাওহীদ আল-ইবাদাহ্ ৩৯

দ্বিতীয় অধ্যায় ৪৯
শির্কের প্রকারভেদ ৪৯
রুবূবিয়্যাহ্ সংশ্লিষ্ট শির্ক ৫০
আল-আসমা' ওয়াস-সিফাত সংশ্লিষ্ট শির্ক ৫৭
'ইবাদাত সংশ্লিষ্ট শির্ক ৬০

তৃতীয় অধ্যায় ৬৭
আদামের সাথে আল্লাহর অঙ্গীকার ৬৭
বারযাখ ৬৭
সৃষ্টির পূর্বাবস্থা ৬৯
মানুষের প্রকৃতিগত স্বভাবঃ ফিত্‌রাহ্ ৭৩
জন্মসূত্রে মুসলিম ৭৬

চতুর্থ অধ্যায় ৮১
জাদুটোনা ও শুভ-অশুভ লক্ষণ ৮১
জাদুটোনা ৮২
জাদুটোনা সম্পর্কিত বিধান ৮৬
ফা'ল (শুভ লক্ষণ) ৯৫
শুভ-অশুভ লক্ষণ বিষয়ে ইসলামের বক্তব্য ৯৬

www.QuranerAlo.net

Contents

পঞ্চম অধ্যায়	১০১
ভাগ্য গণনা করা	১০১
জিনদের জগৎ	১০২
ভাগ্য গণনার ব্যাপারে ইসলামি বিধান	১১১
গণকের কাছে যাওয়া	১১১
গণকের কথা বিশ্বাস করা	১১৩
ষষ্ঠ অধ্যায়	১১৭
জ্যোতিষশাস্ত্র	১১৭
মুসলিম জ্যোতিষীদের যুক্তি	১২১
রাশিচক্রের ব্যাপারে ইসলামের বিধান	১২৩
সপ্তম অধ্যায়	১২৭
জাদুবিদ্যা	১২৭
জাদুর বাস্তবতা	১২৮
জাদুবিদ্যার ব্যাপারে ইসলামের বিধান	১৪১
অষ্টম অধ্যায়	১৪৫
ঊর্ধ্বে থাকা	১৪৫
তাৎপর্য	১৪৬
সর্বব্যাপিতা মতবাদের বিপজ্জনক দিক	১৪৯
সুস্পষ্ট প্রমাণ	১৫১
সারসংক্ষেপ	১৬২
নবম অধ্যায়	১৬৭
আল্লাহর দর্শন লাভ	১৬৭
আল্লাহর প্রতিচ্ছবি	১৬৭
নাবি মুহাম্মাদ ﷺ কি আল্লাহকে দেখেছিলেন?	১৭১
শয়তান নিজেকে আল্লাহ বলে দাবি করে	১৭২
সূরা আন-নাজ্‌ম এর তাৎপর্য	১৭৪

www.QuranerAlo.net

Contents

আল্লাহকে দেখতে না পাওয়ার পেছনে প্রজ্ঞা ১৭৫
পরকালে আল্লাহকে দেখতে পাওয়া ১৭৬
নাবি মুহাম্মাদ ﷺ এর দর্শন লাভ ১৭৯

দশম অধ্যায় ১৮৩
পির-আউলিয়া পূজা ১৮৩
আল্লাহ প্রদত্ত শ্রেষ্ঠত্ব ১৮৩
তাক্বওয়া ১৮৬
অলিঃ 'সাধক' ১৯০
ফানাঃ স্রষ্টার সাথে মানুষের একীভূত হওয়া ১৯৫
মানুষের সাথে স্রষ্টার একীভূত হওয়া ২০০
রূহুল্লাহঃ 'আল্লাহর আত্মা' ২০৩

একাদশ অধ্যায় ২১১
কবরপূজা ২১১
মৃতের কাছে প্রার্থনা করা ২১২
ধর্ম সম্পর্কে বিবর্তনবাদী মতবাদ ২১৮
ধর্মের অধঃপতনবাদী রূপরেখা ২২০
শির্ক যেভাবে শুরু হয় ২২৩
পুণ্যবানদের মাত্রাতিরিক্ত প্রশংসা করা ২২৫
কবর জিয়ারাতের ক্ষেত্রে বিধি-নিষেধ ২২৭
কবরস্থানকে 'ইবাদাতের স্থান হিসেবে গ্রহণ করা ২৩৩
যেসব মাসজিদে কবর আছে ২৩৫
নাবির কবর ২৩৬
নাবি ﷺ-এর মাসজিদে সলাত আদায় করা ২৩৯

শেষ কথা ২৪১
গ্রন্থপঞ্জি ২৪৪

www.QuranerAlo.net

প্রতিবর্ণীকরণ তালিকা

আরবি হার্ফ	বাংলা প্রতিবর্ণ	আরবি হার্ফ	বাংলা প্রতিবর্ণ
أ-ء	’	ض	দ্
آ-ىٰ	আ-া	ط	ত্
ب	ব	ظ	জ্
ت	ত	ع	‘
ة	হ/ত (পরে আরবি শব্দ থাকলে)	غ	গ
ث	স়	ف	ফ
ج	জ	ق	ক্
ح	হ্	ك	ক
خ	খ	ل	ল
د	দ	م	ম
ذ	য্	ن	ন
ر	র	هـ-ه	হ
ز	য	و	ও
س	স	و (স্বরচিহ্ন হিসেবে)	উ/ু
ش	শ	ي	ই
ص	স্	ي (স্বরচিহ্ন হিসেবে)	ঈ/ী

www.QuranerAlo.net

অর্ধস্বর ও স্বরচিহ্ন

আরবি হার্ফ	বাংলা প্রতিবর্ণ	আরবি হার্ফ	বাংলা প্রতিবর্ণ
أَوْ، ـَوْ	আও/আউ	أَيْ، ـَيْ	আই/আয়
ـَ ফাতহাহ	া	ـّ শাদ্দাহ	দ্বিত্ব অক্ষর
ـِ কাস্রাহ	ি	ـْ সুকূন	্ (হস্ চিহ্ন)
ـُ দাম্মাহ	ু		

বি:দ্র: خ ر ص ض ط ظ غ ق এই আটটি অক্ষরের পর ফাতহাহ এলে উচ্চারণানুগ বানান লেখার জন্য 'আ-কার' বর্জন করা হয়েছে।

www.QuranerAlo.net

প্রকাশকের কথা

ছেলেটি ছিল নামকরা বিতার্কিক। গিটার বাজাতে খুব ভালোবাসত। দেশের নামকরা বিজনেস স্কুলের গর্বিত ছাত্র। মিশনারি স্কুলে পড়াশোনার সুবাদে জীবনের সফলতার যে সংজ্ঞাটা ছোটবেলা থেকে তার মনে গাঁথা সেখানে অপার্থিব কিছুর জায়গা নেই। স্বাভাবিকভাবেই ধর্মালাপে তার আগ্রহ ছিল না। নামাজ পড়তে বললে বিরক্তিতে ভ্রূ কুঁচকে আসত। এই ছেলেটার হাতে একদিন ড. বিলাল ফিলিপস রচিত Fundamentals of Tawheed বইটি আসে। উলটে পালটে দেখতে দেখতে পড়া শুরু করে। পড়ার সময় তার যুক্তিবোধে বইয়ে আলোচিত প্রতিটি বিষয়ই আবেদন ফেলে।

সে আবেদনের প্রতিক্রিয়ায় ছেলেটির সামগ্রিক জীবনে একটি বড় পরিবর্তন আসে। গিটারের জায়গায় আসন করে নেয় আল-কুর'আন। চোস্ত ইংরেজির বদলে ছেলেটির মুখে তুবড়ি ফোটে আরবির। মাল্টিন্যাশনাল কোনো এক কোম্পানির সাপ-লুডু খেলার ছকের করপোরেট মইয়ে চড়ার বদলে সে আজ গভীর রাতে উঠে ইসলাম শেখে। সাধারণ মানুষকে শেখায়।

২০১৪ সালের কথা বলছি, রূপকথা নয়। কী এতটা বদলে দিতে পারে মানুষকে?

আল্লাহ কে সেটা জানা।

আল্লাহ কী নন সেটা জানা।

কে আল্লাহ নয় সেটা জানা।

আল্লাহ কী চান সেটা জানা।

আল্লাহ 'এক' মানে কী সেটা জানা।

এ জ্ঞানগুলোর সংকলনকে সংক্ষেপে বলে তাওহীদ। এটাই ইসলামের মূল ভিত্তি।

হাল আমলের ফরাসি দার্শনিক ঝাঁ বদ্রিলা তাঁর 'Simulacres et Simulation' বইটিতে আলাপ করেছেন সভ্যতার এক ধরনের বিবর্তনের

www.QuranerAlo.net

কথা। এমন একটা সময় ছিল যখন আসল আর নকলের ফারাক বেশ করা যেত। শিল্প বিপ্লবের পরে একটি আসলের অনেকগুলো নকল তৈরি হলো যেগুলো সবই দেখতে একরকম, সবই আসল নকল—একই কারখানায় তৈরি। এরপর পুঁজিবাদের বর্তমান জামানায় নকলের সম্ভার আর মিডিয়া মানুষকে ভুলিয়েই দিল আসল কাকে বলে।

বিবর্তনের এই মডেলটা ইসলাম দ্বারাও স্বীকৃত। আল্লাহ যে একমাত্র ইলাহ এবং রব্ সে বোধ নিয়েই প্রতিটি মানুষ জন্মগ্রহণ করে। প্রতিটি সমাজও আদিতে বিশুদ্ধ থাকে চেতনায়। ধীরে ধীরে তারা নকল মা'বুদ তৈরি করে নেয় তাদের দরকার মতো। এরপর আসল উপাস্য হারিয়ে যান—সাত নকলে আসল ভেস্তা হবেই। নকল মা'বুদের দরকার কী? আল্লাহ যে বিবেক দিয়েছেন তাকে সাত-পাঁচ বুঝিয়ে চুপ করিয়ে দেওয়া।

মানুষ যখন জানতে শুরু করে তখন বিবেক জাগতে শুরু করে। তাওহীদের ব্যাপারে জ্ঞানের সুবিধা হচ্ছে এটি মানুষকে ধাক্কা দেয়। আল্লাহর 'ইবাদাহ যে মানুষের নিছক কর্তব্য নয় বরং জীবনের সবচেয়ে বড় কর্তব্য এটা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়। পৃথিবীতে আসার উদ্দেশ্য যে 'ইবাদাতে আল্লাহর এককত্ব প্রতিষ্ঠা করা, এটা বোঝার পর অধুনা আমাদের যাপিত জীবন অর্থহীন মনে হবে। এতদিন করে আসা সব কিছু কি তবে মিথ্যা? তাওহীদকে বাদ দিয়ে ছোটবেলা থেকে শেখা এত সব নীতিকথাকে চটক মনে হতে থাকে। সাথে থাকে আক্ষেপের অন্তর্দহন—এত দিন কেন জানিনি? কেন শিখিনি? কেন চিন্তা করিনি? হৃদয়ের রুদ্ধ অর্গল খোলার নিমিত্তে এই বই। অপরের বিবেকের দোরে করাঘাত করার নিমিত্তে এ বই।

আমাদের এ বইটি ড. আবু আমীনাহ বিলাল ফিলিপস রচিত Fundamentals of Tawheed এর চতুর্থ বাংলা অনুবাদ। সম্ভবত, আল কুর'আনের পরে কোনো ভিন ভাষার বইয়ের এতগুলো অনুবাদ বেরোয়নি। পূর্বের অনুবাদগুলোতে এমন বেশ কিছু বিয়োজন-সংযোজন ছিল, যার জন্য ড. বিলাল ফিলিপসের অনুমোদন নেওয়া হয়নি। মূল লেখককে দেওয়া হয়নি তার প্রাপ্য সম্মানী। বাংলাদেশের প্রকাশনা জগতের খুব সাধারণ চিত্র হলেও এমনতর অনৈতিকতা প্রকাশনী সংস্থার বিশ্বমান অর্জন ব্যাহত করে। আর ইসলাম প্রচারকল্পে অনৈতিকতা প্রচারকারীর বিশ্বস্ততায় আঘাত করে।

www.QuranerAlo.net

আমরা দুটোর একটাও চাই না বিধায় চতুর্থ অনুবাদটি আমাদের আনতে হয়েছে। আশা করি, এ বইটি পড়ে সিয়ানের অনুবাদের গুণগত পার্থক্যটি পাঠকদের কাছে স্পষ্ট হবে।

তাওহীদের উপর সারা পৃথিবীতে প্রচুর বই আছে। এর অধিকাংশই আরবিতে লেখা। কিন্তু ড. বিলাল ফিলিপস-এর বহুজাতিক এবং বহুমাত্রিক অভিজ্ঞতা এই বইটিতে এমন কিছু দৃষ্টিভঙ্গি যোগ করেছে যা আরব বিশ্বের অনেক বড় স্কলারদের কাজেও দেখা যায় না। তুলনামূলক ধর্মতত্ত্ব, সংস্কৃতি এবং কৃষ্টির অন্তর্ভুক্তির কারণে এই বইটি অনন্য।

'আলি ﷺ বলেছিলেন, "মানুষ ঘুমাচ্ছে; যখন তাদের মৃত্যু হবে তখন তারা জেগে উঠবে।" আমরা মানুষকে মৃত্যুর আগেই বাস্তবতাতে নিয়ে আসতে চাই। 'এক' বইটি তার জন্য একটি প্রয়াস। মানুষের মাঝে আল্লাহর একত্বের বার্তাটি আমরা পৌঁছে দিতে চাই। এই প্রয়াসে সবাইকে স্বাগতম।

সিয়ান পরিবারের পক্ষে,

শরীফ আবু হায়াত অপু

www.QuranerAlo.net

মুখবন্ধ

একথা সর্বজনবিদিত যে, ইসলামের ভিত্তিই হলো তাওহীদ। যে বাক্যের মাধ্যমে একথার যথার্থ বহিঃপ্রকাশ ঘটে তা হলো, "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" (আল্লাহ ব্যতীত সত্য কোনো উপাস্য নেই)। অর্থাৎ সত্য ইলাহ হলেন একজন এবং শুধুমাত্র তিনিই 'ইবাদাতের যোগ্য। ইসলামি আকীদা অনুযায়ী, আপাতদৃষ্টিতে সহজ এই বাক্যটিই ঈমান (আল্লাহর প্রতি আন্তরিক বিশ্বাস) এবং কুফ্‌রের (অবিশ্বাস) মাঝে সীমারেখা নির্ধারণকারী সূত্র। তাওহীদের মূলনীতি অনুযায়ী ইসলামে সৃষ্টিকর্তার প্রতি বিশ্বাস হলো একত্ববাদী বিশ্বাস। ইহুদি ও খ্রিস্টান ধর্মসহ পৃথিবীর অন্যান্য একত্ববাদী ধর্মগুলোর মধ্যে ইসলামকেও একটি একত্ববাদী ধর্ম বলেই গণ্য করা হয়। তথাপি, ইসলামি একত্ব (তাওহীদ) অনুযায়ী খ্রিস্টান ধর্ম একটি বহু-ঈশ্বরবাদী ধর্ম এবং ইহুদি ধর্ম পৌত্তলিকবাদের একটি সূক্ষ্মরূপ।

তাই তাওহীদের বিষয়টি অত্যন্ত নিগূঢ় এবং তা মুসলিমদের মাঝেই আরও বেশি সচ্ছ ধারণার দাবি রাখে। তাওহীদের সচ্ছ ধারণা থাকাটা কেন এতটা জরুরি, তা একটি বিষয়ের মধ্যদিয়ে সুস্পষ্ট হয়ে যায়। আর তা হলো, ইবনু 'আরবির(১) মতো কিছু মুসলিম তাওহীদ বলতে বুঝেছিল, "আল্লাহ হলেন সবকিছু এবং সবকিছুই আল্লাহ; আল্লাহ ব্যতীত অন্য কিছুর অস্তিত্ব নেই।" অথচ বিশুদ্ধ ইসলাম অনুযায়ী, এই ধরনের সর্বেশ্বরবাদী বিশ্বাস হলো কুফ্‌র। মু'তাযিলাদের(২) মতো মুসলিমদের ধারণা অনুযায়ী,

---

(১) মুহাম্মাদ ইবনু 'আরবির জন্ম ১১৬৫ খ্রিস্টাব্দে স্পেনে এবং মৃত্যু ১২৪০ খ্রিস্টাব্দে দামেস্কে। তিনি নিজেকে আলোকপ্রাপ্ত এবং আল্লাহর সবচেয়ে সম্মানিত নামের জ্ঞানের অধিকারী বলে দাবি করেন। তিনি নিজেকে ওলীদের সীলমোহর বা সর্বশেষ ওলী বলে প্রচার করেন এবং তার কথা অনুযায়ী, তিনি ছিলেন নবীর চাইতেও উচ্চ মর্যাদার অধিকারী। তার মৃত্যু পরবর্তী কয়েকশত বছরে তার অনুসারীরা তাকে ওলীর মর্যাদায় উন্নীত করে এবং তাকে আশ-শাইখুল আকবার (সর্বোচ্চ পন্ডিত) বলে আখ্যায়িত করে। তবে অধিকাংশ ইসলামী শারী'আহ বিশেষজ্ঞের কাছে তিনি খারেজি বলে বিবেচিত। (H.A.R. Gibb and J.H. Kramer, Shorten Encyclopedia of Islam, (Ithaca, New York: Cornell University Press, 1956), Pp. 146-7)।

(২) উমাইয়্যা শাসনামলে (৮ম খ্রিস্টাব্দের শুরুর দিকে) ওয়াসিল ইবনু 'আতা এবং 'আমর ইবনু 'উবায়েদ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত একটি যুক্তিবাদী দার্শনিক গোষ্ঠী। একশ বছরেরও অধিকাল

www.QuranerAlo.net

তাওহীদ হলো, আল্লাহর সমস্ত গুণাবলিকে হরণ করে এই ঘোষণা দেওয়া যে, আল্লাহ সর্বত্র এবং সবকিছুতে বিরাজমান। কিন্তু এই ধরনের বিশ্বাসও বিশুদ্ধ ইসলাম দ্বারা প্রত্যাখ্যাত এবং ইসলাম বিরোধী বলে সাব্যস্ত। সত্যি বলতে, নাবি ﷺ-এর সময় থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত, বিশুদ্ধ ইসলাম থেকে বিপথগামী প্রায় সবগুলো গোষ্ঠীর বিপথগামিতা শুরু হয়েছিল তাওহীদ থেকে। যারাই ইসলামের ক্ষতি করার ও এর অনুসারীদের বিপথগামী করার চেষ্টা করেছে, তাদের সবার লক্ষ্য ছিল তাওহীদের মূলনীতিকে নিষ্ক্রিয় ও অকার্যকর করে দেওয়া। কারণ সকল নাবিগণ ইসলামের যে ঐশী বাণী নিয়ে এসেছিলেন, তার মূলকথাই ছিল তাওহীদ। তারা আল্লাহর সম্পর্কে এমন সব ধারণার প্রবর্তন করেছে, ইসলামের সাথে যার দূরতম সম্পর্কও নেই। একমাত্র আল্লাহর 'ইবাদাত থেকে মানুষকে দূরে সরিয়ে দেওয়াই এইসব মতবাদের লক্ষ্য। সৃষ্টিকর্তা সম্পর্কে এইসব পৌত্তলিকবাদী মতবাদকে মানুষ একবার গ্রহণ করে নিলেই এমন হাজারো ভ্রান্ত মতবাদ গ্রহণ করার ব্যাপারে তারা মানসিকভাবে প্রস্তুত হয়ে যায়। অবশেষে, ওসবের প্রতি বিশ্বাস মানুষকে আল্লাহর সত্যিকার 'ইবাদাতের আড়ালে তাঁর সৃষ্ট বস্তুর ইবাদত করতে প্ররোচিত করে।

নাবি ﷺ নিজেই মুসলিমদেরকে এই ধরনের বিপথগামিতার ব্যাপারে কঠোরভাবে হুঁশিয়ার করে গেছেন। কারণ পূর্ববর্তী জাতিরাও এসবের দ্বারা আক্রান্ত হয়েছিল। তাঁর প্রদর্শিত পথের উপর অটল থাকার জন্য তিনি তাদেরকে তাগিদ দিয়ে গেছেন। একদিন সাহাবিদের সাথে বসা অবস্থায় তিনি মাটিতে একটি সরলরেখা টানলেন। তারপর ওই রেখার উভয় পাশে আরও কিছু পার্শ্বরেখা টানলেন। সাহাবিরা এর তাৎপর্য জানতে চাইলে তিনি পার্শ্বরেখাগুলোর দিকে ইঙ্গিত করে বললেন, এগুলো পার্থিব জীবনের বিভিন্ন ভ্রান্ত পথ। তিনি আরও বললেন, প্রতিটি পথের মাথায় একটি শয়তান বসে আছে, যে মানুষকে ওই পথে ডাকছে। তারপর তিনি মাঝের সরলরেখাটির প্রতি ইঙ্গিত করে বললেন, এটি হলো আল্লাহর পথ। সাহাবিরা বিস্তারিত

ধরে এই দলটি আব্বাসীয় রাষ্ট্রের উপর প্রভাব বিস্তার করে এবং ১২ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ইসলামী চিন্তাধারার উপর তাদের প্রভাব বজায় রাখে। (Shorter Encyclopedia of Islam, Pp. 421-426)।

www.QuranerAlo.net

জানতে চাইলে তিনি বললেন, এটিই তাঁর পথ। তারপর তিনি নিম্নোক্ত আয়াত পাঠ করলেন,

وَأَنَّ هَٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ ۖ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ۚ

"আর এটাই আমার সঠিক সরল পথ, কাজেই তোমরা তার অনুসরণ করো, আর নানান পথের অনুসরণ করো না, করলে তা তোমাদেরকে তাঁর পথ থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলবে...।" (সূরা আন'আম; ৬:১৫৩)(৩)

অতএব, নাবি ﷺ যেভাবে শিক্ষা দিয়েছেন এবং তাঁর সাহাবিগণ যেভাবে বুঝেছেন, ঠিক সেভাবেই তাওহীদকে বুঝতে হবে; কেননা এর গুরুত্ব অপরিসীম। অন্যথায়, যে কেউ খুব সহজেই অসংখ্য ভ্রান্ত পথের কোনো একটিতে ঢুকে পড়বে; আবার একই সাথে নিজেকে তাওহীদবাদী বলে দাবিও করবে, সলাতও আদায় করবে, যাকাতও(৪) প্রদান করবে, হাজ্জও পালন করবে। প্রজ্ঞাময় আল্লাহ কুর'আনে এই বিষয়টির প্রতিই ইঙ্গিত করে বলেছেন:

وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُّشْرِكُونَ

"তাদের অধিকাংশই আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস করে, তবে (ইবাদতে) শির্ক করা অবস্থায়।" (সূরা ইউসুফ: ১২:১০৬)

কিন্তু সলাত, যাকাত, সাওম ও হাজ্জ কিংবা ইসলামি অর্থনীতি ও রাজনীতি বিষয়ে লেখা বইয়ের সংখ্যার সাথে তাওহীদ বিষয়ক পত্র-পুস্তিকার সংখ্যা তুলনা করলে একজন বাংলাভাষী পাঠকের নিশ্চিতভাবে মনে হবে যে, ইসলামে তাওহীদের গুরুত্ব একেবারেই সামান্য। পাঠকের এই ধারণা

(৩) এটি একটি হাদীসের বক্তব্য, যেটি ইব্ন মাস'উদ থেকে বর্ণিত এবং আন নাসা'ঈ, আহমাদ ও আদ-দারিমি এটি সংকলন করেছেন। আল-আলবানি হাদীসটিকে সহীহ বলে মত দিয়েছেন (কিতাব আস-সুন্নাহ, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ১৩, হাদীস নং ১৭)।

(৪) বাধ্যতামূলক বাৎসরিক দান।

www.QuranerAlo.net

আরও প্রবল হবে যখন সে ইসলাম বিষয়ক সবচেয়ে জ্ঞানগর্ভ একটি বই পড়তে গিয়ে দেখবে যে, পুরো বই জুড়ে ইসলামের বিভিন্ন স্তম্ভ সম্বন্ধে সবিস্তর আলোচনা থাকলেও, তাওহীদের জন্য মাত্র আধপৃষ্ঠা খরচ করা হয়েছে। অথচ ইসলামের ভিত্তিই হলো তাওহীদ, যার উপর অন্য সকল স্তম্ভ এবং বিধিবিধানগুলো প্রতিষ্ঠিত। যদি কারও তাওহীদ বিশুদ্ধ ও মজবুত না হয়, তাহলে ইসলামের বাকিটুকু ওই ব্যক্তির জীবনে কার্যত পৌত্তলিকবাদী আনুষ্ঠানিকতায় পরিণত হয়। নিঃসন্দেহে, মুসলিম-অমুসলিম নির্বিশেষে সবার মাঝে ক্রমবর্ধমান ভ্রান্ত আকীদার সংশোধনের জন্য এবং তাওহীদ বিষয়ক বই-পুস্তকের অপর্যাপ্ততা কাটিয়ে ওঠার জন্য এই বিষয়ে আরও অনেক বেশি গ্রন্থ প্রণয়ন ও অনুবাদ হওয়া দরকার।

এই বইটি বাংলা ভাষাভাষী পাঠকদের সামনে ইসলামি তত্ত্বের দৃষ্টিকোণ থেকে তাওহীদের গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলোর মৌলিক বিশ্লেষণ তুলে ধরার একটি ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা। বইটি আরবি ভাষায় লিখিত তাওহীদ বিষয়ক কালজয়ী বই, 'আল-আকীদাহ আত-তাহাউইয়্যাহ্'[৫]-এর আদলে লেখা হলেও, এই বইয়ে আমি ইচ্ছে করেই প্রাচীন শাস্ত্রীয় বিষয়াবলীর উপস্থাপনা থেকে বিরত থেকেছি, যেগুলো আজকের আধুনিক যুগের পাঠকদের জন্য অপ্রাসঙ্গিক অথবা প্রাসঙ্গিক হলেও পরিমাণে তা খুবই সামান্য।

মানারাত আর-রিয়াদ ইংলিশ মিডিয়াম ইসলামিক স্কুলে সপ্তম থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত তাওহীদ বিষয়ক পাঠদানের জন্য আমি যে পাঠ প্রণয়ন করেছিলাম, এই বইয়ের অধিকাংশ বিষয়বস্তু সেখান থেকেই নেওয়া হয়েছে। তাই ইচ্ছে করেই বইয়ের ভাষা প্রাঞ্জল রাখা হয়েছে। এই পাঠ্য বিষয়গুলোর পাশাপাশি আমার প্রস্তুতকৃত ফিক্‌হ (ইসলামী আইনশাস্ত্র), হাদীস্ (নাবির কথা, কর্ম, মৌন সম্মতি) এবং তাফসীর (কুর'আনের ব্যাখ্যা) বিষয়ক পাঠ্য উপকরণগুলো যুক্তরাষ্ট্র এবং ওয়েস্ট ইন্ডিজের মুসলিম জনগোষ্ঠীগুলোর মাঝে ব্যাপকভাবে প্রচারিত হয়েছে। ইতিবাচক সাড়া এবং এই ধরনের আরও বিষয়বস্তুর ব্যাপক চাহিদার উপর ভিত্তি করে, তাওহীদ বিষয়ক পাঠগুলোর মানোন্নয়ন এবং আরও কিছু উল্লেখযোগ্য বিষয়বস্তু সংযোজন করে একটি

---

(৫) ইব্ন আবিল-'ইয্য আল-হানাফি, শারহ্ আল-'আকীদাহ আত্-তাহাউইয়াহ, (বেরুত: আল-মাকতাব আল-ইসলামি, অষ্টম সংস্করণ, ১৯৮৪)

www.QuranerAlo.net

বই আকারে প্রকাশের সিদ্ধান্ত নিলাম। আমি দু'আ করি, আল্লাহ ﷻ যেন এই প্রচেষ্টাকে কবুল করেন এবং যারা এই বই পড়বেন তাদের সকলের জন্য কল্যাণপ্রদ করেন। কারণ সর্বোপরি আল্লাহর সন্তুষ্টিই আমাদের একমাত্র কাম্য এবং তাঁর ইচ্ছা ব্যতীত কোনো সাফল্য নেই।

আবু আমীনাহ বিলাল ফিলিপ্স

www.QuranerAlo.net

প্রথম অধ্যায়

তাওহীদের প্রকারভেদ

'তাওহীদ' এর আক্ষরিক অর্থ হলো, 'একীকরণ' বা কোনো কিছুকে এক করা, অথবা 'কারো একত্ব ঘোষণা করা।' শব্দটি আরবি ক্রিয়ামূল, 'ওয়াহ্হাদা' থেকে নির্গত, যার মৌলিক অর্থই হলো, এক হওয়া (To unite), এক করা (To unify) বা একীভূত করা (To consolidate)।[১] তবে এ শব্দটিকে মহান আল্লাহ সম্পর্কে (তাওহীদুল্লাহ) ব্যবহার করা হলে তার অর্থ হবে, আল্লাহর একত্বকে হৃদয়ঙ্গম করা; প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে তাঁর সাথে সম্পৃক্ত মানুষের যাবতীয় কর্মকাণ্ডে তাঁর একত্বকে অক্ষুণ্ণ রাখা।

ইসলামি পরিভাষায় তাওহীদ হলো এই বিশ্বাস পোষণ করা যে, মহান আল্লাহ তাঁর প্রভুত্ব, রাজত্ব ও কর্তৃত্বে এক ও একক, তাঁর কোনো অংশীদার নেই (রুবূবিয়্যাহ)। তিনি তাঁর জাত, সত্তা ও গুণাবলিতে সম্পূর্ণ নিরুপম, সাদৃশ্য ও তুলনাহীন (আসমা' ওয়াস-সিফাত) এবং নিরঙ্কুশ ও নিঃশর্ত 'ইবাদাত বা দাসত্ব লাভের যোগ্য একমাত্র সত্তা কেবল তিনিই। এক্ষেত্রে তাঁর কোনো সমকক্ষ বা প্রতিপক্ষ নেই (উলূহিয়্যাহ/ইবাদাহ)।

---

(১) জে.এম. কোয়ান, দ্যা হ্যানস-ওয়েহর ডিকশনারি অব মডার্ন রিটেন অ্যারাবিক, (স্পোকেন ল্যাঙ্গুয়েজ সার্ভিস ইনস., নিউ ইয়র্ক, ৩য় সংস্করণ, ১৯৭৬), পৃ. ১০৫৫।

(২) কুর'আন কিংবা হাদীসে কোথাও সরাসরি তাওহীদ' শব্দটির উল্লেখ নেই। তবে ৯ম হিজরিতে নাবি ﷺ, মুআয ইব্ন জাবালকে ইয়েমেনের গভর্নর হিসেবে প্রেরণের সময় তাকে বলেছিলেন, "তুমি খ্রিস্টান এবং ইহুদিদের (আহলুল-কিতাব) নিকট যাচ্ছ। তাই তোমার প্রথম কাজ হবে, তাদেরকে আল্লাহর একত্বের দিকে আহ্বান জানানো (ইউওয়াহ্হিদুল্লাহ)।" হাদীসটি ইব্ন 'আব্বাস থেকে বর্ণিত এবং বুখারিতে সংকলিত: মুহাম্মাদ মুহসিন খান, সহীহ্ আল-বুখারি (আরবি-ইংরেজি), রিয়াদ: মাকতাবা আর-রিয়াদ আল-হাদীসা, ১৯৮১, খণ্ড ৯, পৃ. ৩৪৮-৯, হাদীস নং ৪৬৯ এবং মুসলিম, আবদুল-হামিদ সিদ্দীকি, সহীহ্ মুসলিম, (ইংরেজি অনুবাদ), লাহোর: শাইখ মুহাম্মাদ আশরাফ পাবলিশার্স, ১৯৮৭, খণ্ড ১, পৃ. ১৪-৫, হাদীস নং ২৭। এই হাদীসে নাবি ﷺ যে ক্রিয়াপদটি ব্যবহার করেছিলেন তার ক্রিয়ামূল থেকে তাওহীদ ক্রিয়া বিশেষ্যটির উৎপত্তি হয়েছে।

www.QuranerAlo.net

এই তিনটি বিষয়ের উপর ভিত্তি করেই বিশেষজ্ঞ 'আলিমগণ তাওহীদকে তিন শ্রেণিতে ভাগ করেছেন। এর একটির সাথে অন্যটির সম্পর্ক এতটাই অবিচ্ছেদ্য যে, কেউ যদি এগুলোর কোনো একটি বাদ দেয়, তাহলে সে সামগ্রিকভাবেই তাওহীদের দাবি ও শর্ত পূরণে ব্যর্থ হবে। কেননা, এর কোনো একটি বাদ দেওয়া মানেই হলো শির্কে লিপ্ত হয়ে পড়া বা আল্লাহর সাথে অংশীদার সাব্যস্ত করা। ইসলামে এটা সুস্পষ্টভাবে মূর্তিপূজার মতোই জঘন্য অপরাধের শামিল।

তাওহীদের উল্লিখিত তিনটি শ্রেণিকে সাধারণত নিম্নোক্ত শিরোনামে বর্ণনা করা হয়ঃ

১. তাওহীদ আর-রুবূবিয়্যাহ্ঃ (প্রভুত্ব, প্রতিপালন, রাজত্ব ও কর্তৃত্বে আল্লাহর একত্ব অক্ষুণ্ন রাখা) অর্থাৎ স্বীকার করা যে, আল্লাহ এক এবং তাঁর সার্বভৌমত্বে কোনো অংশীদার নেই।

২. তাওহীদ আল-আসমা' ওয়াস-সিফাতঃ (আল্লাহ তাঁর নাম এবং গুণাবলিতে অনন্য) অর্থাৎ একথা স্বীকার করা যে, আল্লাহর নাম এবং গুণাবলিসমূহ অনুপম, অনন্য এবং অতুলনীয়।

৩. তাওহীদুল-ইবাদাহঃ (শুধুমাত্র আল্লাহর 'ইবাদাত বা দাসত্ব করা,) অর্থাৎ একথা স্বীকার করা যে, আল্লাহ ব্যতীত 'ইবাদাত লাভের যোগ্য আর কেউ নেই।[৩]

তবে তাওহীদের এই শ্রেণিবিভাগ নাবি ﷺ কিংবা তাঁর সহাবারাও করেননি। কারণ ঈমানের এত সহজ বিষয়টির এমন তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের কোনো প্রয়োজনই তখন ছিল না। তবে কুর'আনের আয়াত, নাবি ﷺ এর হাদীস ও তাঁর সহাবিদের বিভিন্ন ব্যাখ্যামূলক বক্তব্যের মধ্যে তাওহীদের এ সবগুলো উপাদানই বিদ্যমান রয়েছে। তাওহীদের প্রত্যেকটি শ্রেণিবিভাগ নিয়ে আরও বিস্তারিত আলোচনার সময় বিষয়টি সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে।

(৩) ইব্ন আবিল-ইয আল-হানাফি, শারহুল-আকীদাহ আত-তহাউইয়্যাহ, পৃ. ৭৪।

www.QuranerAlo.net

মিশর, বাইযান্টিয়াম, পারস্য এবং ভারতবর্ষে[৪] ইসলাম ছড়িয়ে পড়ার পর এসব ভূখণ্ডের মানুষেরা যখন তাদের আঞ্চলিক সংস্কৃতির সাথে ইসলামের আকীদাহ বিশ্বাসকে গুলিয়ে একাকার করে ফেলল, তখনই তাওহীদের মূলনীতির এমন তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিল। এসব অঞ্চলের ইসলামগ্রহণকারী মানুষদের মধ্যে তাদের পূর্ববর্তী ধ্যান-ধারণার কিছুটা হলেও যে থেকে যাবে, এটা অস্বাভাবিক নয়। বিভিন্ন ধর্ম থেকে আসা এসব নতুন মুসলিমদের কেউ কেউ তাদের আলোচনা এবং লিখনীতে সৃষ্টিকর্তা সম্পর্কে নিজেদের নানা রকম বিভ্রান্ত দার্শনিক মতামত প্রকাশ করতে লাগল। ফলে আল্লাহর এককত্বের সহজ-সরল এবং বিশুদ্ধ বিশ্বাস নিয়ে নানা রকম ভ্রান্তি ছড়িয়ে পড়ে। অনেকে এমনও ছিল, যারা ইসলাম গ্রহণের ভান করলেও গোপনে তারা কাজ করছিল ইসলামকে ধ্বংস করার হীন উদ্দেশ্যে। কারণ সামরিকভাবে ইসলামের সামনে দাঁড়ানোর সামর্থ্য তাদের ছিল না। এই ধরনের লোকেরা সক্রিয়ভাবে জনসাধারণের মাঝে আল্লাহ সম্পর্কে বিভ্রান্ত মতবাদ প্রচার শুরু করে; যাতে ইসলামের মূল ভিত্তি ঈমানকে ধ্বংস করে ক্রমান্বয়ে গোটা ইসলামি ব্যবস্থাকেই ধ্বংস করে ফেলা যায়।

ঐতিহাসিকদের মতে, মুসলিমদের মধ্যে 'কদর' বা ভাগ্যের ভালো-মন্দ নিয়ে সর্বপ্রথম ভ্রান্ত মতবাদ প্রচারকারী হলো সাউসান নামক এক ব্যক্তি। সে ছিল এক ইরাকি খ্রিষ্টান। সে বলত যে, মানুষ স্বাধীন ইচ্ছার অধিকারী এবং ভাগ্য বলে কিছু নেই। এই সাউসান পরবর্তীতে আবারও খ্রিস্টধর্মে ফিরে যায়। তবে যাওয়ার আগে সে বস্‌রার অধিবাসী তার এক ছাত্র, মাবাদ ইব্‌ন খালিদ আল-জুহানিকে তার ভ্রান্ত মতবাদে বেশ ভালোভাবে দীক্ষিত করে রেখে যায়। ৭০০ সালে উমাইয়্যা খলিফা আবদুল-মালিক ইব্‌ন মারওয়ান (৬৮৫-৭০৫) এর শাসনামলে গ্রেফতার হয়ে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত সে তার সেই বিকৃত মতবাদ প্রচার করতে থাকে।[৫] আব্দুল্লাহ ইব্‌ন উমার (মৃত্যু ৬৯৪) এবং আব্দুল্লাহ ইব্‌ন আবি আওফা ﷺ (মৃত্যু ৭০৫) এর মতো অল্প কতিপয় সাহাবিই তখন জীবিত ছিলেন। তারা বলতেন যে, ভাগ্য অস্বীকারকারীদেরকে যেন কেউ সালাম না দেয় এবং তারা মারা গেলে

(৪) দক্ষিণ এশিয়া, যেমন: বর্তমানের বাংলাদেশ, পাকিস্তান, ভারত ইত্যাদি।
(৫) ইব্‌ন হাজার, তাহযীব আত-তাহযীব, (হায়দ্রাবাদ, ১৩২৫-৭), খণ্ড ১০, পৃ. ২২৫।

www.QuranerAlo.net

কেউ যেন তাদের জানাযাও না পড়ে। তাদের এ অবস্থান থেকে এটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, ভাগ্য অস্বীকারকারীকে তারা কাফির মনে করতেন।[৬]

তথাপি, মানুষের স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি থাকার এ খ্রিষ্টীয় দর্শনের সমর্থক সংখ্যা আস্তে আস্তে ঠিকই বাড়তে থাকে। দামেস্কের অধিবাসী গাইলান ইব্ন মুসলিম, মাবাদের কাছে পড়াশোনা করে এবং খলিফা উমর ইব্ন আব্দুল-আযীযের (৭১৭-৭২০) বিচারের মুখোমুখি হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত সেও ছিল এই মতবাদের গোঁড়া সমর্থক। পরে সে জনসম্মুখে তার মত প্রত্যাহার করে নিলেও, খলিফার মৃত্যুর পরই সে আবারও সেই মতবাদ প্রচার শুরু করে দেয়। পরবর্তী খলিফা হিশাম ইব্ন আব্দুল-মালিক তাকে গ্রেফতার করে বিচারের মাধ্যমে তার মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করেন।[৭]

এই মতবাদের আরেকজন উল্লেখযোগ্য সমর্থকের নাম হলো আল-জাআদ ইব্ন দিরহাম। সে শুধু সমর্থকই ছিল না; বরং প্লেটোর নিষ্কাম প্রেমের আধুনিক দর্শনের আলোকে আল্লাহর গুণাবলি সম্পর্কিত কুর'আনের আয়াতসমূহের পুনঃব্যাখ্যার অপচেষ্টা চালায়। আল-জাআদ একসময় উমাইয়্যা যুবরাজ মারওয়ান ইব্ন মুহাম্মাদের গৃহশিক্ষক ছিল। পরবর্তীতে এই যুবরাজ চৌদ্দতম খলিফা (৭৪৪-৭৫০ সাল) হন। আল-জাআদ দামেস্কে তার বিভিন্ন বক্তৃতায় আল্লাহর দেখা, শোনা ইত্যাদিসহ আরও কিছু গুণাবলিকে প্রকাশ্যে অস্বীকার করে।[৮] এরপর উমাইয়্যা গভর্নর তাকে দেশ থেকে বের করে দেন। এরপর সে কুফায় পালিয়ে যায়। সেখানেও সে তার মতবাদের প্রচার অব্যাহত রাখে। পাশাপাশি ভক্ত-সমর্থক জড়ো করতে থাকে। অবশেষে, তার ভ্রান্ত মতবাদ ব্যাপকভাবে জানাজানি হয়ে পড়লে, ৭৩৬ সালে উমাইয়্যার গভর্নর খালিদ ইব্ন আব্দুল্লাহ প্রকাশ্যে তার মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করেন। তবে তার প্রধান শিষ্য, জাহ্‌ম ইব্ন সাফওয়ান তিরমিয ও বাল্‌খের দার্শনিক মহলে তার গুরুর মতবাদের পক্ষে প্রচারণা অব্যাহত

---

(৬) আব্দুল-কাহির ইব্ন তাহির আল-বাগদাদী, আল-ফারক্ বাইনাল-ফিরাক, (বৈরুত: দারুল মারিফাহ), পৃ. ১৯-২০।

(৭) মুহাম্মাদ ইব্ন আব্দুল-কারিম আশ শাহরাস্তানি, আল-মিলাল ওয়ান-নিহাল, (বৈরুত: মারিফাহ, ২য় সংস্করণ, ১৯৭৫), খণ্ড ১, পৃ. ৩০।

(৮) আহ্‌মাদ ইব্ন হানবাল। আর-রাদ্দ্ আলাল-জাহমিয়্যাহ, (রিয়াদ: দারুল লিওয়া, ১ম সংস্করণ, ১৯৭৭), পৃ. ৪১-৩।

www.QuranerAlo.net

রাখে। পরবর্তীতে উমাইয়্যার গভর্নর, নাসর ইবন সাইয়্যার, ৭৪৩ সালে তারও মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করেন।[৯]

ইসলামের প্রথম যুগের খলিফা এবং তাঁদের প্রশাসকগণ ছিলেন ইসলাম সম্পর্কে যথেষ্ট সচেতন। অধিকন্তু, জনসাধারণের মাঝে নাবি ﷺ এর সহাবিগণ এবং তাঁদের ছাত্রদের উপস্থিতির কারণে সাধারণ মানুষও বেশ সচেতন ছিলেন। এজন্যই শাসকগণ ইসলামদ্রোহীদের নির্মূলের দাবির প্রতি তাৎক্ষণিক সাড়া দিতেন। পক্ষান্তরে, পরবর্তী উমাইয়্যা খলিফারা ছিল অনেক বেশি দুর্নীতিগ্রস্ত। দীনি বিষয়ে তাদের আগ্রহ ছিল একেবারেই কম। ফলে সাধারণ মানুষের মাঝেও সচেতনতা অনেক কমে যায়। পরিণতিতে ভ্রান্ত মতবাদের দ্বারা তাদের প্রভাবিত হয়ে পড়ার আশঙ্কাও বেড়ে যায়। বিজিত বিভিন্ন দেশ ও অঞ্চলের অজস্র মানুষের ইসলাম গ্রহণ করার কারণে তাদের আঞ্চলিক ও পূর্ববর্তী ধর্মের নানা রকম ধ্যান-ধারণা, রেওয়াজ-প্রথা ইসলামে অনুপ্রবেশ করে। পরিস্থিতি অনেকটা বদলে যায়। ভ্রান্ত মতবাদের প্রাদুর্ভাব প্রতিহত করতে ইসলামত্যাগীদের শাস্তি হিসেবে মৃত্যুদণ্ডের বিধানটিও একেবারে শিথিল হয়ে পড়ে। একারণে ইসলামদ্রোহী বিদআতীদের প্রতিহত করার এ মহান দায়িত্ব এসে বর্তায় মুসলিম মনীষীদের উপর। তারা তখন বুদ্ধিবৃত্তিক উপায়ে পরিস্থিতি মোকাবেলার চেষ্টা করেন। বিভিন্ন উদ্ভট বিশ্বাস আর দর্শনকে চিহ্নিত করে, কুর'আন এবং সুন্নাহ থেকে প্রাপ্ত মূলনীতির দ্বারা তার পাল্টা জবাব দিয়ে, ব্যক্তিগতভাবে জ্ঞানভিত্তিক পন্থায় তারা তা প্রতিহত করতে সচেষ্ট থাকেন।

ভ্রান্ত বিশ্বাসের কুপ্রভাব থেকে ঈমান সুরক্ষার এই পদক্ষেপের ফলস্বরূপ শ্রেণিবিন্যাস, বিভিন্ন শাখা-প্রশাখার সংজ্ঞা ও উপাদান নিয়ে এ তাওহীদ তত্ত্ব ইসলামি জ্ঞান-বিজ্ঞানের সর্বপ্রধান বিষয় হিসেবে বিকাশ লাভ করে। বিষয়ভিত্তিক গবেষণা ও জ্ঞানচর্চার এই প্রক্রিয়া ইসলামি জ্ঞান-বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখাতেও দেখা যায়। যেমনটি হয়েছে আজকের বৈষয়িক জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায়। অতএব, নিজের ঈমানকে ভ্রান্তি থেকে বাঁচাতে হলে তাওহীদের প্রতিটি প্রকারকে পৃথকভাবে এবং গভীর মনোযোগের সাথে

---

(৯) মুহাম্মাদ ইবন আব্দুল-কারীম আশ শাহরাস্তানি, আল-মিলাল ওয়ান-নিহাল, খণ্ড ১, পৃ. ৪৬।

www.QuranerAlo.net

অধ্যয়ন করতে হবে। কোনোক্রমেই ভোলা যাবে না যে, প্রতিটি প্রকারভেদ একটি বৃহত্তর যৌগিক কাঠামোর অংশবিশেষ এবং এ কাঠামোই হলো গোটা ইসলামি জীবনব্যবস্থার মূল ভিত্তি।

তাওহীদ আর-রুবূবিয়্যাহ্

তাওহীদুর-রুবূবিয়্যাহ্‌র মূল কথা হলো এই বিশ্বাস পোষণ করা যে, যখন কোনো কিছুর অস্তিত্ব ছিল না, একমাত্র আল্লাহ ﷻই তখন সমস্ত কিছুকে অস্তিত্ব দান করেছেন এবং তিনি তাঁর সকল সৃষ্টির লালনপালন করেন। এজন্য তাঁর কারও কোনো সাহায্যের প্রয়োজন নেই। তিনিই সমগ্র সৃষ্টিকুলের একমাত্র প্রভু এবং তাঁর সার্বভৌম ক্ষমতাকে সত্যিকার অর্থে চ্যালেঞ্জ করার মতো কেউ নেই। আরবি ভাষায় সৃষ্টিকর্তা ও প্রতিপালক হওয়ার উভয় বৈশিষ্ট্য এক শব্দে বর্ণনা করার জন্য ব্যবহৃত শব্দটি হলো 'রুবূবিয়্যাহ্', যা মূল শব্দ "রব" থেকে নির্গত।

তাওহীদের এই প্রকার অনুযায়ী, একমাত্র আল্লাহই হলেন প্রকৃত শক্তি-ক্ষমতার মালিক। তিনিই সবকিছুকে সচল থাকার এবং বিকশিত হওয়ার শক্তি দিয়েছেন। তাঁর ইচ্ছা ব্যতীত সৃষ্টিজগতের কোথাও কিছু সংঘটিত হয় না। এই বাস্তব সত্যের স্বীকৃতিস্বরূপ, নাবি মুহাম্মাদ ﷺ প্রায়শ বিস্ময়ভরে বলতেন, 'লা হাওলা ওয়া লা কুওয়্যাতা ইল্লা বিল্লাহ।' (আল্লাহ ছাড়া কারো কোনো শক্তি নেই, ক্ষমতা নেই।

কুর'আনের অনেক আয়াতে আল্লাহর রুবূবিয়্যাহ্‌র প্রমাণ পাওয়া যায়। যেমন তিনি বলেন,

اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ ۖ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ

"আল্লাহ সবকিছুর স্রষ্টা আর তিনি সবকিছুর অভিভাবক এবং কার্যনির্বাহকারী।"

(আয-যুমার, ৩৯:৬২)

www.QuranerAlo.net

Contents

وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ

"তোমাদেরকে এবং তোমরা যা কিছু সৃষ্টি করো তার সবকিছুই আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন।" (আস-সফ্ফাত, ৩৭:৯৬)

وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ

"তুমি যখন নিক্ষেপ করেছিলে, তা তো তুমি নিক্ষেপ করনি; বরং আল্লাহই নিক্ষেপ করেছিলেন...।" (আল-আনফাল, ৮:১৭)(১০)

مَا أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ

"আল্লাহর অনুমতি ছাড়া কোনো বিপদ আসে না...।" (আত-তাগাবুন, ৬৪:১১)

তাওহীদুর-রুবূবিয়্যাহ্ সম্পর্কে নাবি ﷺ আরও বিস্তারিত ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তিনি বলেন,

> "জেনে রেখো! সকল মানুষও যদি তোমাকে সাহায্য করার জন্য একত্রিত হয়, তবে তারা তোমার জন্য কেবল ততটুকুই করতে পারবে, যতটুকু আল্লাহ তোমার জন্য পূর্বেই লিখে রেখেছেন। একইভাবে, সকল মানুষ যদি তোমার ক্ষতি করার জন্য সংঘবদ্ধ হয়, তবে তারা কেবল ততটুকু ক্ষতিই করতে পারবে, যতটুকু তোমার প্রতি ঘটবে বলে তিনি পূর্বেই লিখে রেখেছেন।"(১১)

কাজেই, মানুষ যা কিছুকে সৌভাগ্য বা দুর্ভাগ্য ভাবে, সেগুলো আসলে আল্লাহর পক্ষ থেকে পূর্বনির্ধারিত ঘটনা, যেগুলো তার পার্থিব জীবনের

---

(১০) বাদ্‌র প্রান্তরে যুদ্ধ শুরু হওয়ার পূর্ব মুহূর্তে, নাবি ﷺ হাতে কিছু ধুলা নিয়ে শত্রুদের উদ্দেশে ছুঁড়ে দেন। শত্রুবাহিনী অনেক দূরে অবস্থান করলেও আল্লাহ ওই ধুলা শত্রুদের চোখ পর্যন্ত পৌঁছে দেন। আয়াতে সেই অলৌকিক ঘটনার প্রতিই ইঙ্গিত করা হয়েছে।

(১১) ইবন 'আব্বাস ﷺ থেকে বর্ণিত এবং ইমাম তিরমিযি কর্তৃক সংকলিত। দ্রষ্টব্য : 'ইযিদ্দিন ইবরাহীম এবং ডেনিস জনসন-ডেভিস, an-Nawawi's Forty Hadeeth, (ইংরেজি অনুবাদ, দামেস্ক, সিরিয়া : The Holy Koran Publishing House. ১৯৭৬), পৃ. ৬৮, হাদীস্ নং ১৯।

www.QuranerAlo.net

পরীক্ষারই একটি অংশ। এই ঘটনাগুলো আল্লাহর নির্ধারিত নিয়ম অনুযায়ী সংঘটিত হয়ে থাকে। যেমন আল্লাহ ﷻ বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَّكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ

"হে মু'মিনগণ! তোমাদের স্ত্রী সন্তানদের মধ্যে কেউ কেউ তোমাদের শত্রু। কাজেই তোমরা তাদের ব্যাপারে সতর্ক হও।" (আত-তাগাবূন, ৬৪:১৪)

এর দ্বারা বোঝা যায়, পার্থিব জীবনের ভালো জিনিসের মাঝেও ঈমানের কঠিন পরীক্ষা নিহিত রয়েছে। অনুরূপভাবে, জীবনের সংকটময় পরিস্থিতিগুলোর মাঝেও পরীক্ষা নিহিত রয়েছে। নিম্নোক্ত আয়াতে এ বিষয়টিই উল্লেখ করা হয়েছে,

وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ ۗ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ

"নিশ্চয়ই আমি ভয়, ক্ষুধা, ধন-সম্পদ, জীবন ও ফল-ফসলের কিছু ক্ষয়ক্ষতি দ্বারা তোমাদেরকে পরীক্ষা করবো, তুমি ধৈর্যশীলদের সুসংবাদ দাও।"

(আল-বাক্বারাহ, ২:১৫৫)

কোন ঘটনা কী কারণে ঘটল, অনেক সময় তা ঘটনার কার্য-কারণ থেকে বুঝতে পারা যায়; কখনো আবার তা বোঝা যায় না। বিশেষ করে যখন বাহ্যত ভালো কাজের ফল মন্দ হয় এবং মন্দ কাজের ফল ভালো হয়। আল্লাহ ﷻ বিষয়টি স্পষ্ট করে বলেছেন যে, সীমিত জ্ঞানের কারণে বাহ্যিক এই অসঙ্গতির আড়ালে কী প্রজ্ঞা লুকিয়ে আছে, মানুষ তাৎক্ষণিকভাবে তা বুঝতে পারে না। তাই আল্লাহ ﷻ বলেন,

www.QuranerAlo.net

وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

"... হতে পারে কোনো বিষয় তোমরা অপছন্দ করছ অথচ তোমাদের জন্য তা কল্যাণকর। আর হতে পারে কোনো বিষয় তোমরা পছন্দ করছ অথচ তোমাদের জন্য তা অকল্যাণকর। আসলে আল্লাহই জানেন এবং তোমরা জানো না।"

(আল-বাক্বারাহ, ২:২১৬)

মানবজীবনের অনেক ঘটনাকে বাহ্যত দুর্ভাগ্যজনক মনে হলেও, অনেক সময়ই সেগুলো কল্যাণকর প্রতীয়মান হয়। আবার মানুষ ব্যাকুলভাবে পেতে চায় এমন অনেক কিছু তার জন্য ক্ষতিকর প্রমাণিত হয়। এমন অজস্র ঘটনার প্রবাহ নিয়েই মানুষের জীবন। এসব ঘটনা ঘটার পেছনে মানুষের তেমন কোনো হাত নেই। কারণ মানুষ কেবল তার সামনে উন্মুক্ত বিভিন্ন উপায়ের যে কোনো একটি অবলম্বন করতে পারে, নিজ থেকে নতুন কোনো উপায় সৃষ্টি করতে পারে না। অন্য কথায় বলা যায়, "মানুষ কামনা করে, আর আল্লাহ সিদ্ধান্ত নেন তাকে কী দিবেন।" কোনো কিছুকে আপাতদৃষ্টিতে 'সৌভাগ্য' বা 'দুর্ভাগ্য' যা-ই মনে হোক না কেন, চূড়ান্ত অর্থে উভয়ই আসে আল্লাহর পক্ষ থেকে। খরগোশের পা, চার পাতাবিশিষ্ট ক্লোভার, ইচ্ছা পূরণের হাড়, সৌভাগ্য সংখ্যা, রাশিচিহ্ন কিংবা বিভিন্ন লক্ষণ যেমন, ১৩ তারিখের শুক্রবার, আয়না ভেঙে যাওয়া, কালো বিড়াল ইত্যাদির মাধ্যমে ভাগ্যের ভালো-মন্দ হয় না। ইসলামে জাদুমন্ত্র এবং শুভ-অশুভ লক্ষণে বিশ্বাস করা জঘন্য পাপ, যা শির্কের বহিঃপ্রকাশ। কারণ এই ধরনের বিশ্বাস তাওহীদ আর-রুবূবিয়্যাহ্‌র সুস্পষ্ট লঙ্ঘন। বিশিষ্ট সহাবি উকবাহ্ ﷺ বর্ণনা করেন যে,

"একবার একদল লোক আল্লাহর রসূলের নিকট বাই'আত প্রদানের জন্য এল। তিনি তাদের সবার বাই'আত গ্রহণ করলেও একজন থেকে করলেন না। তারা তাদের সাথীর বাইআত প্রত্যাখ্যানের কারণ জানতে চাইলে তিনি বলেন, নিশ্চয়ই সে তাবিজ[১২] পরে আছে।' এরপর সে সত্যিই নিজের জামার ভেতর থেকে

(১২) সৌভাগ্য লাভ কিংবা দুর্ভাগ্য এড়ানোর জন্য যে মন্ত্রকবচ ব্যবহার করা হয়।

www.QuranerAlo.net

তাবিজটি বের করে ভেঙে ফেললো, অতঃপর বাইআত প্রদান করল। তারপর নাবি বললেন, যে ব্যক্তি তাবিজ ব্যবহার করল, সে শিরক করল।"(১৩)

দুর্ভাগ্য ঠেকানো বা সৌভাগ্য লাভের উদ্দেশ্যে গলায়, কোমরে, হাতে মাদুলি বা অন্য কোনোভাবে কুর'আনের আয়াতকে মন্ত্র-কবচ হিসেবে বহন করার সাথে মূর্তিপূজারীদের অনুরূপ আচরণের তেমন কোনো পার্থক্য নেই। নাবি ﷺ অথবা তাঁর সহাবিদের কেউই এভাবে কুর'আনকে ব্যবহার করেননি। একই সাথে নাবি ﷺ বলেছেন,

"যে কেউ ইসলামে এমন কিছু উদ্ভাবন করল যা ইসলামের নয়, তা প্রত্যাখ্যাত।"(১৪)

একথা সত্য যে, কুর'আনের 'আল-ফালাক' এবং 'আন-নাস' সূরা দুটি মূলত (জাদুমন্ত্রের কুপ্রভাব দূর করতে) ঝাড়ফুঁকের উদ্দেশ্যেই অবতীর্ণ হয়েছিল। তবে সেগুলোকে কীভাবে ব্যবহার করতে হবে, তার সঠিক নিয়ম নাবি ﷺ দেখিয়ে দিয়ে গেছেন। আইশাহ ﵂ বর্ণনা করেন,

"একবার তাঁর উপর জাদু করা হলে, তিনি আলি ইব্ন আবি তালিবকে সূরা দুটির প্রতিটি আয়াত পড়ে তাঁকে ফুঁক দিতে বলেন। তাছাড়াও তিনি যখন অসুস্থ হতেন, তখন তিনি নিজেই এমনটি করতেন।"(১৫)

তিনি কখনোই সূরা দুটিকে কিছুতে লিখে গলায় ঝোলাননি, বাহু বা কোমরেও বাঁধেননি অথবা অন্য কাউকে কখনো তেমনটি করতে বলেননি।

---

(১৩) ইমাম আহমাদ কর্তৃক সংকলিত।

(১৪) আইশাহ ﵂ থেকে বর্ণিত। বুখারি, (আরবি-ইংরেজি), খণ্ড ৩, পৃ. ৫৩৫, হাদীস নং ৮৬১; মুসলিম, (ইংরেজি অনুবাদ), খণ্ড ৩, পৃ. ৯৩১, হাদীস নং ৪২৬৬ এবং ৪২৬৭; আবু দাউদ, আহমাদ হাসান, সুনান আবি দাউদ (ইংরেজি অনুবাদ, লাহোর: শাইখ মুহাম্মাদ আশরাফ পাবলিশার্স, ১ম সংস্করণ, ১৯৮৪, খণ্ড ৩, পৃ. ১২৯৪)।

(১৫) আইশাহ থেকে বর্ণিত। বুখারি, (আরবি-ইংরেজি), খণ্ড ৬, পৃ. ৪৯৫, হাদীস নং ৫৩৫; মুসলিম, (ইংরেজি অনুবাদ), খণ্ড ৩, পৃ. ১১৯৫, হাদীস নং ৫৪৩৯-৪০।

www.QuranerAlo.net

তাওহীদ আল-আসমা' ওয়াস-সিফাত

তাওহীদের এই প্রকারটির পাঁচটি গুরুত্বপূর্ণ দিক রয়েছেঃ

১. আল্লাহর নাম এবং গুণাবলির একত্ব অক্ষুণ্ন রাখা

এর অর্থ হলো, আল্লাহর শানে শুধুমাত্র সেইসব নাম এবং গুণাবলিই ব্যবহার করতে হবে, যেগুলো আল্লাহ কিংবা তাঁর রসূল বর্ণনা করেছেন। অবশ্যই তাঁর নাম এবং গুণাবলিসমূহকে তার বাহ্যিক অর্থে গ্রহণ করতে হবে। কখনোই ভিন্ন কোনো ব্যাখ্যা দাঁড় করানো যাবে না। উদাহরণস্বরূপ, আল্লাহ কুর'আনে কাফির এবং মুনাফিকদের প্রতি তাঁর রাগান্বিত হওয়ার বর্ণনা দিয়ে বলেন,

وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ الظَّانِّينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ ۚ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ ۖ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ ۖ وَسَاءَتْ مَصِيرًا

"যেন তিনি শাস্তি দিতে পারেন মুনাফিক নারী-পুরুষ ও মুশরিক নারী-পুরুষকে যারা আল্লাহ সম্পর্কে মন্দ ধারণা পোষণ করে; তাদের উপরই অনিষ্টতা আপতিত হয়। আর আল্লাহ তাদের উপর রাগ করেছেন এবং তাদের লানত করেছেন, আর তাদের জন্য প্রস্তুত করেছেন জাহান্নাম; আর তা কতই না নিকৃষ্ট গন্তব্য!"

(আল-ফাত্হ, ৪৮:৬)

অতএব, রাগান্বিত হওয়া আল্লাহর একটি সিফাত। এটাকে মানবীয় দুর্বলতা আখ্যা দিয়ে কেউ কেউ তা থেকে আল্লাহকে মুক্ত করার চেষ্টা করেন। তারা বলেন, এখানে আল্লাহর 'রাগ' বলতে আসলে তাঁর দেওয়া শাস্তিকে বোঝানো হয়েছে। এমন অর্থ করা মারাত্মক ভুল। আল্লাহ যা বলেছেন তা-ই সত্য ও সঠিক এবং সেটাই হুবহু গ্রহণ করতে হবে। তবে হ্যাঁ, মনে রাখতে হবে যে, তাঁর রাগ কিছুতেই মানুষের রাগের মতো নয়। কেননা আল্লাহ ﷻ বলেছেন,

www.QuranerAlo.net

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ

"...তাঁর মতো কিছু নেই।" (আশ-শু'আরা', ৪২:১১)

তথাকথিত যুক্তিবাদী বিশ্লেষণকে তার যৌক্তিক সিদ্ধান্তে নিয়ে ঠেকালে তো আল্লাহর অস্তিত্বকেই অস্বীকার করা হয়। চিন্তার এই ধারাটিই মূলত নাস্তিক্যবাদের সূচনা করে। কারণ, আল্লাহ নিজেকে জীবন্ত বলে বর্ণনা করেছেন; আবার মানুষও জীবন্ত। অতএব, যুক্তিবাদী তর্ক অনুযায়ী, আল্লাহ জীবন্তও নন, তাঁর কোনো অস্তিত্বও নেই। এখানে আসল ব্যাপার হলো, আল্লাহর গুণাবলির সাথে মানুষের গুণাবলির সাদৃশ্য কেবল নামেই; মান বা মর্যাদায় নয়। আল্লাহর বৈশিষ্ট্য বা গুণাবলির কথা বলা হলে সেগুলোকে পরম অর্থেই বুঝতে হবে। কারণ বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলিতে আল্লাহ সব ধরনের মানবীয় ত্রুটি এবং দুর্বলতা থেকে মুক্ত ও পবিত্র।

২. আল্লাহর শানে নতুন কোনো নাম বা গুণাবলি আরোপ না করা

অর্থাৎ তাঁর শানে শুধুমাত্র সেইসব নাম ও গুণাবলিই ব্যবহার করা যাবে, যেগুলো তিনি নিজে নিজের জন্য ব্যবহার করেছেন। উদাহরণস্বরূপ, যদিও আল্লাহ বলেছেন, তিনি রাগান্বিত হন, তথাপি তাঁর শানে 'আল-গদীব'(রাগান্বিত) নাম ব্যবহার করা যাবে না। কারণ আল্লাহ কিংবা তাঁর রসূল কখনো তাঁর জন্য এই নাম ব্যবহার করেননি। বিষয়টি কারো কাছে হালকা মনে হতে পারে। তবে স্রষ্টা সম্পর্কে যাচ্ছেতাই মনগড়া বর্ণনা বন্ধ করে তাঁর মর্যাদা অক্ষুণ্ন রাখার জন্য এটা অপরিহার্য। আসলে অসীম স্রষ্টাকে সংজ্ঞায়িত করা সসীম মানুষের পক্ষে কখনোই সম্ভব নয়।

৩. আল্লাহর উপর কোনো সৃষ্টির বৈশিষ্ট্য আরোপ না করা

উদাহরণস্বরূপ, বর্তমান বাইবেল ও তাওরাতে রয়েছে যে, আল্লাহ ছয় দিনে মহাবিশ্ব সৃষ্টি করে সপ্তম দিনে বিশ্রাম নিতে নিদ্রা যান।[১৬] এ কারণেই,

(১৬) Genesis ২:২, "পরে ঈশ্বর সপ্তম দিনে আপনার কৃত কার্য হইতে নিবৃত্ত হইলেন, সেই দিনে আপনার কৃত সমস্ত কার্য হইতে বিশ্রাম করিলেন।" (Holy Bible, Revised Standard Version, Nelson, ১৯৫১), পৃ. ২।

www.QuranerAlo.net

ইহুদি এবং খ্রিস্টানরা সপ্তাহের শনি বা রবিবারকে বিশ্রামের দিন হিসেবে গ্রহণ করে। এদিনে কাজ করাকে তাদের ধর্মে পাপ হিসেবে দেখা হয়। এই ধরনের দাবির মাধ্যমে স্রষ্টার প্রতি তাঁর সৃষ্টির গুণাবলি আরোপ করা হয়। কারণ পরিশ্রমের ক্লান্তি দূর করার জন্য মানুষেরই বিশ্রাম ও ঘুমের প্রয়োজন হয়; আল্লাহর নয়।[১৭] বাইবেল ও তাওরাতের অন্যত্র বলা হয়েছে, স্রষ্টা তাঁর ভুল সিদ্ধান্তের জন্য অনুতপ্ত। ঠিক মানুষ যেমনটি নিজের ভুল বুঝতে পেরে অনুতপ্ত হয়।[১৮] অনুরূপভাবে, স্রষ্টাকে একটি আত্মা বললে, বা স্রষ্টার আত্মা আছে বলে দাবি করলে তাওহীদ আল-আসমা' ওয়াস-সিফাত পুরোপুরি বিনষ্ট হয়ে যায়। কুর'আনের কোথাও আল্লাহ নিজেকে আত্মা বলে উল্লেখ করেননি। নাবি ﷺ ও তাঁর হাদীসে এ ধরনের কিছু বলেননি। বাস্তব সত্য হলো, আত্মাকে মহান আল্লাহ তাঁর সৃষ্টির অংশ হিসেবে উল্লেখ করেছেন।[১৯]

আল্লাহর বৈশিষ্ট্য এবং গুণাবলি সম্পর্কে আলোচনা করার ক্ষেত্রে কুর'আনের যে মূলনীতিটি অবশ্যই অনুসরণ করতে হবে তা হলো:

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ

"তাঁর মতো কিছুই নেই; আর তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা।"

(আশ-শূ'আরা', ৪২:১১)

শোনা ও দেখা দুটি মানবীয় বৈশিষ্ট্য। কিন্তু মানুষের শোনা ও দেখা আর আল্লাহর শোনা ও দেখা মোটেই এক রকম নয়। আল্লাহর ক্ষেত্রে এটা এমনই তুলনাহীন ও পরিপূর্ণ যে, অন্য কারো সাথে তাঁর কোনো তুলনা চলে না। তাছাড়া, দেখা এবং শোনার জন্য মানুষের চোখ এবং কানের প্রয়োজন হয়; অথচ স্রষ্টার ক্ষেত্রে একথা বলা যাবে না। স্রষ্টা সম্পর্কে মানুষ কেবল ততটুকুই জানে, যতটুকু তিনি তাঁর নাবিদের মাধ্যমে মানুষকে জানিয়েছেন।

---

(১৭) পক্ষান্তরে, আল্লাহ কুর'আনে স্পষ্টভাবে বলেছেন যে, "তাঁকে তন্দ্রা ও নিদ্রা স্পর্শ করে না।" (আল-বাক্বারাহ, ২:২৫৫)

(১৮) Exodus ৩২:১৪, "তখন সদাপ্রভু আপন প্রজাদের যে অনিষ্ট করিবার কথা চিন্তা করিয়াছিলেন, সেই জন্য অনুতপ্ত হইলেন।" (Holy Bible, Revised Standard Version)

(১৯) এ সম্পর্কে আল্লাহ স্পষ্টভাবে বলেছেন যে : "তারা আপনাকে রূহ সম্পর্কে প্রশ্ন করে। বলুন, রূহ আমার রবের আদেশ থেকে।" (আল-ইস্‌রা, ১৭:৮৫)

www.QuranerAlo.net

মানুষের জ্ঞান একেবারেই সীমাবদ্ধ। এর বাইরে যাওয়ার কোনো ক্ষমতাই তার নেই। সে যদি তার নিজস্ব বুদ্ধিবৃত্তির দ্বারা স্রষ্টাকে বর্ণনা করতে যায়, তবে সে নির্ঘাত মহান স্রষ্টার উপর তাঁর সৃষ্টির বৈশিষ্ট্যকে আরোপ করে বসবে।

সচিত্র উপস্থাপনার প্রতি বিশেষ দুর্বলতার কারণে, খ্রিষ্টানরা চিত্র, খোদাই এবং ঢালাই কর্মের মাধ্যমে বিভিন্ন রকম মানবীয় প্রতিমূর্তি তৈরি করেছে। সেগুলোকে তারা স্রষ্টার প্রতিকৃতি বলে আখ্যায়িত করেছে। এসব প্রতিমূর্তিই সাধারণ মানুষের মাঝে যিশুখ্রিষ্টকে স্রষ্টা হিসেবে গ্রহণ করার দ্বার খুলে দিয়েছে। মানবীয় আকৃতির কাউকে যখন স্রষ্টা হিসেবে গ্রহণ করে নিতে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে, তখন যিশুখ্রিষ্টকে স্রষ্টা বলে মেনে নিতে তাদের আর কোনো সমস্যাই হয়নি।

৪. আল্লাহর কোনো গুণ বা বৈশিষ্ট্য মানুষের উপর আরোপ না করা

উদাহরণস্বরূপ, তাওরাতে (জেনেসিস ১৪:১৮-২০) উল্লিখিত শালেমের রাজা, মল্কীষেদক সম্পর্কে পল নিউ টেস্টামেন্ট-এ উল্লেখ করেছেন এবং যিশুখ্রিষ্ট ও মল্কীষেদক উভয়কেই তিনি অনাদি এবং অনন্ত বলে তাদের উপর স্রষ্টার বৈশিষ্ট্য আরোপ করেছেনঃ

"সেই যে মল্কীষেদক, তিনি শালেমের রাজা ও পরাৎপর ঈশ্বরের যাজক ছিলেন, আব্রাহাম যখন রাজাদের সংহার হইতে ফিরিয়া আসিলেন, তিনি তখন তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন, ও তাহাকে সমস্তের দশমাংশ দিলেন। প্রথমে তাহার নামের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করিলে তিনি ধার্মিকতার রাজা', পরে শালেমের রাজা' অর্থাৎ শান্তিরাজ; তাহার পিতা নাই, মাতা নাই, পূর্বপুরুষ নাই; কিন্তু তিনি ঈশ্বরের পুত্রের সদৃশীকৃত; তিনি নিত্যই যাজক থাকেন।"(২০)

"তদ্রূপ খ্রিষ্টও মহাযাজক হইবার নিমিত্ত আপনি আপনাকে গৌরবান্বিত করিলেন না, কিন্তু তিনিই করিয়াছিলেন, তিনি তাহাকে কহিলেন, "তুমি

(২০) Hebrews ৭:১-৩, (Holy Bible, Revised Standard Version).

www.QuranerAlo.net

আমার পুত্র, আমি অদ্য তোমাকে জন্ম দিয়াছি।" সেইরূপ অন্য গীতেও তিনি কহেন, "তুমিই মল্কীষেদকের রীতি অনুসারে অনন্তকালীয় যাজক।"[২১]

ইয়েমেনের যায়েদি সম্প্রদায় ব্যতীত শিয়া সম্প্রদায়ের প্রায় সকলেই তাদের 'ইমামদের' উপর স্রস্টার গুণাবলি আরোপ করেছে। তাদের মতে, ইমামগণ সকল প্রকার ভুলের উর্ধ্বে,[২২] তারা অতীত এবং ভবিষ্যতসহ অদৃষ্টের জ্ঞানের অধিকারী, তারা মানুষের ভাগ্য পরিবর্তনেও সক্ষম[২৩] এবং মহাবিশ্বের প্রতিটি অণু-পরমাণুর উপর তাদের নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা রয়েছে।[২৪] ইমামদের উপর স্রষ্টার গুণাবলি আরোপের মাধ্যমে তারা তাদেরকে স্বয়ং স্রষ্টার সমকক্ষ বানিয়ে ফেলেছে। কার্যত এর মাধ্যমে তারা তাদের ইমামদেরকে আল্লাহর আসনে বসিয়েছে।

৫. আল্লাহর গুণবাচক নাম দিয়ে মানুষের নাম রাখার ক্ষেত্রে 'আব্দ শব্দ ব্যবহার করা

আল্লাহর নামসমূহের একত্ব অক্ষুণ্ণ রাখার আরেকটি দিক হলো, আল্লাহর গুণবাচক নাম দিয়ে মানুষের নামকরণের ক্ষেত্রে অবশ্যই আল্লাহর গুণবাচক

---

(২১) Hebrews ৫:৫-৬, (Holy Bible, Revised Standard Version).

(২২) মুহাম্মাদ রিদা আল-মুযাফ্ফার তার বইতে লিখেছেন : "আমরা বিশ্বাস করি, নাবির মতো একজন ইমাম অবশ্যই ভুলের উর্ধ্বে, অর্থাৎ, জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত সিদ্ধান্তে বা কর্মে, ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃত ভুল বা অন্যায় করতে পারেন না। কারণ ইমামগণ ইসলামের সংরক্ষক এবং ইসলাম তাদের সংরক্ষণাধীন।" (শিয়া ইসলামের আক্বীদাহ্, (আমেরিকা : Muhammadi Trust of Great Britain and Northern Ireland, ২য় সংস্করণ, ১৯৮৩)। আরও দেখুন, সায়্যিদ সাঈদ আখতার রিজভীর লেখা, Islam, (Tehran : A Group of Muslim Brothers, ১৯৭৩), পৃ. ৩৫)

(২৩) আল-মুযাফ্ফার আরও বলেন : "আমরা মনে করি যে, ইমামদের প্রেরণা লাভের ক্ষমতা শ্রেষ্ঠত্বের স্বর্ণ শিখরে উন্নীত হয়েছে এবং আমাদের মতে, এই ক্ষমতা স্বর্গীয়। এর মাধ্যমে ইমাম যেকোনো স্থানে, যেকোনো সময়, যেকোনো বিষয়ের তথ্য তাৎক্ষণিকভাবে বুঝতে সক্ষম এবং কোনো পদ্ধতিগত চিন্তাভাবনা বা কোনো শিক্ষকের নির্দেশনা ছাড়াই স্বর্গীয় ক্ষমতার মাধ্যমে তিনি তা বুঝে থাকেন।"

(২৪) খোমেনি বলেন : "নিঃসন্দেহে ইমামের রয়েছে মর্যাদার অবস্থান, সুউচ্চ পদমর্যাদা, সৃষ্টিগত খেলাফত এবং সৃষ্টির প্রতিটি অণু-পরমাণুর উপর সার্বভৌম ও প্রভুত্বের ক্ষমতা।" (আয়াতুল্লাহ্ মুসভী আল-খোমেনি, আল-হুকুমাহ্ আল-ইসলামিয়্যাহ্, বৈরুত : আত-তালীআহ্ প্রেস, আরবি সংস্করণ, ১৯৭৯, পৃ. ৫২)

www.QuranerAlo.net

নামের পূর্বে আব্দ' (অর্থাৎ, দাস বা গোলাম) শব্দটি যুক্ত করতে হবে। এ শব্দ যুক্ত না করে তাঁর কোনো সৃষ্টিকে সেই নাম ধরে ডাকা যাবে না। তবে রউফ' কিংবা রহীম' এর মতো কিছু গুণবাচক নাম রয়েছে যেগুলোর শুরুতে আলিফ-লাম যুক্ত না করে কারো নাম হিসেবে ব্যবহার করা অনুমোদিত। যেমন শুধু রউফ' বা রহীম' বলা যাবে, কিন্তু আর-রউফ' বা আর-রহীম' কাউকে বলা যাবে না। এই ধরনের কিছু নাম স্বয়ং আল্লাহ আব্দ' যুক্ত করা ছাড়াই তাঁর নাবির ﷺ ক্ষেত্রে ব্যবহার করেছেনঃ

لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُم بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ

"নিশ্চয়ই তোমাদের মধ্য থেকে তোমাদের নিকট একজন রসূল এসেছেন, তোমাদেরকে যা পীড়া দেয় তা তাঁর জন্য কষ্টদায়ক। তিনি তোমাদের কল্যাণকামী, মু'মিনদের প্রতি স্নেহশীল (রউফ), করুণাপরায়ণ (রহীম)।"

(আত-তাওবাহ, ৯:১২৮)

তবে আলিফ লাম যুক্ত করে আর-রউফ (পরম স্নেহশীল) কিংবা আর-রহীম (পরম করুণাময়) ইত্যাদি নাম কেবল তখনই মানুষের নাম হিসেবে ব্যবহার করা যাবে, যখন তাদের পূর্বে আব্দ বসানো হবে। যেমন, আব্দুর-রউফ কিংবা আব্দুর-রহীম। কারণ শুরুতে আলিফ-লাম যুক্ত থাকলে, গুণবাচক এই নামগুলো পূর্ণতার এমন পরম স্তরকে বোঝায় যা শুধুমাত্র আল্লাহর জন্যই প্রযোজ্য। অনুরূপভাবে, আব্দুর-রসূল (রসূলের গোলাম), আব্দুন-নাবি (নাবির গোলাম), আব্দুল-হুসাইন (হুসাইনের গোলাম) ইত্যাদি নামের মাধ্যমে মানুষ নিজেকে আল্লাহ ছাড়া অন্যের গোলাম হিসেবে আখ্যায়িত করে। তাই এসব নাম রাখাও নিষিদ্ধ। একারণেই নাবি ﷺ মুসলিমদেরকে তাদের অধীনস্থদের আব্দি' (আমার দাস) বা আমাতি' (আমার দাসি) বলে সম্বোধন করতে নিষেধ করেছেন।[২৫]

(২৫) সুনান আবি দাউদ, (ইংরেজি অনুবাদ), খণ্ড ৩, পৃ. ১৩৮৫-৬, হাদীস নং ৪৯৫৭।

www.QuranerAlo.net

তাওহীদ আল-ইবাদাহ্

প্রথম দুই প্রকার তাওহীদের ব্যাপক গুরুত্ব ও তাৎপর্য থাকলেও, এর দাবি পূরণের জন্য শুধুমাত্র এগুলোতে বিশ্বাস করাই যথেষ্ট নয়। তাওহীদের দাবি পূরণের জন্য তাওহীদুল-ইবাদাহ হলো তাওহীদ আর-রুবূবিয়্যাহ্ ও তাওহীদ আল-আসমা' ওয়াস-সিফাত অবিচ্ছেদ্য পরিপূরক। কারণ আল্লাহ নিজেই বলেছেন যে, নাবি ﷺ এর সময়ের পৌত্তলিকরা প্রথম দুই প্রকার তাওহীদের অনেক বিষয়ই স্বীকার করত। পৌত্তলিকদের বলার জন্য কুর'আনে আল্লাহ ﷻ তাঁর নাবি ﷺ কে বলেন,

قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ ۚ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ

"বলো, আসমান ও যমীন থেকে কে তোমাদের রিয্ক দেন? অথবা কে (তোমাদের) শ্রবণ ও দৃষ্টিসমূহের মালিক? কে মৃত থেকে জীবিতকে বের করেন, আর জীবিত থেকে মৃতকে বের করেন? কে সব বিষয় পরিচালনা করেন? তখন তারা অবশ্যই বলবে, আল্লাহ। সুতরাং, তুমি বলো, তারপরও কি তোমরা তাক্বওয়া অবলম্বন করবে না?" (ইউসুফ, ১০:৩১)

وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ

"আর তুমি যদি তাদেরকে জিজ্ঞেস করো, কে তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন? তারা অবশ্যই বলবে, আল্লাহ। তবু তারা কীভাবে বিমুখ হয়?"

(আয-যুখরুফ, ৪৩:৮৭)

وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن نَّزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِن بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ

www.QuranerAlo.net

"আর তুমি যদি তাদের প্রশ্ন করো, কে আসমান থেকে পানি বর্ষণ করেন, অতঃপর তা দ্বারা যমীনকে তার মৃত্যুর পর সঞ্জীবিত করেন? তবে তারা অবশ্যই বলবে, আল্লাহ।" (আল-আনকাবূত, ২৯:৬৩)

মাক্কার পৌত্তলিকদের সবাই জানত যে, আল্লাহ ﷻই তাদের সৃষ্টিকর্তা, প্রভু-প্রতিপালক এবং মালিক। কিন্তু শুধু জানার কারণেই তাদেরকে আল্লাহ মুসলিম সাব্যস্ত করেননি; বরং আল্লাহ ﷻ বলেন,

وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُّشْرِكُونَ ﴿١٠٦﴾

"তাদের অধিকাংশই আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস করে, অথচ তারা মুশরিক।"
(ইউসুফ, ১২:১০৬)

এই আয়াত সম্পর্কে বিশিষ্ট মুফাসসির মুজাহিদ(২৬) ﷺ বলেন,

> "তারা যে বলেছে, আল্লাহ আমাদের সৃষ্টি করেছেন, তিনিই আমাদের প্রতিপালনকারী এবং মৃত্যুদাতা—এর মাধ্যমে আল্লাহর প্রতি তাদের যে বিশ্বাস প্রকাশিত হয়, তা তাদেরকে মিথ্যা ইলাহ্‌র উপাসনা থেকে বিরতরাখেনি।"(২৭)

এ আয়াতগুলো থেকে স্পষ্ট যে, তৎকালীন কাফিররা আল্লাহর সার্বভৌমত্ব, কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা সম্পর্কে জানত। এমনকি, তারা হাজ্জ, সদাকাহ, কুরবানি, মানত ইত্যাদি বিভিন্ন 'ইবাদাতও আল্লাহর উদ্দেশ্যে নিবেদন করত। বিভিন্ন দুর্যোগ ও কঠিন পরিস্থিতিতে তারা তাঁর কাছেই প্রার্থনা করত। এমনকি নিজেদেরকে তারা দীনে ইব্‌রাহীমের অনুসারী বলেও দাবি করত। এই দাবির পরিপ্রেক্ষিতেই আল্লাহ ﷻ অবতীর্ণ করেন,

---

(২৬) মুজাহিদ ইব্‌ন জুবাইর আল-মাক্কি (৬৪২-৭২২) ছিলেন ইব্‌ন 'আব্বাসের বিশিষ্ট ছাত্র। তাঁর কুর'আনের তাফসীর সংশ্লিষ্ট বর্ণনাসমূহ আবদুর-রহমান আত-তাহির সংকলন করেছেন যা তাফসীর মুজাহিদ নামে দুই খণ্ডে প্রকাশিত, (ইসলামাবাদ : মাজমাআল বুহূত)।

(২৭) ইব্‌ন জারির আত-তাবারি কর্তৃক সংকলিত।

www.QuranerAlo.net

مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَٰكِن كَانَ حَنِيفًا مُّسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿٦٧﴾

"ইবরাহীম ইয়াহূদীও ছিলেন না, নাসারাও ছিলেন না; বরং তিনি ছিলেন একনিষ্ঠ মুসলিম। আর তিনি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না।" (আলি ইমরান: ৩:৬৭)

এমনকি মাক্কার অনেক পৌত্তলিক পুনরুত্থান এবং বিচার দিবসকেও বিশ্বাস করত। অনেকে আবার ভাগ্যেও (কদর) বিশ্বাস করত। ইসলাম-পূর্ব সময়ের কাব্য-কবিতায় তাদের এই বিশ্বাসের সপক্ষে অসংখ্য প্রমাণ মেলে। উদাহরণস্বরূপ, শাস্তি সম্পর্কে কবি যুহায়েরের নিম্নোক্ত চরণ দুটি উল্লেখ করা যায়,

"হয়তো তা বিলম্বিত, বিচার দিনের জন্য কোনো বইয়ে লিপিবদ্ধ,
নয়তো হয়েছে ত্বরান্বিত এবং অন্যায়ের হয়েছে সুবিচার।"

কবি আন্তারা থেকে উল্লেখ করা হয়েছেঃ

"ওহে এবিল! তুমি কোথায় পালাবে মৃত্যু থেকে,
যদি আমার আকাশের প্রভু ভাগ্যে রাখেন লিখে?"(২৮)

তাওহীদের প্রতি মাক্কার লোকদের স্বীকৃতি এবং আল্লাহ ﷻ সম্পর্কে তাদের জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও, তিনি তাদেরকে কাফির মুশরিকদের দলভুক্ত করেছেন। এর একমাত্র কারণ হলো, মহান আল্লাহর 'ইবাদাতের পাশাপাশি তারা অন্য অনেক দেব-দেবীরও উপাসনা করত।

অতএব, তাওহীদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রকার হলো তাওহীদ আল-ইবাদাহ্। এর অর্থ হলো, আনুগত্য ও 'ইবাদাতে সর্বতোভাবে মহান আল্লাহর একত্ব অক্ষুণ্ন রাখা। সকল প্রকার 'ইবাদাত শুধুমাত্র আল্লাহর উদ্দেশ্যে নিবেদন করা। কারণ একমাত্র তিনিই 'ইবাদাতের যোগ্য। তিনিই 'ইবাদাতের বিনিময়ে মানুষকে কল্যাণ দান করতে পারেন। আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের জন্য মানুষ ও স্রষ্টার মাঝে কোনো সুপারিশকারী বা মধ্যস্থতাকারীর প্রয়োজন

(২৮) সুলাইমান ইব্ন আব্দুল-ওয়াহ্হাব এর তাইসিরুল আযীযিল হামীদ গ্রন্থে উদ্ধৃত, (বৈরুত : আল-মাকতাবুল ইসলামি, ২য় সংস্করণ, ১৯৭০, পৃ. ৩৪)।

www.QuranerAlo.net

নেই। আল্লাহ সকল প্রকার 'ইবাদাত শুধুমাত্র তাঁর জন্য উৎসর্গ করার উপর সর্বোচ্চ গুরুত্বারোপ করেছেন। কারণ এটিই হলো মানুষকে সৃষ্টি করার সর্বপ্রধান কারণ। সকল নাবিদের আনীত বাণীর এটাই মূলকথা। যেমন আল্লাহ ﷻ বলেন,

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿٥٦﴾

"জিন ও মানুষকে এজন্যই সৃষ্টি করেছি যে, তারা আমার 'ইবাদাত করবে।"

(আয-যারিয়াত, ৫১:৫৬)

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ

"আমি প্রত্যেক জাতির মধ্যে এই বাণী দিয়ে একজন রসূল প্রেরণ করেছি যে, তোমরা আল্লাহর 'ইবাদাত করো এবং তাগূতকে বর্জন করো।..."

(আন-নাহল, ১৬:৩৬)

শুধু নিজ বুদ্ধি-বিবেচনা দ্বারা সৃষ্টির উদ্দেশ্যকে সম্পূর্ণরূপে অনুধাবন করা মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। কেননা, মানুষ খুবই সামান্য জ্ঞানের অধিকারী। অসীম স্রষ্টার কার্যবিধি সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ ধারণা লাভের আশা করাই তার জন্য অযৌক্তিক। এ কারণে আল্লাহ মানুষের স্বভাবজাত বৈশিষ্ট্যের মধ্যেই তাঁর 'ইবাদাত করার প্রবণতা দিয়ে দিয়েছেন। একই সাথে সৃষ্টির উদ্দেশ্য সম্পর্কে মানুষকে স্বচ্ছ ধারণা দেওয়ার জন্য তিনি অগণিত নাবি এবং কিতাব প্রেরণ করেছেন। আবার সৃষ্টির উদ্দেশ্যকে বুঝার জন্য প্রয়োজনীয় বুদ্ধিবৃত্তিক যোগ্যতাও তিনি মানুষকে দান করেছেন। এ কারণেই সবচেয়ে গুরুতর পাপ হলো শির্ক তথা আল্লাহ ব্যতীত বা আল্লাহর পাশাপাশি কারো বা কোনো কিছুর 'ইবাদাত করা।

প্রত্যেক মুসলিমকেই সলাতের মধ্যে দৈনিক কমপক্ষে সতের বার সূরা আল-ফাতিহাহ তিলাওয়াত করতে হয়। এই সূরার চতুর্থ আয়াতটি হলো, "আমরা আপনারই 'ইবাদাত করি এবং আপনারই নিকট সাহায্য চাই।" এই বাক্য থেকে এটি সুস্পষ্ট যে, সকল প্রকার 'ইবাদাত শুধুমাত্র তাঁরই উদ্দেশ্যে

www.QuranerAlo.net

নিবেদিত হতে হবে, যিনি 'ইবাদাতকারীর ডাকে সাড়া দিতে সক্ষম। আর তিনি হলেন একমাত্র আল্লাহ। নাবি মুহাম্মাদ ﷺ 'ইবাদাতে আল্লাহর একত্ব অক্ষুণ্ণ রাখার ব্যাপারে বলেছেন,

"কিছু চাইতে হলে শুধু আল্লাহর কাছেই চাও; তোমার সাহায্যের প্রয়োজন হলে, তা-ও শুধু আল্লাহর কাছেই চেয়ো।"(২৯)

আর এই প্রার্থনার ক্ষেত্রে কারো মধ্যস্থতা বা সুপারিশের কোনো প্রয়োজন না থাকার বিষয়টি আরও অনেক আয়াতে তুলে ধরা হয়েছে। আল্লাহ যে মানুষের অতি সন্নিকটে আছেন, তিনি যে তার প্রার্থনা সাথে সাথে শোনেন তার দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ,

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ ۖ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ ۖ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ ﴿١٨٦﴾

"যখন আমার বান্দারা তোমাকে আমার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে, আমি তো একান্তই নিকটে। আমি প্রার্থনাকারীর ডাকে সাড়া দিই, যখন সে আমাকে ডাকে। সুতরাং, তারা যেন আমার ডাকে সাড়া দেয় এবং আমার প্রতি ঈমান আনে। আশা করা যায়, তারা সঠিক পথে চলবে।" (আল-বাক্বারাহ, ২:১৮৬)

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ ۖ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ ﴿١٦﴾

"আমিই মানুষকে সৃষ্টি করেছি এবং তার প্রবৃত্তি তাকে যে কুমন্ত্রণা দেয় তাও আমি জানি। আর আমি তার গলার ধমনী থেকেও অনেক কাছে।" (ক্বফ, ৫০:১৬)

তাওহীদ আল-ইবাদাহ্' মেনে নেওয়ার পূর্বশর্ত হলো, আল্লাহর সাথে সকল প্রকার অংশীদারিত্ব, সমকক্ষতা বা মধ্যস্থতার ধারণাকে সম্পূর্ণ

(২৯) ইব্ন 'আব্বাস ﷺ থেকে বর্ণিত এবং ইমাম তিরমিযি কর্তৃক সংকলিত। দ্রষ্টব্য, আন-নাওয়াউইর চল্লিশ হাদীস, (ইংরেজি অনুবাদ), পৃ. ৬৮।

www.QuranerAlo.net

অস্বীকার করা। কেউ যদি কোনো মৃত ব্যক্তির কাছে কল্যাণ কামনা করে, কিংবা কারো জন্য আল্লাহর কাছে সুপারিশ করার প্রার্থনা করে, তাহলে তাকে মূলত আল্লাহর সমকক্ষই সাব্যস্ত করা হলো। কারণ এক্ষেত্রে দুআর মধ্যে আল্লাহর সাথে তাঁর সৃষ্টিকেও শামিল করে নেওয়া হচ্ছে। আর নাবি মুহাম্মাদ ﷺ দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলে দিয়েছেন,

"প্রার্থনা (দুআ) হলো একটি 'ইবাদাত।"(৩০)

এবং আল্লাহ ﷻ বলেন,

أَفَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكُمْ شَيْئًا وَلَا يَضُرُّكُمْ

"...তাহলে কি তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে এমন কিছুর 'ইবাদাত করো, যা তোমাদের কোনো উপকার করতে পারে না এবং কোনো ক্ষতিও করতে পারে না?" (আল-আম্বিয়া, ২১:৬৬)

إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ عِبَادٌ أَمْثَالُكُمْ

"আল্লাহ ছাড়া যাদেরকে তোমরা ডাকো, তারা তোমাদেরই মতো বান্দা।..." (আল-আরাফ, ৭:১৯৪)

এখন যদি কেউ নাবি ﷺ এর কাছে, কিংবা জিন, ফেরেশতা বা তথাকথিত পির-দরবেশের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করে অথবা এদের কারো নিকট তার দুআ কবুলের জন্য আল্লাহর কাছে সুপারিশ করার প্রার্থনা করে, তাহলে ওই ব্যক্তিও শির্ক করল। নির্বোধ মূর্খরা আবদুল-কাদির জিলানীকে(৩১)

(৩০) সুনান আবি দাউদ, (ইংরেজি অনুবাদ), খণ্ড ১, পৃ. ৩৮৭, হাদীস নং ১৪৭৪।

(৩১) আবদুল-কাদির (১০৭৭-১১৬৬) ছিলেন বাগদাদের হানবালি ফিক্‌হের একটি মাদ্রাসা ও রিবাতের (আশ্রম) একজন অধ্যক্ষ। তার বক্তৃতাগুলো (ফাতহুর-রব্বানি নামক গ্রন্থে সংকলিত, কায়রো ১৩০২) অত্যন্ত শাস্ত্রসিদ্ধ এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে তিনি কুর'আনের গোপন অর্থের বিশ্লেষণ করেছেন। ইব্‌ন আরবি (জন্ম ১১৬৫) তাকে ওই সময়ের কুত্‌ব বলে আখ্যা দিয়ে বলেছেন, তার পদমর্যাদা স্রষ্টা ব্যতীত সকল কিছুর উর্ধ্বে। আলি ইব্‌ন ইউসুফ আশ-শাত্তানাওফি (মৃত্যু ১৩১৪ সাল) বাহজাত আল-আস্‌রার (কায়রো, ১৩০৪) নামক একটি বই লিখেছেন যাতে তিনি আবদুল-কাদির জিলানীর অনেক অলৌকিক ঘটনার কথা উল্লেখ করেছেন। কাদেরিয়া সূফি

www.QuranerAlo.net

'গাউসুল-আযম' উপাধি দিয়েছে। সৃষ্টির কাউকে এই ধরনের উপাধি দেওয়া সুস্পষ্টভাবে তাওহীদের পরিপন্থী এবং শির্কের বহিঃপ্রকাশ। এই উপাধির আক্ষরিক অর্থ হলো, 'সর্বোচ্চ আশ্রয়দাতা, ত্রাণকর্তা বা বিপদ-আপদ থেকে মুক্তিদাতা'। অথচ এই ক্ষমতা ও বৈশিষ্ট্য শুধুমাত্র আল্লাহর ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। অনেক লোক বিপদে পড়লে সাহায্য ও সুরক্ষার জন্য আবদুল-কাদির জিলানীকে তার এই নাম ধরে ডাকে। অথচ আল্লাহ ﷻ বলেন,

وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ

"আর যদি আল্লাহ তোমাকে কোনো দুর্দশা দ্বারা আক্রান্ত করেন, তবে তিনি ছাড়া তা দূর করার কেউ নেই।" (আল-আনআম, ৬:১৭)

.....مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ....

"...আমরা কেবল এজন্যই তাদের 'ইবাদাত করি যে, তারা আমাদেরকে আল্লাহর নিকটবর্তী করে দেবে।..." (আয-যুমার, ৩৯:৩)

মাক্কার পৌত্তলিকরা প্রতিমাগুলোকে স্বয়ং আল্লাহর নৈকট্য লাভের জন্য তাদের ও আল্লাহর মাঝে কেবল মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করেছিল। তারপরও আল্লাহ তাদেরকে পৌত্তলিক বলে আখ্যায়িত করেছেন। এখনও যেসব মুসলিমরা আল্লাহ ছাড়া অন্যের কাছে প্রার্থনা করার ব্যাপারে গোঁ ধরে বসে আছেন, এই আয়াত নিয়ে চিন্তাভাবনা করলে তাদের জন্য উত্তম হতো।

তারসাসের অধিবাসী সলের (পরিবর্তিত নাম পল) মতবাদে প্রভাবিত হয়ে, খ্রিষ্টানরা ঈসা ﷺ কে প্রভু বানিয়ে নেয় এবং তারা ঈসা ﷺ ও তাঁর মায়ের উপাসনা করতে শুরু করে। ক্যাথলিক খ্রিষ্টানদের প্রতিটি ধর্মীয় অনুষ্ঠানের জন্য ভিন্ন ভিন্ন সাধু বা সন্ত রয়েছে। এদের কাছে তারা সরাসরি প্রার্থনা করে। তাদের বিশ্বাস, এইসব সাধুসন্তরা বিশ্বজগতের ঘটনাবলিকে সরাসরি নিয়ন্ত্রণ কিংবা অন্তত প্রভাবিত করতে সক্ষম। তারা তাদের

ধারার নামকরণ হয়েছে তার নামানুসারে এবং সূফিবাদী রীতিনীতির অনেকগুলো তার সময় থেকেই প্রচলিত হয়েছে। (Shorter Encyclopedia of Islam, পৃ. ৫-৭ এবং ২০২-২০৫)।

www.QuranerAlo.net

পাদ্রীদেরকে আল্লাহ ও তাদের মাঝে মধ্যস্থতাকারী মনে করে। তাদের ধারণা, বিয়ে-শাদী না করে সন্ন্যাস জীবনযাপন এবং ধার্মিকতার কারণে পাদ্রীরা স্রষ্টার কাছে অধিক প্রিয়। তাদের প্রার্থনা স্রষ্টা গ্রহণ করার সম্ভাবনা বেশি। শাফাআত বা সুপারিশ সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণার কারণে শিয়াদের প্রায় সব দলের লোকেরাই সপ্তাহের কিছু নির্দিষ্ট দিন এবং সময়ে আলি, ফাতিমা, হাসান এবং হুসাইনের(৩২) কাছে প্রার্থনা করে থাকে।

ইসলামে 'ইবাদাত কেবল সলাত, সিয়াম, হাজ্জ, যাকাত ও কুরবানির মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। বরং ভালোবাসা, নির্ভরতা, আশা ও ভয় ইত্যাদির মতো সকল আবেগ-অনুভূতিকে যথাযোগ্য মাত্রায় আল্লাহর জন্য নিবেদন করাও 'ইবাদাতের অন্তর্ভুক্ত। এসব মানবীয় অনুভূতিগুলোর যথেচ্ছ প্রয়োগের ব্যাপারে সতর্ক করে আল্লাহ ﷻ বলেছেন,

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ ۖ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِّلَّهِ ۗ

"কিছু মানুষ আছে, যারা আল্লাহ ছাড়া অন্যকেও আল্লাহর সমকক্ষরূপে গ্রহণ করে, তাদেরকে আল্লাহকে ভালোবাসার মতো ভালোবাসে। আর যারা ঈমান এনেছে, তারা আল্লাহকেই সবচেয়ে বেশি ভালোবাসে।..." (আল-বাক্বারাহ, ২:১৬৫)

أَلَا تُقَاتِلُونَ قَوْمًا نَّكَثُوا أَيْمَانَهُمْ وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ وَهُم بَدَءُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ ۚ أَتَخْشَوْنَهُمْ ۚ فَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَوْهُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿١٣﴾

"তোমরা কেন এমন কওমের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো না, যারা তাদের কসম ভঙ্গ করেছে এবং রসূলকে বহিষ্কার করার ইচ্ছা পোষণ করেছে, আর তারাই প্রথমে

(৩২) ফাতিমা ؓ ছিলেন মুহাম্মাদ ﷺ এর কনিষ্ঠতম কন্যা, যার বিয়ে হয়েছিল নাবি ﷺ এর চাচাতো ভাই, আলি ইব্ন আবি তালিব ؓ এর সাথে। হাসান এবং হুসাইন ؓ তাদেরই দুই পুত্র।

www.QuranerAlo.net

তোমাদের সাথে আরম্ভ করেছে। তোমরা কি তাদেরকে ভয় করছ? অথচ আল্লাহই ভয় করার অধিক উপযুক্ত, যদি তোমরা মু'মিন হও।" (আত-তাওবা, ৯:১৩)

...وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿٢٣﴾

"আর আল্লাহর উপরই তাওয়াক্কুল করো, যদি তোমরা মু'মিন হও।"
(আল-মা'ইদাহ, ৫:২৩)

'ইবাদাহ শব্দের অর্থই হলো নিরঙ্কুশ ও নিঃশর্ত আনুগত্য। আর মহান আল্লাহই হলেন সর্বোচ্চ বিধানদাতা। তাই আল্লাহর দেওয়া শারঈ আইন-ব্যবস্থা বাদ দিয়ে ধর্মনিরপেক্ষ আইন-ব্যবস্থা বাস্তবায়ন করা সুস্পষ্ট কুফ্‌রি। কারণ এর দ্বারা মূলত আল্লাহর শারীআহকে অস্বীকার করা হয়। অধিকন্তু, ধর্মনিরপেক্ষ বিচারব্যবস্থাকে গ্রহণযোগ্য ও সঠিক বলে ধরে নেওয়ার মাধ্যমে আনুগত্যের ক্ষেত্রে আল্লাহর সাথে অন্যদেরকে শরিক সাব্যস্ত করা হয়। কুর'আনে আল্লাহ ﷻ বলেন,

...وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ﴿٤٤﴾

"আর যারা আল্লাহ যা নাযিল করেছেন সে অনুযায়ী বিচার ফায়সালা করে না, তারাই কাফির।" (আল-মা'ইদাহ, ৫:৪৪)

আদি ইব্‌ন হাতিম ﷺ খ্রিষ্টান থেকে মুসলিম হয়েছিলেন। তিনি একবার নাবি ﷺ কে কুর'আনের নিম্নোক্ত আয়াতটি তিলাওয়াত করতে শুনলেন,

اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ

"তারা আল্লাহকে ছেড়ে তাদের পণ্ডিত ও সংসার বিরাগীদের প্রভু হিসেবে গ্রহণ করেছে...।" (আত-তাওবা; ৯:৩১)

তখন তিনি বললেন, "আমরা তো কখনোই তাদের 'ইবাদাত করতাম না।" নাবি ﷺ তার দিকে ফিরে বললেন,

www.QuranerAlo.net

"তারা কি আল্লাহ যা বৈধ করেছেন এমন কিছুকে অবৈধ করত না; ফলে তোমরাও সেটাকে অবৈধ করে নিতে?[৩৩] আর তারা কি এমন কিছুকে বৈধ করে নিতো না, যা আল্লাহ অবৈধ করেছেন?" তিনি বলেন, "হ্যাঁ, আমরা এমনটা অবশ্য করতাম।" অতঃপর নাবি ﷺ বললেন, "এভাবেই তোমরা তাদের 'ইবাদাত করতে।"[৩৪]

এ কারণেই তাওহীদ আল- ইবাদাহ্‌র একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো, ইসলামি শারীআহ্ আইন বাস্তবায়ন করা; বিশেষ করে যেসব দেশে মুসলিমরা সংখ্যাগরিষ্ঠ। বর্তমানে প্রায় সকল মুসলিম দেশের সরকারগুলোই দেশ চালাচ্ছে কাফিরদের থেকে আমদানি করা গণতান্ত্রিক ও পুঁজিবাদী কিংবা সমাজতান্ত্রিক ধারার সংবিধান দিয়ে। ইসলামি আইন এসব দেশে প্রায় একেবারেই বিলুপ্ত; না হয় গুরুত্বহীন কিছু ক্ষেত্রেই তার প্রয়োগকে সীমিত করে রাখা হয়েছে। এসব মুসলিম দেশেগুলোতে পুনরায় ইসলামি আইন ব্যবস্থা বাস্তবায়ন করতে হবে। একইভাবে, কিছু মুসলিম দেশ আছে, যেখানে ইসলামি আইন কেবল কাগজে-কলমেই আছে; বাস্তবে কার্যকর হলো ধর্মনিরপেক্ষ আইন। এসব দেশগুলোকেও সম্পূর্ণ কার্যকর শারীআহ আইনের আওতায় আনতে হবে। কেননা, মুসলিম জাতির জীবনের প্রতিটি দিক ও বিভাগই শারীআহর সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পৃক্ত।

কোনো মুসলিম দেশে শারীআহর বদলে অনৈসলামি শাসন ব্যবস্থাকে গ্রহণ করা হলো সুস্পষ্ট শির্ক এবং একটি কুফ্‌রি কাজ। যারা এই শাসন ব্যবস্থাকে বদলানোর মতো ক্ষমতা রাখেন, তাদেরকে অবশ্যই তা করতে হবে। আর যারা তা করতে সক্ষম নয়, তাদেরকে অবশ্যই কুফ্‌রি শাসন ব্যবস্থার বিরুদ্ধে কথা বলতে হবে এবং শারীআহর বাস্তবায়নের পক্ষে জনসাধারণের প্রতি আহ্বান জানাতে হবে। যদি এমনটি করাও সম্ভব না হয়, তাহলে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন এবং তাওহীদকে সমুন্নত রাখতে হলে অবশ্যই অনৈসলামি সরকারের প্রতি অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে ঘৃণা এবং নিন্দা জানাতে হবে।

---

(৩৩) খ্রিস্টান যাজকরা একের অধিক বিয়ে করাকে এবং আপন চাচাতো ভাই বোন বিয়ে করাকে নিষিদ্ধ (হারাম) করেছে। রোমান ক্যাথলিকরা তাদের ধর্মানুযায়ী, যাজকদের জন্য বিয়ে করাকে নিষিদ্ধ (হারাম) করেছে এবং তালাক বা বিবাহ বিচ্ছেদকে সবার জন্য নিষিদ্ধ করেছে।

(৩৪) তিরমিযি কর্তৃক সংকলিত।

www.QuranerAlo.net

দ্বিতীয় অধ্যায়

শির্কের প্রকারভেদ

সাদার বিপরীত যেমন কালো, আলোর বিপরীত যেমন অন্ধকার; তেমনি তাওহীদের বিপরীত বিষয় হলো শির্ক। তাই শির্ক সম্পর্কে যথার্থ বিশ্লেষণ ছাড়া তাওহীদ বিষয়ক আলোচনা কখনোই পরিপূর্ণ হতে পারে না। পূর্বের অধ্যায়ে শির্ক সম্পর্কে ইতিমধ্যে কিছুটা আলোচনা করা হয়েছে এবং তাওহীদ কীভাবে বিনষ্ট হয়ে যায়, তার উদাহরণও দেওয়া হয়েছে। এই অধ্যায়ে একটি স্বতন্ত্র আলোচ্য বিষয় হিসেবে শির্ক-এর উপর ঈষৎ বিস্তারিত আলোকপাত করা হবে।

শির্কের ভয়াবহতা সম্পর্কে আল্লাহ ﷻ কুর'আনে বলেছেন,

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَاءُ ۚ

"নিশ্চয় আল্লাহ তাঁর সাথে শরিক করাকে ক্ষমা করেন না। এছাড়া অন্যান্য পাপ, যাকে চান তিনি ক্ষমা করে দেন। আর যে আল্লাহর সাথে শরিক করে, সে অবশ্যই এক মহাপাপ রচনা করল।" (আন-নিসা', ৪:৪৮)

যেহেতু শির্কের মাধ্যমে মানুষ সৃষ্টির মূল উদ্দেশ্যকেই অস্বীকার করা হয়, তাই স্রষ্টার কাছে শির্ক হলো সবচেয়ে ভয়াবহ এবং ক্ষমার অযোগ্য পাপ।

আক্ষরিক অর্থে শির্ক বলতে বুঝায়, অংশীদারিত্ব (partnership), ভাগ দেওয়া (sharing) বা সহযোগী করা (associating)।[১] কিন্তু ইসলামি পরিভাষায়, আল্লাহর সাথে কাউকে বা কোনো কিছুকে অংশীদার বা সমকক্ষ সাব্যস্ত করাই হলো শির্ক; সেটা হোক প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ। তাওহীদের প্রধান তিনটি প্রকারভেদ অনুযায়ী শির্কের নিম্নোক্ত বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এ কারণেই

(১) The Hans Wehr Dictionary of Modern Written Arabic, পৃ. ৪৬৮।

www.QuranerAlo.net

আমরা প্রথমে রুবূবিয়্যাহ্‌র সাথে সংশ্লিষ্ট যেসব প্রধান প্রধান ক্ষেত্রে শির্ক সংঘটিত হয়, সেগুলোর দিকে দৃষ্টিপাত করব। তারপর তাওহীদুল-আসমা' ওয়াস-সিফাত এবং পরিশেষে তাওহীদুল-ইবাদাহ সংশ্লিষ্ট শির্কের বিষয়ে আলোকপাত করা হবে।

রুবূবিয়্যাহ্ সংশ্লিষ্ট শির্ক

এই প্রকার শির্ক হলো এমন কোনো বিশ্বাস পোষণ করা যে,

সৃষ্টিজগতের উপর প্রভুত্ব, কর্তৃত্ব, ক্ষমতা এবং প্রতিপালনে আল্লাহর সমকক্ষ বা কাছাকাছি কেউ রয়েছে।

অথবা, সৃষ্টিকুলের কোনো প্রভু বা প্রতিপালকই নেই।

প্রচলিত অধিকাংশ ধর্মগুলো রুবূবিয়্যাহ্‌র প্রথম শ্রেণির শির্কে নিমজ্জিত। আর বিভিন্ন দার্শনিক ও তাদের মস্তিষ্কপ্রসূত মতবাদগুলো রুবূবিয়্যাহ্‌র দ্বিতীয় শ্রেণির শিরকের অন্তর্ভুক্ত।

১. অংশীদার সাব্যস্ত করার কারণে সংঘটিত শির্ক

এই শ্রেণিতে রয়েছে বিভিন্ন ভ্রান্ত ধর্মে বিশ্বাসী ও কুসংস্কারে আচ্ছন্ন লোকেরা। এরা সর্বশক্তিমান ও পরম স্রষ্টাকে স্বীকার করলেও, একই সাথে বিভিন্ন ব্যক্তি ও বস্তুকে স্রষ্টার সহযোগী বা তাঁর কর্তৃত্বে অংশীদার সাব্যস্ত করে। অদৃশ্য আত্মা, বিভিন্ন প্রাণী, চন্দ্র-সূর্য, গ্রহ-নক্ষত্র কিংবা বিভিন্ন পার্থিব জড়বস্তুকে সেই পরম স্রষ্টার প্রভুত্বে অংশীদার বা সহযোগী বলে বিশ্বাস করে। ধর্মবেত্তা ও দার্শনিকরা এই ধরনের বিশ্বাসকে সাধারণত একেশ্বরবাদী (একজন প্রভুর অস্তিত্বে বিশ্বাস) নয়তো বহু-ঈশ্বরবাদী (একাধিক প্রভুর অস্তিত্বে বিশ্বাস) বিশ্বাস বলে উল্লেখ করেন। ইসলামি বিশ্বাস অনুযায়ী, এ ধরনের সবগুলো বিশ্বাসই হলো বহু-ঈশ্বরবাদ। এসব ভ্রান্ত বিশ্বাসের অধিকাংশই হলো বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন জাতির মধ্যে আগত নাবিদের আনীত দীনের বিকৃত রূপ। একেকটার বিকৃতি ও বিচ্যুতি একেক মাত্রার। যদিও এদের সবগুলোই শুরুতে তাওহীদের উপরই প্রতিষ্ঠিত ছিল।

www.QuranerAlo.net

হিন্দু ধর্মে পরমেশ্বর ব্রহ্মা হলো সকল প্রাণীর অন্তর্যামী, সর্ব-পরিব্যাপক, অক্ষয় ও অব্যয়, আদি ও অন্তহীন, নিরাকার এবং অনন্ত অসীম, যার মাঝে সবকিছুর উৎপত্তি ও সমাপ্তি। আবার মানবীয় অবয়বে প্রকাশিত মহাবিশ্বের স্রষ্টা ব্রহ্মা তার সংরক্ষক দেবতা বিষ্ণু, এবং ধ্বংসকারী দেবতা শিবের[২] সাথে মিলে ত্রয়ী গঠন করেছে। এভাবেই বিভিন্ন দেব-দেবীর উপর স্রষ্টার সৃষ্টি, ধ্বংস এবং রক্ষা করার ক্ষমতাকে বিভক্ত করার মাধ্যমে হিন্দু ধর্মে রুবূবিয়্যাহ্ সংশ্লিষ্ট শির্কের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে।

খ্রিষ্টানদের ধর্মীয় বিশ্বাস অনুযায়ী, স্রষ্টা নিজেকে পিতা, পুত্র (যিশুখ্রিষ্ট) এবং পবিত্র আত্মার[৩] মধ্য দিয়ে প্রকাশ করেছেন। অথচ এই তিন সত্তা তাদের কাছে একই 'মৌলিক উপাদান'-এর সমন্বয় বলে বিবেচিত। তারা নাবি ঈসা ﷺ কে দেবতার আসনে উন্নীত করেছে। তিনি নাকি স্রষ্টার ডানপাশে উপবিষ্ট হয়ে দুনিয়ার বিচারকার্য পরিচালনা করছেন। হিব্রু বাইবেল অনুযায়ী, পবিত্র আত্মা' হলো স্রষ্টার সৃষ্টিক্ষমতা প্রয়োগের মাধ্যম। খ্রিষ্টানরা মনে করে, এই পবিত্র আত্মা স্রষ্টার অংশবিশেষ। পল পবিত্র আত্মাকে যিশুখ্রিষ্টের সুপ্ত সত্তা, খ্রিষ্টানদের পথপ্রদর্শক এবং ত্রাণকর্তা হিসেবে তুলে ধরেছেন। পেন্টিকোস্ট[৪]-এর দিনই পবিত্র আত্মার প্রথম প্রকাশ ঘটে। খ্রিষ্টানদের ধর্মীয় বিশ্বাস অনুযায়ী, প্রভুত্ব ও কর্তৃত্বে যিশুখ্রিষ্ট এবং পবিত্র আত্মা হলো স্রষ্টার অংশীদার। শুধুমাত্র যিশুখ্রিষ্ট পৃথিবীর বিচারকার্য পরিচালনা করেন এবং পবিত্র আত্মার মাধ্যমে খ্রিষ্টানরা সাহায্যপ্রাপ্ত এবং পথপ্রাপ্ত হয়। অতএব, খ্রিষ্টানদের ধর্মীয় বিশ্বাসের মাধ্যমে স্রষ্টার রুবূবিয়্যাহ্-সংশ্লিষ্ট শির্ক সংঘটিত হয়।

যরাথুস্ট্রবাদীদের (পারসি) ধারণা অনুযায়ী স্রষ্টা, আহুরা মাযদা হলো সমস্ত ভালো কিছুর স্রষ্টা এবং উপাসনা লাভের একমাত্র যোগ্য সত্তা। আহুরা মাযদার সাতটি সৃষ্টির অন্যতম হলো আগুন। এই আগুনকে মনে করা হয় তার পুত্র বা প্রতিনিধি। যরাথুস্ট্রবাদীরাও রুবূবিয়্যাহ্র ক্ষেত্রে শির্কে

---

(২) W. L. Reese, Dictionary of Philosophy and Religion, (নিউ জার্সি: হিউম্যানিটিজ প্রেস, ১৯৮০), পৃ. ৬৬-৭ এবং ৫৮৬-৭। আরও দেখুন : John Hinnels, Dictionary of Religions (ইংল্যান্ড : পেঙ্গুইন বুক্স, ১৯৮৪, পৃ. ৬৭-৮)।

(৩) Dictionary of Religions, পৃ. ৩৩৭।

(৪) Dictionary of Philosophy and Religion, পৃ. ২৩১।

www.QuranerAlo.net

লিপ্ত। তাদের ধারণা, মন্দ, সহিংসতা ও মৃত্যু হলো আংগ্রা মানিয়ু নামের ভিন্ন এক স্রষ্টার সৃষ্টি। অন্ধকারকে[৫] তারা এই স্রষ্টার প্রতীক হিসেবে চিহ্নিত করে। অথচ ভালো-মন্দ উভয়েরই স্রষ্টা হলেন একজন। তিনি এক ও অভিন্ন। কিন্তু মন্দ সৃষ্টির কথা স্রষ্টার নামে বলতে মানুষের ইচ্ছা হয় না। একারণে যরাথুস্ট্রবাদীরা একটি মন্দ আত্মাকে মন্দের স্রষ্টা বলে স্রষ্টার মর্যাদায় বসিয়েছে। আর এভাবেই তারা এই মন্দ আত্মাকে স্রষ্টার রুবূবিয়্যাহ্ অংশীদার বানিয়েছে।

পশ্চিম আফ্রিকার—বিশেষ করে নাইজেরিয়ার—এক কোটিরও বেশি মানুষ ইয়োরোবা (Yoruba) ধর্মের অনুসারী। এদের রয়েছে একজন মাত্র সর্বোচ্চ দেবতা যার নাম ওলোরিয়াস (Olorious বা স্বর্গের অধিপতি) বা ওলোডুমেয়ার (Olodumare)। কিন্তু বিভিন্নভাবে ওরিশা (Orisha) নামক দেবতার পূজা করা আধুনিক ইয়োরোবা ধর্মের এখন একটি বৈশিষ্ট্য। এটি এখন একটি সুস্পষ্ট বহু-ঈশ্বরবাদী[৬] ধর্মের রূপ নিয়েছে। এই ধর্মের অনুসারীরা স্রষ্টার সকল কার্যাবলীকে নিকৃষ্ট সব উপাস্য আর দেবতাদের উপর আরোপের মাধ্যমে রুবূবিয়্যাহ্ সংশ্লিষ্ট শির্কে লিপ্ত হয়েছে।

দক্ষিণ আফ্রিকার যুলু সম্প্রদায়ের লোকেরা এক ঈশ্বরে বিশ্বাসী। তাদের এই ঈশ্বরের নাম আনকুলুনকুলু (Unkulunkulu)। অর্থাৎ, যিনি প্রাচীন, প্রথম এবং সবচেয়ে সম্মানিত। ঈশ্বরের জন্য সুনির্ধারিত তাদের মৌলিক উপাধিগুলো হলো, নোকোসি ইয়াফেযুলু (Nkosi yaphezulu) বা আকাশের অধিপতি এবং আমভেলিংকাংকি (uMuvelingqanqi) বা প্রথমে আবির্ভূত। মনে করা হয়, তাদের এই সর্বোচ্চ সত্তা হলেন পুরুষ, যিনি পৃথিবীর নারীদের সাথে মিলিত হয়ে মানব জাতির জন্ম দেন। যুলুদের ধর্মীয় বিশ্বাস অনুযায়ী, বজ্রপাত ও বিদ্যুৎ চমকানো হলো ঈশ্বরের কাজ। আর পার্থিব জীবনের অসুখ-বিসুখ এবং বিপদ-আপদ ইডলোজি বা আবাফানসি (idlozi, abaphansi—যারা মাটির নীচে/মৃত) তথা পূর্বপুরুষরা ঘটিয়ে থাকে। এইসব পূর্বপুরুষরা জীবিতদের নিরাপত্তা দান করে, তাদের কাছে খাদ্য চায়, ধর্মীয় অনুষ্ঠান এবং পশু উৎসর্গ করলে সন্তুষ্ট হয়, অবহেলাকারীদের শাস্তি দেয়

(৫) Dictionary of Religions, পৃ. ৩৬১-২।
(৬) Dictionary of Religions, পৃ. ৩৫৮।

www.QuranerAlo.net

এবং গণকদের উপর ভর করে (ইনয়াংয়া)।[৭] কাজেই শুধু মানুষের সৃষ্টি সম্পর্কে তাদের ধারণার জন্যই নয়; বরং জীবনের ভালো-মন্দ ঘটনাকে তাদের পূর্বপুরুষদের প্রেতাত্মাসমূহের উপর আরোপ করার মাধ্যমেও যুলু ধর্মে রুবূবিয়্যাহ্ সংশ্লিষ্ট শির্ক সংঘটিত হয়।

অনেক মুসলিমদের মাঝেও রুবূবিয়্যাহ্ সংশ্লিষ্ট শির্ক পরিলক্ষিত হয়। এরা বিশ্বাস করে যে, অলি-দরবেশ এবং বিভিন্ন সৎকর্মশীল ব্যক্তিদের আত্মা পৃথিবীর বিভিন্ন কর্মকাণ্ড এবং ঘটনাকে প্রভাবিত করতে পারে; এমনকি তাদের মৃত্যুর পরেও। তাদের বিশ্বাস, মৃত ওইসব পুণ্যবান লোকেরা মানুষের অভাব দূর করতে পারে, বিপদাপদ দূর করতে পারে, কেউ ডাকলে তাকে সাহায্য করতে পারে। ঠিক এভাবেই কবরপূজারীরা মৃতদের প্রতি ঐশ্বরিক ক্ষমতা আরোপ করে। অথচ বাস্তব সত্য হলো, একমাত্র আল্লাহ ﷻই এসব করার ক্ষমতা রাখেন।

অনেক আধ্যাত্মবাদী সুফিদের মধ্যে প্রচলিত একটি বিশ্বাস হলো 'রিজাল আল-গাইব'[৮] বা অদৃশ্য মানুষের প্রতি বিশ্বাস। তাদের মতে, এদের মধ্যে সর্বোচ্চ মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত ব্যক্তির উপাধি হলো 'কুত্ব'। যার নির্দেশনায় পৃথিবীর সৃষ্টির সবকিছু পরিচালনা করা হয়।[৯]

২. অস্বীকার করার কারণে সংঘটিত শির্ক

এই শ্রেণির আওতায় পড়বে সেইসব দার্শনিক এবং আদর্শিক মতবাদ, যেগুলোতে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে স্রষ্টার অস্তিত্বকে অস্বীকার করা হয়। কিছু ক্ষেত্রে তারা স্রষ্টার সরাসরি অস্তিত্বকেই অস্বীকার করে। আবার কিছু ক্ষেত্রে স্রষ্টার অস্তিত্ব স্বীকার করলেও তাঁর জাত, সিফাত ও ক্ষমতা সম্পর্কে এমন সব কথা বলা হয়, যা তাঁর অস্তিত্বকে অস্বীকার করারই নামান্তর। যেমন সর্বেশ্বরবাদ বা Pantheism ইত্যাদি।

---

(৭) Dictionary of Religions, পৃ. ৩৬৩।

(৮) আক্ষরিক অর্থে, 'অদেখা জগতের মানুষ।' বিশ্বাস করা হয় যে, 'প্রতিরক্ষাকারী' বিভিন্ন পদমর্যাদার সাধু-সন্তদের হস্তক্ষেপের কল্যাণে পৃথিবী টিকে আছে। পৃথিবীতে এদের সংখ্যা নির্দিষ্ট এবং অপরিবর্তনীয়। ফলে এদের কেউ মারা গেলে তাৎক্ষণিকভাবে অধস্তনদের মাধ্যমে এই সংখ্যা পূর্ণ হয়ে থাকে। (Shorter Encyclopedia of Islam, পৃ. ৫৮২)

(৯) Shorter Encyclopedia of Islam, পৃ. ৫৫.

www.QuranerAlo.net

প্রাচীন ধর্মদর্শনের মধ্যে স্রষ্টার অস্তিত্ব অস্বীকার করার প্রবণতা খুব কম দর্শনের মধ্যেই দেখা যায়। এগুলোর মধ্যে প্রথমটি হলো গৌতম বুদ্ধের প্রচারিত বৌদ্ধ ধর্ম। খ্রিষ্টপূর্ব ৬ষ্ঠ শতকে হিন্দু ধর্মের বর্ণপ্রথার বিরুদ্ধে একটি সংস্কারবাদী আন্দোলনের ফসল হিসেবে বৌদ্ধ ধর্মের উদ্ভব হয়। জৈন ধর্মেরও উদ্ভব ঘটেছিল এই একই সময়ে। খ্রিষ্টপূর্ব ৩য় শতকে বৌদ্ধধর্ম রাষ্ট্রধর্মে পরিণত হয়। পরে তা হিন্দুধর্মের সাথে অঙ্গীভূত হয়ে যায়। এক পর্যায়ে স্বয়ং বুদ্ধই হিন্দুদের কাছে তাদের অন্যতম অবতার হয়ে ওঠেন। ধর্মটি ক্রমেই ইন্ডিয়া থেকে বিলুপ্ত হয়ে চীনসহ প্রাচ্যের অন্যান্য জাতি গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে প্রভাব বিস্তার করতে থাকে। গৌতম বুদ্ধের মৃত্যুর পর বৌদ্ধ ধর্মের মধ্যে দু'টি ভাগ হয়ে যায়। এগুলোর প্রথম এবং অধিকতর রক্ষণশীল ধারাটির নাম হলো হিনযান (Hinayana) বৌদ্ধ ধর্ম (৪০০-২৫০ খ্রিষ্টপূর্ব)। এই ধারার অনুসারীদের সুস্পষ্ট বক্তব্য হলো, স্রষ্টা বলতে কেউ নেই। কাজেই প্রত্যেকের পরিত্রাণ লাভের দায়িত্ব তার নিজের উপর।[১০]

অতএব, বৌদ্ধ ধর্মের প্রাচীন এই ধারাটি সুস্পষ্টভাবে রুবূবিয়্যাহ্ সংশ্লিষ্ট শির্কের অন্তর্ভুক্ত। কেননা, এখানে সরাসরি স্রষ্টার অস্তিত্বকে অস্বীকার করা হয়েছে।

অনুরূপভাবে, বর্ধমান (Vardhamana) জৈন ধর্মের যে ধারা প্রণালীবদ্ধ করেন সে দীক্ষামতেও স্রষ্টা বলে কেউ নেই। তবে মুক্ত আত্মাসমূহ অমরত্ব এবং অসীম জ্ঞানের মতো স্রষ্টার কিছু মহান মর্যাদা অর্জন করতে পারে। এই ধর্মের অনুসারীরা মুক্ত আত্মাসমূহকে স্বর্গীয় সত্তা হিসেবে বিবেচনা করে। তাদের সম্মানার্থে মন্দির নির্মাণ করে এবং তাদের মূর্তিকে পূজা করে।[১১]

নাবি মূসা ﷺ এর সময়ের ফিরআউন হলো আরেকটি প্রাচীন উদাহরণ। ফিরআউন স্রষ্টার অস্তিত্ব একরকম অস্বীকারই করেছিল। মূসা ﷺ ও মিশরের জনগণের কাছে সে দাবি করেছিল যে, সে-ই তাদের সর্বোচ্চ প্রভু। মূসা ﷺ এর প্রতি ফিরআউনের বক্তব্যকে উদ্ধৃত করে আল্লাহ বলেছেন,

قَالَ لَئِنِ اتَّخَذْتَ إِلَٰهًا غَيْرِي لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ ﴿٢٩﴾

(১০) Dictionary of Philosophy and Religion, পৃ. ৭২.
(১১) Dictionary of Philosophy and Religion, পৃ. ২৬২-৩.

www.QuranerAlo.net

"ফিরআউন বলল, যদি তুমি আমাকে ছাড়া কাউকে ইলাহরূপে গ্রহণ করো, তাহলে অবশ্যই আমি তোমাকে কয়েদীদের অন্তর্ভুক্ত করব।'"

(আশ-শু'আরা', ২৬:২৯)

فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَىٰ ﴿٢٤﴾

"সে বলল, আমি তোমাদের সর্বোচ্চ রব।" (আন-নাযিআত, ৭৯:২৪)

ঊনবিংশ এবং বিংশ শতাব্দীতে বেশ কিছু সংখ্যক ইউরোপীয় দার্শনিক দৃঢ়ভাবে স্রষ্টার অস্তিত্ব অস্বীকার করেন। এ মতবাদ Death of God Philosophy বা 'স্রষ্টার মৃত্যু দর্শন' হিসেবে পরিচিতি পায়। জার্মান দার্শনিক, ফিলিপ মেইনল্যান্ডার (Philipp Mainlander ১৮৪১-১৮৭৬) তার প্রধান রচনা, 'পরিত্রাণ দর্শন' (The Philosophy of Redemption, ১৮৭৬) নামক বইতে লিখেছেন, স্রষ্টার মৃত্যুর মধ্য দিয়েই বিশ্বজগতের যাত্রা শুরু হয়েছে। তিনি তার দর্শনের পক্ষে যুক্তি দেন যে, স্রষ্টা হলেন একত্বের মূলসূত্র যা বিশ্বজগতের বহুত্বের দ্বারা ধ্বংসপ্রাপ্ত এবং তিনি পরম সুখের মূলসূত্র যা দুঃখকষ্টের বিধানে সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষিত; কারণ বিশ্বজগতে দুঃখ-কষ্টেরই আধিপত্য।[১২] প্রুশিয়ার অধিবাসী ফ্রেডরিক নীটশে (Friedrich Nietzsche, ১৮৪৪-১৯০০) 'স্রষ্টার মৃত্যু' সংক্রান্ত মতবাদকে সমর্থন জানিয়ে বলেন যে, স্রষ্টা মানুষের অস্থির চেতনার প্রক্ষিপ্ত বিম্ব (Projection) ছাড়া বেশি কিছু নয় এবং মানুষ হলো অতিমানব (Superman)[১৩] হয়ে ওঠার মধ্যবর্তী সেতু। এরপর বিংশ শতাব্দীর ফরাসী দার্শনিক, জাঁ পল সার্ত্রও (Jean Paul Sartre) 'স্রষ্টার মৃত্যু' মতবাদের সাথে সুর মিলিয়ে বিবৃতি দেন। তার দাবি অনুযায়ী, স্রষ্টার কোনো অস্তিত্ব নেই। কারণ স্রষ্টা নিজেই একটি স্ববিরোধী ধারণা। তার মতে, স্রষ্টার ধারণা কেবল মানুষের আপন মনের প্রক্ষিপ্ত বিম্ব (Projection)।[১৪]

---

(১২) Dictionary of Philosophy and Religion, পৃ. ৩২৭.

(১৩) Dictionary of Philosophy and Religion, পৃ. ৩৯১.

(১৪) Dictionary of Philosophy and Religion, পৃ. ৫০৮-৯.

www.QuranerAlo.net

এর পর আসে ডারউইনীয় (মৃত্যু ১৮৮২) মতবাদ। তিনি বলে বসেন যে, মানুষ একটু উঁচু জাতের লেজবিহীন বানর ছাড়া বেশি কিছু নয়। আশ্চর্য বিষয় হলো, উনবিংশ শতাব্দীর সমাজবিজ্ঞানী সেক্যুলার দার্শনিকদের দ্বারা এ মত ব্যাপকভাবে গৃহীত হয়। কারণ, এ মতবাদের মাধ্যমে আপাতঃ হলেও স্রষ্টার অস্তিত্ব অস্বীকারের পক্ষে একটা বৈজ্ঞানিক ভিত্তি পাওয়া গিয়েছিল। তাদের মতে, সামাজিক বিবর্তনের মাধ্যমে মানুষ যেমন স্বতন্ত্র স্বাধীন ব্যক্তিসত্তা থেকে জাতীয় রাষ্ট্রের ধারায় উন্নীত হয়েছে; যেভাবে শারীরিক বিবর্তনের মাধ্যমে বানর থেকে মানুষে রূপান্তরিত হয়েছে; একই সাথে সর্বপ্রাণবাদের (Animism) ধারণা বিবর্তনের মাধ্যমে স্রষ্টার একত্ববাদ ভিত্তিক (Monotheism) ধর্মের উৎপত্তি হয়েছে।

কোনো সৃষ্টিকর্তা নেই বলে দাবি করার মাধ্যমে বিবর্তনবাদীরা সৃষ্টি সম্পর্কিত যাবতীয় প্রশ্ন এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। এই দাবি করতে গিয়ে তারা আল্লাহর আদি ও অন্তহীন হওয়ার বৈশিষ্ট্য দুটোকে তাঁর সৃষ্ট পদার্থের উপর আরোপ করে। বর্তমানকালে কার্ল মার্ক্সের (Karl Marx) অনুসারী সাম্যবাদী এবং বৈজ্ঞানিক সমাজতান্ত্রিকরা এই মতবাদে বিশ্বাসী। এদের দাবি অনুযায়ী, অস্তিত্বান সকল কিছুর উদ্ভব হয়েছে গতিশীল পদার্থ থেকে। এদের আরও দাবি হলো, স্রষ্টা মানুষের কল্পনাপ্রসূত একটি মিথ্যা ধারণা। সমাজের শাসকগোষ্ঠী নিজেদের বংশানুক্রমিক শাসনক্ষমতাকে বৈধ বানানোর জন্য এবং নির্যাতিত জনগোষ্ঠী যে নির্মম বাস্তবতার মধ্যে জীবন যাপন করে তা থেকে তাদের মনোযোগ ভিন্নদিকে ঘুরিয়ে দেওয়ার জন্যই শাসকগোষ্ঠী স্রষ্টার ধারণা সৃষ্টি করেছে।

ভ্রান্ত সুফিবাদী মুসলিমদের মাঝেও এ ধরনের শির্ক প্রচলিত রয়েছে। এর একটি উদাহরণ হলো ইব্ন আরাবীর মতো সুফিদের প্রচারিত সর্বেশ্বরবাদ; বা সবকিছুই আল্লাহ এবং আল্লাহই সবকিছু। তারা আল্লাহর স্বতন্ত্র অস্তিত্বকে অস্বীকার করে এবং প্রকারান্তরে আল্লাহর অস্তিত্বকেই অস্বীকার করে। এই একই ধরনের চিন্তাধারা ব্যক্ত করেন সপ্তদশ শতাব্দীর এক ওলন্দাজ ইহুদি দার্শনিক, বারুচ স্পিনোজা (Baruch Spinoza)। তার দাবি অনুযায়ী, মানুষসহ মহাবিশ্বের সকল কিছুর সমষ্টিই হলো স্রষ্টা।

www.QuranerAlo.net

আল-আসমা' ওয়াস-সিফাত সংশ্লিষ্ট শির্ক

প্রচলিত পৌত্তলিক ধর্মের রীতি অনুযায়ী, আল্লাহর উপর তাঁর সৃষ্টির গুণাবলি আরোপ করা এবং আল্লাহর নাম ও গুণাবলিকে তাঁর সৃষ্টির উপর আরোপ করা—উভয়ই এই শ্রেণির শির্কের অন্তর্ভুক্ত।

১. আল্লাহর উপর মানবিক বৈশিষ্ট্য আরোপের কারণে সংঘটিত শির্ক

আল্লাহকে মানুষ এবং অন্যান্য জীবজন্তুর বৈশিষ্ট্য এবং আকৃতি প্রদানের মাধ্যমে এ ধরনের শিরক সংঘটিত হয়। মানুষ যেহেতু সকল প্রাণীর মধ্যে সবচেয়ে উন্নত, তাই মূর্তিপূজারীরা স্রষ্টাকে সাধারণত মানুষের আকৃতিতেই উপস্থাপন করে থাকে। ফলে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই চিত্রাঙ্কন, ঢালাই বা খোদাই কর্মের দ্বারা মানুষের আকৃতি এবং শারীরিক বৈশিষ্ট্য প্রদান করে তারা স্রষ্টার প্রতিমা বানায় এবং সেগুলোর উপাসনা করে। উদাহরণস্বরূপ, হিন্দু এবং বৌদ্ধরা এশিয়ান মানুষদের চেহারা বিশিষ্ট অসংখ্য প্রতিমার পূজা করে এবং সেগুলোকে সৃষ্টির মাঝে আবির্ভূত স্রষ্টার প্রতিমা বলে বিবেচনা করে। আধুনিক যুগের খ্রিষ্টানদের বিশ্বাস অনুযায়ী, নাবি ঈসা ছিলেন মানবীয় অবয়বে স্বয়ং স্রষ্টা এবং স্রষ্টা নিজেই তাঁর সৃষ্টির রূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন। তাদের এই বিশ্বাসও শির্কের এই শ্রেণিতেই পড়ে। অনেক প্রসিদ্ধ খ্রিষ্টান চিত্রশিল্পীদের অন্যতম মাইকেলেঞ্জেলো (Michaelangelo, মৃত্যু ১৫৬৫)। তিনি স্রষ্টাকে সুদীর্ঘ সাদা চুল এবং দাড়ি বিশিষ্ট এক উলঙ্গ ইউরোপীয় বৃদ্ধ হিসেবে কল্পনা করে ভ্যাটিকানে অবস্থিত সিস্টিন চ্যাপেলের (Sistine Chapel) ছাদে স্রষ্টার অনেক ছবি এঁকেছিলেন। কালক্রমে এই ছবিগুলো খ্রিষ্টানদের কাছে সর্বোচ্চ শ্রদ্ধার পাত্রে পরিণত হয়েছে।

২. মানুষের উপর আল্লাহর বৈশিষ্ট্য আরোপের কারণে সংঘটিত শির্ক

আল-আসমা' ওয়াস-সিফাত সংশ্লিষ্ট এই প্রকার শির্ক সংঘটিত হয় যখন আল্লাহর কোনো নাম বা গুণকে তাঁরই সৃষ্ট কোনো জীব বা জড়বস্তুর উপর আরোপ করা হয়। উদাহরণস্বরূপ, প্রাচীন আরবরা এমনসব মূর্তির

www.QuranerAlo.net

পূজা করত যেগুলোর নামের উৎপত্তি হয়েছিল আল্লাহর বিভিন্ন নাম থেকে। তাদের প্রধান তিনটি মূর্তির নাম ছিল আল-লাত, যার উৎপত্তি আল্লাহর নাম আল-ইলাহ্ থেকে; আল-উয্যা, এসেছে আল-আযীয থেকে; এবং আল-মানাত এসেছে আল-মান্নান থেকে। মুহাম্মাদ ﷺ-এর জীবদ্দশাতেই আরবের ইয়ামামা এলাকায় এক ভণ্ড নাবির আবির্ভাব ঘটেছিল, যে নিজের নাম দিয়েছিল রহ্মান। অথচ এই নামটি শুধু আল্লাহর জন্যই নির্ধারিত।

শিয়াদের একটি দল হলো সিরিয়ার নুসাইরিয়্যাহ সম্প্রদায়। এরা আলি ইব্ন আবি তালিবকে মানুষরূপে আবির্ভূত আল্লাহ বলে বিশ্বাস করে এবং তার উপর আল্লাহর অনেকগুলো বৈশিষ্ট্য আরোপ করে। শিয়াদের মধ্যে ইসমাঈলী নামে একটি সম্প্রদায় রয়েছে, যারা আগাখানী বলে পরিচিত। এরাও এদের নেতা, আগা খানকে মানুষরূপে আবির্ভূত স্রষ্টা বলে বিবেচনা করে। লেবাননের দ্রুয (Druze) সম্প্রদায়ও এই শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত যারা বিশ্বাস করে যে, ফাতেমীয় খলিফা, আল হাকিম বি-আম্রিল্লাহ মানবজাতির মাঝে মানুষরূপে স্রষ্টার চূড়ান্ত আবির্ভাব।

ভ্রান্ত সুফিবাদীদের নেতা আল-হাল্লাজ ও তার অনুসারীদের দাবি হলো তারা স্রষ্টার সাথে একাকার হয়ে গেছে। অতএব সৃষ্টির মাঝে তারা স্রষ্টার মানুষরূপী বহিঃপ্রকাশ। তাদের এই দাবিও আল-আসমা' ওয়াস-সিফাত সংশ্লিষ্ট এই প্রকার শির্কের অন্তর্ভুক্ত। শার্লী ম্যাক্লেইন (Shirley Maclaine) এবং জে. যেড. নাইট (J.Z. Knight) এর মতো অনেক সুফিবাদী এবং আত্মার জগতের সাথে যোগাযোগ করতে সক্ষম বলে দাবিদাররা প্রায়শ নিজেদেরকে এবং পাশাপাশি গোটা মানবজাতিকে স্রষ্টাতুল্য বলে দাবি করে থাকে। আইনস্টাইনের যে আপেক্ষিক তত্ত্বটি ($E=mc^2$ অর্থাৎ, শক্তি হলো ভর এবং আলোর গতির বর্গের গুণফলের সমান) সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানেই পড়ানো হয়, তা মূলত আল-আসমা' ওয়াস-সিফাত সংশ্লিষ্ট এই প্রকার শিরকের বহিঃপ্রকাশ। এই তত্ত্ব অনুযায়ী, শক্তিকে ধ্বংস বা সৃষ্টি করা যায় না। শক্তি কেবল রূপান্তরিত হয়ে পদার্থে, অথবা পদার্থ রূপান্তরিত হয়ে শক্তিতে পরিণত হয়। তবে বাস্তব সত্য হলো, পদার্থ এবং শক্তি উভয়ই সৃষ্ট সত্তা এবং এদের উভয়ই ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে।

www.QuranerAlo.net

এই মর্মে আল্লাহ ﷻ সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করেছেন,

كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ ﴿٢٦﴾

"পৃথিবীতে যা কিছু রয়েছে, সবই ধ্বংসশীল।" (আর-রহমান, ৫৫:২৬)

اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ

"আল্লাহ সবকিছুর স্রষ্টা এবং তিনি সবকিছুর তত্ত্বাবধায়ক।"

(আয-যুমার, ৩৯:৬২)

এই তত্ত্বের আরও অর্থ হলো, পদার্থ বা পদার্থের ভর এবং শক্তি যেহেতু সৃষ্ট কোনো সত্তা নয়, বরং একটি আরেকটিতে রূপান্তরিত হয়ে থাকে; তাই এরা চিরস্থায়ী এবং এদের কোনো শুরু বা শেষ নেই। অথচ সত্য হলো, এই গুণ কেবল আল্লাহরই জন্য যাঁর কোনো শুরু বা শেষ নেই।

ডারউইনের বিবর্তনবাদও হলো স্রষ্টার হস্তক্ষেপ ছাড়াই প্রাণহীন পদার্থ থেকে বিভিন্ন প্রাণীর উদ্ভব এবং তাদের ক্রমবিকাশকে ব্যাখ্যা করার একটি প্রচেষ্টা। বর্তমান শতাব্দীর অন্যমত শীর্ষ ডারউইনবাদী, স্যার অ্যাডলাস হাক্সলি এ মতবাদ সম্পর্কে বলেন,

"ডারউইনবাদ প্রাণীসত্তার রূপকার হিসেবে স্রষ্টার পুরো ধারণাকেই অস্বীকার করেছে।"[১৫]

(১৫) ফ্র্যান্সিস হিচিং (Francis Hitching) এর The Neck of the Giraffe, (New York: Ticknor and Fields, ১৯৮২, পৃ. ২৫৪ from Tax and Callender, ১৯৬০, vol. III, পৃ. ৪৫) –তে উদ্ধৃত।

www.QuranerAlo.net

‘ইবাদাত সংশ্লিষ্ট শির্ক

আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারও জন্য ‘ইবাদাত করা এবং আল্লাহর পরিবর্তে তাঁর সৃষ্টির কাছে কোনো ‘ইবাদাতের প্রতিদান চাওয়া হলো এই প্রকার শির্কের অন্তর্ভুক্ত। উল্লিখিত প্রকারভেদগুলোর মতো এই শির্কেরও দুটি শ্রেণি রয়েছেঃ

১. আশ-শির্ক আল-আকবার (গুরুতর শির্ক)

যেকোনো ‘ইবাদাত আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারও উদ্দেশ্যে নিবেদন করা হলে এই প্রকার শির্ক সংঘটিত হয়। এটি মূর্তিপূজার সমতুল্য শিরকের সবচেয়ে সুস্পষ্ট রূপ। এই শির্ক থেকে মানবজাতিকে রক্ষা করার জন্যই আল্লাহ যুগে যুগে নাবিদের প্রেরণ করেছিলেন। যেমন আল্লাহ ﷻ বলেন,

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ

“আমি অবশ্যই প্রত্যেক জাতিতে এই মর্মে একজন রসূল প্রেরণ করেছি যে, তোমরা আল্লাহর ‘ইবাদাত করো এবং তাগূতকে বর্জন করো।”

(আন-নাহ্‌ল, ১৬:৩৬)

আল্লাহর পাশাপাশি কিংবা আল্লাহ ব্যতীত অন্য যা কিছুরই ‘ইবাদাত করা হয়, তা-ই তাগূত। উদাহরণস্বরূপ, ভালোবাসা একটি ‘ইবাদাত। তাই চূড়ান্ত ও পরম ভালোবাসা শুধুমাত্র আল্লাহর জন্যই নিবেদিত হওয়া চাই। ইসলামে স্রষ্টার নিরংকুশ আনুগত্য করাই হলো তাঁর প্রতি ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ। এটা সে ভালোবাসা নয় যা মানুষ স্বভাবগতভাবে বাবা-মা, সন্তান-সন্ততি, বাসস্থান, বা কোনো খাদ্যদ্রব্য ইত্যাদির প্রতি অনুভব করে থাকে। স্রষ্টার প্রতি এই ধরনের ভালোবাসা নিবেদন করলে তাঁকে তাঁর সৃষ্টির স্তরে নামিয়ে আনা হয়। আর এটা আল-আসমা’ ওয়াস-সিফাত সংশ্লিষ্ট শির্কের অন্তর্ভুক্ত। যে ভালোবাসা ‘ইবাদাত বলে গণ্য তা হলো, নিজের ইচ্ছাকে সম্পূর্ণরূপে স্রষ্টার কাছে সমর্পণ করা, তাঁর কাছে নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ করা। এ কারণেই আল্লাহ ﷻ নাবি ﷺ-কে নির্দেশ দিয়ে বলেছেন,

www.QuranerAlo.net

قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ

"বলো, যদি তোমরা আল্লাহকে ভালোবাসো, তাহলে আমার অনুসরণ করো, তাহলে আল্লাহও তোমাদেরকে ভালোবাসবেন।" (আলি ইমরান ৩:৩১)

অধিকন্তু, নাবি ﷺ নিজেও বলেছেন,

"তোমাদের কেউ ততক্ষণ পর্যন্ত সত্যিকার মু'মিন হতে পারবে না, যতক্ষণ না সে আমাকে তার সন্তান, তার পিতা এবং সকল মানুষের চেয়ে বেশি ভালোবাসে।"(১৬)

নাবির প্রতি ভালোবাসা তাঁর কোনো মানবিক গুণ-বৈশিষ্ট্যের কারণে নয়; বরং তাঁকে ভালোবাসার মূল কারণ হলো, তিনি মহান আল্লাহর বার্তাবাহক। কাজেই আল্লাহকে ভালোবাসার মতো নাবির প্রতি ভালোবাসারও বহিঃপ্রকাশ ঘটে তাঁর নির্দেশসমূহের পূর্ণ আনুগত্যের মাধ্যমে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ ﷻ বলেন,

مَّن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ

"যে রসূলের আনুগত্য করবে, সে আল্লাহর আনুগত্য করল।"

(আন-নিসা', ৪:৮০)

قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ

"বলুন, তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য করো।"

(আলি-ইমরান, ৩:৩২)

মানুষ যখন আল্লাহর প্রতি তার ভালোবাসার মধ্যে অন্য কোনো ব্যক্তি বা বস্তুকে প্রতিবন্ধক হওয়ার সুযোগ দেয়, তখনই ধরে নিতে হবে যে,

---

(১৬) আনাস ﷺ থেকে বর্ণিত এবং ইমাম বুখারি কর্তৃক সংকলিত (ইংরেজি আরবি), খণ্ড ১, পৃ. ২০, হাদীস নং ১৩ এবং মুসলিম, (ইংরেজি অনুবাদ), খণ্ড ১, পৃ. ৩১, হাদীস নং ৭১।

www.QuranerAlo.net

সে ওই ব্যক্তি বা বস্তুরও উপাসনা করে। এভাবেই অর্থ-বিত্ত, ধন-সম্পদ মানুষের উপাস্য হয়ে যায়। এমনকি মনের আকাঙ্ক্ষাও মানুষের উপাস্য হয়ে দাঁড়াতে পারে। নাবি ﷺ বলেছেন,

"ধ্বংস হোক দিরহাম পূজারীরা।"(১৭)

এবং কুর'আনে আল্লাহ ﷻ বলেছেন,

أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ

"আপনি কি তাকে দেখেননি, যে তার প্রবৃত্তিকে নিজের উপাস্য বানিয়ে নিয়েছে?"

(আল-ফুরকান, ২৫:৪৩)

'ইবাদাত উপাসনা সংশ্লিষ্ট শির্কের ব্যাপারে সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়ার কারণ হলো, এটা সবচেয়ে গুরুতর পাপাচার। কারণ এই শির্ক স্বয়ং সৃষ্টির মূল উদ্দেশ্যের সাথেই সাংঘর্ষিক। যেমনটি আল্লাহ ﷻ বলেছেন,

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿٥٦﴾

"আর আমি জিন ও মানুষকে কেবল এজন্যই সৃষ্টি করেছি যে, তারা আমার 'ইবাদাত করবে।" (আয-যারিয়াত, ৫১:৫৬)

বড় শির্ক হলো মহাবিশ্বের স্রষ্টা ও প্রতিপালকের বিরুদ্ধে সবচেয়ে ধৃষ্টতাপূর্ণ আচরণ এবং সর্বনিকৃষ্ট পাপ। এটি এত বড় পাপ যে, এর দ্বারা মানুষের অন্য সকল নেক আমলও বিনষ্ট হয়ে যায় এবং তার জন্যে জাহান্নামের চিরস্থায়ী শাস্তি অবধারিত হয়ে পড়ে।

প্রতিটি মিথ্যা ধর্মের মূল ভিত্তিই হলো এই প্রকার শির্ক। মানবরচিত সকল মতবাদ কোনো না কোনোভাবে তার অনুসারীদেরকে সৃষ্টির উপাসনার দিকে ঠেলে দেয়। বর্তমান খ্রিস্টধর্মের অনুসারীরা নাবি ঈসা ﷺ কে মানুষরূপে আবির্ভূত ঈশ্বর বলে দাবি করে তার 'ইবাদাত করে। ক্যাথলিক খ্রিস্টানরা

(১৭) ইমাম বুখারি কর্তৃক সংকলিত, (ইংরেজি আরবি), খণ্ড ৮, পৃ. ২৯৬, হাদীস নং ৪৪৩।

www.QuranerAlo.net

মারইয়াম বা মেরিকে 'ঈশ্বরের মাতা' হিসেবে তার কাছে প্রার্থনা করে। তারা বিভিন্ন ফেরেশতা যেমন মীকাঈল বা মাইকেল এর কাছে প্রার্থনা করে। এই ফেরেশতার(১৮) নামে তার সম্মানার্থে ২৯ সেপ্টেম্বর মিক্‌লমাস দিবস (Michaelmas Day) উদ্‌যাপন করে। এছাড়াও বাস্তব-অবাস্তব নির্বিশেষে বহু সাধু-সন্ন্যাসীর কাছেও তারা প্রার্থনা করে।

নাবি মুহাম্মাদ ﷺ কিংবা বিভিন্ন পির-ফকির, সুফি দরবেশদের কাছে দুআ করা এই প্রকার শির্কের আওতায়ই পড়ে। কারণ আল্লাহ কুর'আনে সুস্পষ্টভাবে বলে দিয়েছেন,

قُلْ أَرَأَيْتَكُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللَّهِ أَوْ أَتَتْكُمُ السَّاعَةُ أَغَيْرَ اللَّهِ تَدْعُونَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٤٠﴾

"বলুন, তোমরা কি ভেবে দেখেছ, যদি তোমাদের উপর আল্লাহর আযাব আপতিত হয় অথবা কিয়ামাত এসে পড়ে, তবে কি তোমরা আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে ডাকবে, যদি তোমরা সত্যবাদী হও?" (আল-আনআম, ৬:৪০)

২. আশ-শির্ক আল-আস্‌গার (ছোট শির্ক)

মাহ্‌মুদ ইব্‌ন লুবাইদ বর্ণনা করেন, "আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেনঃ

"আমি তোমাদের ক্ষেত্রে যা নিয়ে সবচেয়ে বেশি ভয় করছি তা হলো ছোট শির্ক। সহাবিগণ জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রসূল! ছোট শির্ক কী? তিনি বললেন, আর-রিয়া'' (লোক দেখানো 'ইবাদাত)। কারণ কিয়ামাতের দিন মানুষেরা যখন তাদের প্রতিদান গ্রহণ করবে, তখন আল্লাহ বলবেন, দুনিয়াতে যাদের দেখানোর জন্য 'ইবাদাত করতে তাদের কাছে যাও এবং দেখ, তাদের থেকে কোনো প্রতিদান পাও কি না।" (১৯)

---

(১৮) William Halsey (ed.), Colliers Encyclopedia, (U.S.A.: Crowell-Collier Educational Foundation, 1970. Vol. 16, পৃ. ১১০).

(১৯) হাদীসটি আহ্‌মাদ, আত-তাবারানি এবং আল-বায়হাকি তার আয-যুহ্‌দ গ্রন্থে সংকলন করেছেন। তাইসীর আল-আযীয আল-হামিদ, পৃ. ১১৮ দ্রষ্টব্য।

www.QuranerAlo.net

মাহ্‌মুদ ইব্‌ন লুবাইদ আরও বলেন, নাবি ﷺ একদিন বেরিয়ে এসে ঘোষণা দেন,

"হে লোকেরা! গোপন শির্কের ব্যাপারে সাবধান হও! লোকেরা জানতে চাইলো, হে আল্লাহর রসূল! গোপন শির্ক কী? তিনি বললেন, লোকেরা তার দিকে তাকিয়ে আছে বলে কেউ যখন স্বলাতের জন্য দাঁড়ায় এবং স্বলাতকে সুন্দর করার চেষ্টা করে, সেটিই গোপন শির্ক।'" (২০)

আর-রিয়া'

মানুষকে দেখানোর জন্য এবং মানুষের প্রশংসা লাভের উদ্দেশ্যে 'ইবাদাত করা হলো রিয়া'। এই পাপ নেক আমলের মধ্যে নিহিত কল্যাণকে ধ্বংস তো করেই; উপরন্তু তা ব্যক্তির জন্য ভয়ানক শাস্তি বয়ে আনে। এই পাপটি বিশেষভাবে ভয়ানক হওয়ার কারণ হলো, মানুষ স্বাভাবিকভাবেই অন্যদের থেকে নিজের প্রশংসা কামনা করে এবং প্রশংসা তাকে আনন্দিত করে। অতএব, নিজের সম্পর্কে অন্যকে উচ্চ ধারণা দেওয়া কিংবা অন্যের প্রশংসা লাভের জন্য কোনো সৎকর্ম করা একটি গর্হিত অপরাধ। এ থেকে বাঁচার প্রয়োজন সর্বোচ্চ গুরুত্বের দাবি রাখে। যেসব মু'মিনরা জীবনের প্রতিটি কর্মকে আল্লাহর উদ্দেশ্যে নিবেদিত 'ইবাদাতে পরিণত করতে চান, তাদের জন্য রিয়া' এক ভয়ানক বিপদ। তবে এটাও সত্য যে, জ্ঞানসম্পন্ন সত্যিকার মু'মিনের দ্বারা বড় শির্ক সংঘটিত হওয়ার সম্ভাবনাও অনেক কম। কারণ এই প্রকার শির্কের ফাঁদগুলো খুবই স্পষ্ট। কিন্তু আর সবার মতো একজন সত্যিকার মু'মিনেরও রিয়ায় আক্রান্ত হয়ে পড়ার ঝুঁকি অনেক বেশি। কারণ এটি খুবই গোপন ও সূক্ষ্ম বিষয়। শুধু মনের উদ্দেশ্যটুকু বদলে যাওয়াই এক্ষেত্রে যথেষ্ট। এই পাপে প্রলুব্ধকারী শক্তিও খুব প্রবল। কারণ এর উৎস হলো মানুষের মনের গভীরে লুক্কায়িত প্রবৃত্তি। ইব্‌ন 'আব্বাস ﷺ এই নির্মম সত্যের প্রতি ইঙ্গিত করে বলেন,

(২০) ইব্‌ন খুযাইমাহ্ কর্তৃক সংকলিত।

www.QuranerAlo.net

"মধ্য রাতের নিকষ আঁধারে একখণ্ড কালো পাথরের গা বেয়ে চলা একটি কালো পিপীলিকার চেয়েও গোপন হলো শির্ক।"(২১)

সুতরাং, প্রতিটি সৎকর্ম যেন বিশুদ্ধ উদ্দেশ্য নিয়ে শুরু হয় এবং তা যেন সর্বাবস্থায় বজায় থাকে, তা নিশ্চিত করার জন্য গভীরভাবে যত্নবান হতে হবে। এ জন্য ইসলামে সকল গুরুত্বপূর্ণ কাজের শুরুতে আল্লাহর নাম স্মরণ করার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। খাওয়া, পান করা, ঘুমানো, দৈহিক মিলন এবং এমনকি শৌচকর্মের মতো সকল স্বভাবজাত কাজকর্মের শুরুতে এবং শেষে পাঠ করার জন্যও বিভিন্ন দুআ নাবি ﷺ শিখিয়ে দিয়েছেন। যাতে এসব প্রাত্যহিক কর্মগুলো 'ইবাদাতে পরিণত হয় এবং মুসলিমদের মাঝে আল্লাহর সম্পর্কে গভীর সচেতনতা গড়ে ওঠে। এই সচেতনতাই হলো তাক্বওয়া যা অবশেষে নিয়্যাতের বিশুদ্ধতা নিশ্চিত করে থাকে।

শির্ক থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য নাবি ﷺ কিছু দুআও শিক্ষা দিয়েছেন। এগুলো যেকোনো সময় পাঠ করা যায়। আবূ মূসা ﷺ বলেন,

> "একদিন আল্লাহর রসূল তাঁর ভাষণে বলেন, হে লোকেরা! শির্ককে ভয় করো। কারণ তা অতি সন্তর্পণে হেঁটে চলা পিপীলিকার চেয়েও অস্পষ্ট।' তারা জানতে চাইলেন, হে আল্লাহর রসূল! এটি সন্তর্পণে হেঁটে চলা পিপীলিকার চেয়েও অস্পষ্ট হলে আমরা কীভাবে তা পরিহার করব?" তিনি বললেন, বলো,
>
> اَللّٰهُمَّ إِنَّا نَعُوْذُبِكَ أَنْ أُشْرِكَ شَيْئًا نَعْلَمُهُ وَنَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لَا نَعْلَمُهُ.
>
> "হে আল্লাহ! জেনে বুঝে শির্ক করা থেকে আমরা আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি; এবং আমাদের অজ্ঞাত শির্ক থেকেও আপনার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি।"(২২)

শির্কের উল্লিখিত তিনটি ক্ষেত্রের যেগুলোতে সবচেয়ে বেশি পরিমাণ শির্ক সংঘটিত হয়, পরবর্তী অধ্যায়গুলোতে সেগুলোর উপর বিস্তারিত আলোকপাত করা হবে ইনশা'আল্লাহ।

---

(২১) ইব্ন আবি হাতিম থেকে বর্ণিত এবং তাইসীর আল-আযীয আল-হামীদ এ উদ্ধৃত (পৃ. ৫৮৭)।

(২২) আহ্মাদ এবং আত-তাবারানি কর্তৃক সংকলিত।

www.QuranerAlo.net

তৃতীয় অধ্যায়

আদামের সাথে আল্লাহর অঙ্গীকার

বারযাখ

পুনর্জন্ম হলো হিন্দুদের একটি বিশ্বাস। এ বিশ্বাস মতে, মানুষের মৃত্যুর পর তার আত্মা নতুন কারো রূপ ধরে আবার পৃথিবীতে আসে। এ ধারণাকে ইসলাম কোনোভাবেই সমর্থন করে না।(১) এই মতবাদে বিশ্বাসীদের কেউ কেউ কর্ম(২) তত্ত্বে বিশ্বাস করে। এর অর্থ হলো, পার্থিব জীবনে ব্যক্তির কর্মকাণ্ডই মূলত নির্ধারণ করে পুনর্জন্মে সে কী হবে। তার কাজকর্ম যদি খারাপ হয়, তার পুনর্জন্ম হবে সমাজের নিচু জাতের কোনো মহিলার গর্ভে। উঁচু জাতে পুনর্জন্ম লাভের জন্য তাকে সৎকর্ম করতে হবে। আর তার কাজকর্ম ভালো হলে সে পুণ্যবান হিসেবে কোনো সম্ভ্রান্ত নারীর গর্ভে পুনর্জন্ম লাভ করবে। এভাবে সৎকর্মের ধারা বজায় রাখলে ধারাবাহিকভাবে আরও ভালো মানুষ হিসেবে আরও উঁচু জাতের কোনো নারীর গর্ভে তার পুনর্জন্ম হবে। এভাবে চলতে থাকবে, যতক্ষণ না সে ব্রাহ্মণ জাতের সদস্য হিসেবে উৎকর্ষের চূড়ান্ত স্তরে উন্নীত হবে। এই অবস্থায় উন্নীত হলে তার

---

(১) লেবাননের দ্রুয্ (Druze) এবং সিরিয়ার নুসাইরি (আলাউই) সম্প্রদায়ের মতো কিছু ইসলামচ্যুত ইসমাঈলী শিয়া সম্প্রদায় এই মতবাদকে গ্রহণ করেছে। (Shorter Enclycopedia of Islam, পৃ. ৯৪-৫, ৪৫৪-৫ দ্রষ্টব্য)।

(২) মৌলিক অর্থে, কার্‌মা' বলতে কোনো ক্রিয়া, কাজ বা কর্মকে বুঝায়। গৌণ অর্থে, এটি কর্মের ফল' কিংবা অতীতের সকল কর্মের ফলাফল' এর সমষ্টিকে বুঝায়। এই মর্মে, চান্দোগিয়া উপানিশাদে (বেদ) বলা আছে যে, যাদের অতীত কর্মসমূহ ভালো তারা মৃত্যুর পর ব্রাহ্মণ নারীর গর্ভে পুনর্জন্ম লাভ করবে। আবার যাদের কর্ম খারাপ হবে, তারা জাত-পাতহীন নারীর গর্ভে পুনর্জন্ম লাভ করবে। (Dictionary of Religion, পৃ. ১৮০ দ্রষ্টব্য)।

www.QuranerAlo.net

আত্মা বিশ্ব-আত্মা ব্রহ্মার সাথে পুনর্মিলিত হয়ে একাকার হয়ে পুনর্জন্ম চক্রের সমাপ্তি হবে। এই প্রক্রিয়ার নাম 'নির্বাণ'।

মুহাম্মাদ ﷺ সহ অতীতের সকল নাবিদের আনীত দীন অনুযায়ী, পৃথিবীতে কারও মৃত্যু হলে কিয়ামাত পর্যন্ত সে আর পুনর্জীবিত হবে না। বিশ্বজগৎ ধ্বংস হওয়ার পর সমগ্র মানবজাতি তাদের বিচারের জন্য উঠবে। তাদের বিচার করবেন সর্বশ্রেষ্ঠ বিচারক মহান আল্লাহ, যিনি 'ইবাদাতের যোগ্য একমাত্র সত্তা। মানুষের মৃত্যু হলে কিয়ামাত পর্যন্ত সে একটি মধ্যবর্তী অবস্থার মধ্যে থাকবে। এ অবস্থাটিকে আরবিতে বারযাখ'(৩) বলা হয়। এটা ভেবে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই যে, হাজার হাজার বছর আগে মারা যাওয়া একজন মানুষকে পুনর্জীবিত হওয়ার পূর্বে আরও হাজার হাজার বছর অপেক্ষা করতে হবে। কারণ নাবি ﷺ বলেছেন, প্রতিটি মানুষের মৃত্যুই হলো তার জন্য কিয়ামাতের শুরু। পৃথিবীতে যারা বেঁচে আছে তারাই কেবল সময়ের অস্তিত্ব বুঝতে পারে। মৃত্যুর মধ্য দিয়ে মানুষ সময়ের গন্ডি থেকে বের হয়ে যায়। হাজার বছর তার কাছে তখন চোখের একটি পলকে পরিণত হয়। এই বাস্তবতার দৃষ্টান্তস্বরূপ সূরা আল-বাক্বারাহতে আল্লাহ এক ব্যক্তির ঘটনা বর্ণনা করেছেন। এই ব্যক্তি একটি গ্রামকে পুনর্জীবিত করার ব্যাপারে আল্লাহর ক্ষমতা সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করেছিল। সন্দেহ করেছিল কীভাবে আল্লাহ মৃতকে জীবিত করবেন। ফলে আল্লাহ তাকে একশ বছরের জন্য মৃত্যুদান করলেন এবং তাকে পুনর্জীবিত করে জিজ্ঞেস করা হলো সে কতক্ষণ 'ঘুমিয়ে' ছিল। সে উত্তর দিয়েছিল,

يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ

"...একদিন বা একদিনের কিছু অংশ...।" (আল-বাক্বারাহ, ২:২৫৯)

---

(৩) আক্ষরিক অর্থে, একটি অন্তরায়। আল্লাহ বলেন, "অবশেষে যখন তাদের কারও মৃত্যু আসে, সে বলে, হে আমার রব, আমাকে ফেরত পাঠান, যেন আমি সৎকর্ম করতে পারি যা আমি ছেড়ে দিয়েছিলাম। কখনো নয়, এটি তার একটি কথা বৈ কিছুই নয় । যেদিন তাদেরকে পুনরুত্থিত করা হবে সেদিন পর্যন্ত তাদের সামনে থাকবে অন্তরায় [বারযাখ]।" (আল মু'মিনূন; ২৩:৯৯-১০০)

www.QuranerAlo.net

ঠিক একইভাবে, যারা দীর্ঘ সংজ্ঞাহীন অবস্থা থেকে আবার জেগে ওঠেন, তারা মনে করেন যে, তারা খুব সামান্য সময়ের জন্যই ওই অবস্থায় ছিলেন বা কোনো সময়ই অতিবাহিত হয়নি। অনেকে ঘন্টার পর ঘন্টা ঘুমিয়ে উঠে মনে করেন যে, তিনি চোখটা বুজেছিলেন মাত্র। সুতরাং, বারযাখ অবস্থায় শত শত বছর কীভাবে কাটবে তা নিয়ে ভেবে সময় নষ্ট করার কোনো মানে হয় না। কারণ সে অবস্থায় সময় কোনো প্রাসঙ্গিক বিষয়ই নয়।

সৃষ্টির পূর্বাবস্থা

আত্মার ধারাবাহিক পুনর্জন্মের ধারণাকে অস্বীকার করলেও, পৃথিবীতে ভূমিষ্ঠ হওয়ার পূর্বেই প্রতিটি শিশুর আত্মার যে একটা অস্তিত্ব রয়েছে, ইসলাম তা স্বীকার করে। নাবি ﷺ এ বিষয়টি এভাবে বর্ণনা দিয়েছেন যে,

> "আল্লাহ আদামকে সৃষ্টির পর আরাফার তারিখে[৪] নামান নামক স্থানে তার থেকে একটি অঙ্গীকার গ্রহণ করলেন। তারপর পৃথিবীর শেষমুহূর্ত পর্যন্ত তার যে সকল ভবিষ্যৎ বংশধর জন্মগ্রহণ করবে তাদেরকে প্রজন্মের পর প্রজন্ম আকারে বের করলেন। এরপর তাদের থেকে স্বীকারোক্তি আদায়ের জন্য তাদেরকে তাঁর সামনে ছড়িয়ে দিলেন। তিনি তাদের সাথে সরাসরি কথা বললেন, "আমি কি তোমাদের রব নই?" তারা সকলেই উত্তর দিল, হ্যাঁ, আমরা সাক্ষ্য দিলাম। তারপর আল্লাহ ব্যাখ্যা করলেন, কেন তিনি সমগ্র মানবজাতির থেকে এই সাক্ষ্য নিলেন যে, তিনিই তাদের স্রষ্টা এবং প্রভু। তিনি বললেন, তোমাদের থেকে এজন্যই সাক্ষ্য গ্রহণ করা হলো যেন, তোমরা কিয়ামাতের দিন বলতে না পারো যে, আমরা এসব কিছুই জানতাম না। আমরা জানতাম না যে, আপনিই ইলাহ, আমাদের রব। কেউ আমাদের বলেনি যে, আমাদেরকে শুধুমাত্র আপনারই 'ইবাদাত করতে হবে। আল্লাহ আরও ব্যাখ্যা করলেন যে, এটা এ কারণেও যেন মানুষ না বলে, আমাদের পূর্বপুরুষরাই (আল্লাহর সাথে) শির্ক করেছিল

(৪) দ্বাদশ চান্দ্রমাস, যুল-হিজ্জার ৯ তারিখ।

www.QuranerAlo.net

আর আমরা তো ছিলাম কেবল তাদের উত্তরসূরী: ওইসব বাতিলপন্থীরা যা করেছিল সেজন্য কি আপনি আমাদের ধ্বংস করে দিবেন?"(৫)

এটি হলো স্বয়ং নাবি ﷺ এর করা কুর'আনের আয়াতের ব্যাখ্যা। এ আয়াতে আল্লাহ ﷻ বলেছেন,

وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ ۖ قَالُوا بَلَىٰ ۛ شَهِدْنَا ۛ أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ ﴿١٧٢﴾ أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِن قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّن بَعْدِهِمْ ۖ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ ﴿١٧٣﴾

"স্মরণ করো, যখন তোমার রব বনী আদামের পৃষ্ঠদেশ হতে তাদের বংশধরকে বের করলেন এবং তাদেরকে তাদের নিজেদের উপর সাক্ষী করলেন যে, আমি কি তোমাদের রব নই? তারা বলল, হ্যাঁ, আমরা সাক্ষ্য দিলাম। যাতে কিয়ামাতের দিন তোমরা বলতে না পারো যে, নিশ্চয়ই আমরা এ বিষয়ে অনবহিত ছিলাম। অথবা তোমরা যাতে বলতে না পারো, আমাদের পূর্বপুরুষরাই পূর্বে শির্ক করছে, আর আমরা ছিলাম তাদের পরবর্তী বংশধর। সুতরাং বাতিলপন্থীরা যা করেছে, তার কারণে আপনি কি আমাদেরকে ধ্বংস করবেন?" (আল-আরাফ, ৭:১৭২-১৭৩)

এই আয়াত এবং এর ব্যাখ্যায় নাবি ﷺ এর দেওয়া বক্তব্য থেকে এটি নিশ্চিত যে, আল্লাহর প্রতি ঈমান আনয়ন প্রতিটি মানুষেরই ব্যক্তিগত দায়িত্ব। শেষ বিচারের দিন এই ব্যাপারে কোনো অজুহাত দেওয়া চলবে না। প্রতিটি মানুষের আত্মাতেই আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসের ছাপ এঁকে দেওয়া আছে এবং মুশরিকদেরকে তাদের জীবনের কোনো এক পর্যায়ে আল্লাহ আকার ইঙ্গিতে দেখিয়ে দেন যে, তাদের উপাস্য সত্যিকার মা'বূদ নয়। এ কারণেই সুস্থ

(৫) (আল-আরাফ ৭: ১৭২-১৭৩)। হাদীসটি ইব্ন 'আব্বাস ﷺ থেকে বিশুদ্ধ সূত্রে বর্ণিত এবং ইমাম আহ্মাদ কর্তৃক সংকলিত। আল-আলবানির সিলসিলাহ্ আল-আহাদীস্ আস-সাহীহাহ্ (কুয়েত : আদ-দার আস-সালাফীয়্যাহ্ এবং আম্মান : আল-মাকতাবাহ্ আল-ইসলামিয়্যাহা, ২য় সংস্করণ, ১৯৮৩, খণ্ড ৪, পৃ. ১৫৮, হাদীস্ নং ১৬২৩)।

www.QuranerAlo.net

মস্তিষ্কসম্পন্ন প্রতিটি মানুষের জন্য সেই স্রষ্টাকে বিশ্বাস করা আবশ্যক, যিনি তাঁর সৃষ্টি থেকে আলাদা এবং যিনি তাঁর সৃষ্টির মাঝে বিরাজমান নন।

নাবি ﷺ আরও বলেন,

"তারপর আল্লাহ প্রতিটি মানুষের দুই চোখের মধ্যখানে ঈমানের প্রতীক হিসেবে একটি নূরের চমক বসিয়ে দিলেন এবং আদামকে তাদের সবাইকে দেখালেন। অসংখ্য মানুষের চোখের মধ্যখানে আলোর সে দ্যুতি দেখে তিনি কিছুটা সন্ত্রস্ত হলেন। তাই তিনি আল্লাহকে জিজ্ঞেস করলেন, হে প্রতিপালক! এরা কারা? আল্লাহ তাকে বললেন যে, এরা সবাই তার ভবিষ্যৎ বংশধর। এরপর আদাম এমন একজনের দিকে নিবিড়ভাবে তাকাতে লাগলেন, যার আলোর দীপ্তি তাকে অভিভূত করল। তার সম্পর্কে তিনি জানতে চাইলে আল্লাহ বললেন, সে হলো তোমার বংশধরদের শেষ দিকের জাতিসমূহের মধ্যকার একজন, যার নাম দাউদ। আদাম তার বয়স জানতে চাইলেন। আল্লাহ যখন তাকে জানালেন যে, তার বয়স ষাট, তখন তিনি বললেন, হে প্রতিপালক! আমার বয়স থেকে চল্লিশ বছর নিয়ে তার বয়স বাড়িয়ে দিন।

আদামের আয়ু শেষ হয়ে গেলে মৃত্যুর ফেরেশতা চলে এলো। তখন তিনি বললেন, আমার বয়সের চল্লিশ বছর কি এখনও অবশিষ্ট নেই? তিনি উত্তর দিলেন, আপনি কি তা আপনার বংশধর দাউদকে দিয়ে দেননি? আদাম অস্বীকার করলেন যে তিনি দিয়েছেন এবং তাই তার বংশধররাও আল্লাহকে দেওয়া তাদের প্রতিশ্রুতি অস্বীকার করে। আদাম আল্লাহকে দেওয়া তার প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করল এবং তার পরবর্তী বংশধররাও একই কাজ করল। পরিণতিতে তারাও ভুলে নিমজ্জিত হলো।"(৬)

আদাম আল্লাহর সাথে তার অঙ্গীকারের কথা ভুলে গেলেন। শয়তানের ধোঁকায় প্ররোচিত হয়ে নিষিদ্ধ গাছের ফল খেলেন। একইভাবে মানবজাতির অধিকাংশই আল্লাহকে বিশ্বাস করার এবং শুধুমাত্র তাঁরই 'ইবাদাত করার কর্তব্যকে উপেক্ষা করল এবং সৃষ্টির পূজায় লিপ্ত হলো।"

(৬) হাদীসটি আবূ হুরায়রা ﷺ থেকে বিশুদ্ধ সূত্রে বর্ণিত এবং তিরমিযি কর্তৃক সংকলিত। আল-আক্বীদাহ্ আত-তাহাবিয়্যাহ্, (৮ম সংস্করণ, ১৯৮৪, আল-আলবানি কর্তৃক সম্পাদিত) এর পৃ. ২৪১, ২২১ নং পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

www.QuranerAlo.net

একথা বলার পর, নাবি ﷺ বললেন,

"তারপর আল্লাহ আদাম এবং তার সন্তানদের পৃষ্ঠদেশ থেকে যেসব বংশধরদের বের করেছিলেন, তাদের মধ্য থেকে একাংশকে উদ্দেশ করে বললেন, আমি এই লোকগুলোকে জান্নাতের জন্য সৃষ্টি করেছি এবং তারা জান্নাতের অধিবাসীদের মতো কাজ করবে। এরপর তিনি অন্য অংশকে উদ্দেশ করে বললেন, আমি এই লোকগুলোকে জাহান্নামের জন্য সৃষ্টি করেছি এবং তারা জাহান্নামের অধিবাসীদের মতোই কাজ করবে। নাবি ﷺ এর একথা শুনে সহাবাদের একজন জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রসূল! তাহলে সৎকর্ম করার অর্থটা কী? নাবি উত্তর দিলেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ যদি তাঁর কোনো বান্দাকে জান্নাতের জন্য সৃষ্টি করে থাকেন, তিনি তাকে ততক্ষণ পর্যন্ত জান্নাতের অধিবাসীদের মতো কাজ করতে সাহায্য করেন যতক্ষণ পর্যন্ত না সে তাদের মতো কাজ করে মৃত্যু বরণ করে। অতঃপর ওই কাজের জন্য তিনি তাকে জান্নাতে প্রবেশ করান। কিন্তু তিনি যদি কাউকে আগুনের জন্য সৃষ্টি করে থাকেন, তিনি তাকে ততক্ষণ পর্যন্ত এর অধিবাসীদের মতো কাজ করতে সাহায্য করেন, যতক্ষণ না সে তাদের মতো কাজ করে মৃত্যু বরণ করে: অতঃপর ওই কাজের জন্য তিনি তাকে আগুনে দেন।" (৭)

নাবি ﷺ এর বক্তব্যের অর্থ এই নয় যে, মানুষকে ইচ্ছার স্বাধীনতা দেওয়া হয়নি, বা ভালো-মন্দ পছন্দ করার সুযোগ দেওয়া হয়নি। যদি তা-ই হতো, তাহলে বিচারের মাধ্যমে পুরস্কার কিংবা শাস্তি দেওয়ার কোনো অর্থ থাকত না। কাউকে জান্নাতের জন্য সৃষ্টি করার অর্থ এটুকুই যে, ওই ব্যক্তিকে সৃষ্টি করার পূর্বেই আল্লাহ জানেন যে, সে ভালো কাজ করবে এবং জান্নাতীদের অন্তর্ভুক্ত হবে। সে কুফ্‌রির পরিবর্তে ঈমানকে এবং মন্দের পরিবর্তে ভালোকে গ্রহণ করবে।

যদি কেউ আল্লাহর প্রতি নিষ্ঠার সাথে ঈমান আনে এবং নেক কাজ করার চেষ্টা করে, আল্লাহ তার ঈমানী উন্নতি ও সৎকর্ম বৃদ্ধির সুযোগ দান

(৭) উমার ইবনুল-খাত্তাব ﷺ থেকে বিশুদ্ধসূত্রে বর্ণিত। সংকলন করেছেন ইমাম আবূ দাউদ [সুনান আবি দাউদ, (ইংরেজি অনুবাদ), খণ্ড ৩, পৃ. ১৩১৮, হাদীস নং ৪৬৮৬) এবং তিরমিযি ও আহ্‌মাদ [শাইখ আল-আলবানি কর্তৃক আল-আকীদাহ্ আত-তাহাবিয়্যাহ্, (৮ম সংস্করণ, ১৯৮৪) এর পৃ. ২৪০, ২২০ নং পাদটীকা দ্রষ্টব্য)

www.QuranerAlo.net

করেন। আন্তরিকভাবে ঈমান আনয়নকারীকে আল্লাহ কখনোই বিফল করেন না। এমনকি সে যদি বিপথেও চলে যায়, সঠিক পথে ফিরে আসতে আল্লাহ তাকে সাহায্য করেন। সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত হওয়ার কারণে আল্লাহ তাকে পার্থিব জীবনে শাস্তি দিতে পারেন। যেন সে তার ভুলগুলো ধরতে পারে এবং সংশোধনের জন্য সচেতন হয়। বাস্তবতা হলো, সত্যিকার মু'মিনের প্রতি আল্লাহ এতটাই দয়াবান যে, তাদের জীবনও এমন অবস্থায় নেন যখন তারা নেক কাজে রত থাকে। ফলে এটা নিশ্চিত হয়ে যায় যে, সে জান্নাতের সৌভাগ্যবান অধিবাসীদের অন্তর্ভুক্ত। পক্ষান্তরে, যদি কেউ আল্লাহকে অবিশ্বাস করে এবং সৎকাজ পরিত্যাগ করে, আল্লাহ তার জন্য মন্দ কাজকে সহজ করে দেন। সে তা করলেও আল্লাহ তাকে সাফল্য দান করেন। এই সাফল্য তাকে আরও বেশি পাপাচারে উদ্বুদ্ধ করতে থাকে। এভাবেই একসময় সে পাপিষ্ঠ অবস্থায় মারা যায় এবং তার কৃতকর্মের কারণে সে চিরকালের জন্য মর্মন্তুদ আগুনে নিক্ষিপ্ত হয়।

মানুষের প্রকৃতিগত স্বভাবঃ ফিত্‌রাহ্

যেহেতু আদামকে সৃষ্টি করার পর আল্লাহ প্রতিটি মানুষের কাছ থেকে তাঁর প্রভুত্বের স্বীকৃতি নিয়েছেন, তাই প্রতিটি মানব-আত্মায় এই শপথ এঁকে দেওয়া থাকে। এমনকি গর্ভাবস্থার পঞ্চম মাসে ভ্রূণের মধ্যে প্রাণ সঞ্চারের পূর্বেই তা হয়ে থাকে। ফলে সকল শিশু আল্লাহর প্রতি সহজাত বিশ্বাস নিয়েই জন্মগ্রহণ করে। এই সহজাত বিশ্বাসকে আরবিতে 'ফিত্‌রাহ্'[৮] বলা হয়। শিশুটিকে যদি একাই ছেড়ে দেওয়া হয়, সে আল্লাহর একত্বের চেতনা নিয়েই বড় হয়ে উঠবে। কিন্তু প্রতিটি শিশুই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে তার পারিপার্শ্বিকতা দ্বারা প্রভাবিত হয়ে যায়।

নাবি ﷺ বলেন, আল্লাহ ﷻ বলেছেন,

---

(৮) আল-আক্বীদাহ্ আত-তাহাবিয়্যাহ্, (৮ম সংস্করণ, ১৯৮৪, পৃ. ২৪৫)।

www.QuranerAlo.net

"আমি আমার বান্দাদেরকে সঠিক দীনের উপরই সৃষ্টি করেছিলাম, কিন্তু শয়তানরা তাদেরকে বিপথগামী করেছে।"(৯)

নাবি ﷺ আরও বলেন,

"প্রতিটি শিশুই ফিত্‌রাহ্‌র উপর জন্মগ্রহণ করে। কিন্তু তার বাবা-মা তাকে ইহুদি অথবা খ্রিস্টান বানায়। ঠিক যেভাবে কোনো প্রাণী একটি সুস্থ স্বাভাবিক বাচ্চার জন্ম দেয়। তোমরা অঙ্গহানি না করে থাকলে, এমন কোনো প্রাণী-শাবক কি দেখেছ, যা অঙ্গহীন হয়ে জন্মেছে?"(১০)

সুতরাং শিশুর শরীর যেমন আল্লাহর দেওয়া নিয়মসমূহের কাছে আত্মসমর্পণ করে, স্বভাবজাত কারণে তার আত্মাও এই সত্যকে মেনে নেয় যে, আল্লাহই তার স্রষ্টা ও প্রতিপালক। কিন্তু তার বাবা-মা তাকে তাদের পথ অনুসরণ করতে বাধ্য করে। জীবনের প্রাথমিক পর্যায়ে শিশুটি এতটা শক্তিশালীও থাকে না যে, সে তার বাবা-মাকে বাধা দেবে বা তাদের বিরোধিতা করবে। জীবনের এই স্তরে শিশুটি যে ধর্মের অনুসরণ করে তা প্রথাগত এবং শৈশবের দীক্ষানির্ভর ধর্ম। এর জন্য আল্লাহ তাকে প্রশ্নও করবেন না বা তাকে শাস্তিও দেবেন না। এই শিশু যখন প্রাপ্তবয়স্ক হবে এবং মিথ্যা ধর্ম সম্পর্কে সুস্পষ্ট প্রমাণ তার সামনে চলে আসবে, তখন তাকে অবশ্যই জ্ঞান এবং বিচারবুদ্ধি দ্বারা প্রমাণিত সত্যধর্মের অনুসরণ করতে হবে।(১১) জীবনের এই পর্যায়ে শয়তানরা তাকে পূর্বের ধর্মে থেকে যাওয়া কিংবা আরও বেশি বিপথগামী হওয়ার জন্য প্ররোচিত করতে সর্বোচ্চ চেষ্টা করবে। পথভ্রষ্টতাকে তার কাছে আকর্ষণীয় করা হবে। ফলে সঠিক সরল পথ খুঁজে পাওয়ার জন্য এখন তাকে অবশ্যই ফিত্‌রাহ্‌ এবং প্রবৃত্তির সংঘাতের মাঝে পড়তে হবে। সে যদি ফিত্‌রাহ্‌কে বেছে নেয়, প্রবৃত্তিকে পরাজিত করার জন্য আল্লাহ তাকে সাহায্য করবেন। এমনকি প্রবৃত্তির নাগপাশ থেকে মুক্তি পেতে যদি তার জীবন প্রায় শেষও হয়ে যায় তারপরও আল্লাহ তাকে

(৯) সহীহ্‌ মুসলিম, (ইংরেজি অনুবাদ), খণ্ড ৪, পৃ. ১৪৮৮, হাদীস্‌ নং ৬৮৫৩।
(১০) সহীহ্‌ মুসলিম, (ইংরেজি অনুবাদ), খণ্ড ৪, পৃ. ১৩৯৮, হাদীস্‌ নং ৬৪২৩ এবং আল-বুখারি, (আরবি-ইংরেজি), খণ্ড ৮, পৃ. ৩৮৯-৩৯০, হাদীস্‌ নং ৫৯৭।
(১১) আল-আক্বীদাহ্‌ আত-তাহাবিয়্যাহ্‌, (৫ম সংস্করণ, ১৯৭২, পৃ. ২৭৩)।

www.QuranerAlo.net

সাহায্য করবেন। কারণ অনেক মানুষ অনেক অনেক পদক্ষেপ নিলেও, অনেক সময় ইসলাম গ্রহণ করতে তারা দেরি করে ফেলেন।

ফিত্‌রাহবিরোধী অপশক্তির প্রবল প্রভাবের কারণে, আল্লাহ কিছু মানুষকে নির্বাচিত করে তাদেরকে জীবনের সঠিক পথটি সুস্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছেন। তারা হলেন আল্লাহর নাবিগণ। তারা এসেছিলেন আমাদের ফিত্‌রাহবিরোধী অপশক্তিকে পরাজিত করে আমাদেরকে সাহায্য করার জন্য। আজকের পৃথিবী জুড়ে প্রতিটি সমাজে যত সত্য এবং সুন্দর রীতিনীতি প্রচলিত আছে, তার সবগুলোই এসেছে নাবিদের শিক্ষা থেকে। তাদের এসব শিক্ষা না থাকলে, পৃথিবীতে আদৌ কোনো শান্তি বা নিরাপত্তা থাকত না। উদাহরণস্বরূপ, পাশ্চাত্যের অধিকাংশ দেশগুলোর আইন-কানুন নাবি মূসা ﷺ এর "দশ বিধান" এর উপর ভিত্তি করে প্রণীত। যেমন, "তোমরা চুরি করবে না" এবং "তোমরা হত্যা করবে না।" অথচ তারা নিজেদেরকে ধর্মনিরপেক্ষ সরকার বলে দাবি করে।

কাজেই মানুষের কর্তব্য হলো, নাবিদের দেখানো পথ অনুসরণ করা। কারণ তাদের দেখানো পথই কেবল মানব প্রকৃতির সাথে সত্যিকার অর্থে সঙ্গতিপূর্ণ। নিছক সামাজিক বা পূর্বপুরুষদের প্রথা অনুসরণের ব্যাপারে মানুষকে খুবই সতর্ক থাকতে হবে। বিশেষ করে যদি সে জানে যে, এটা অন্যায়। সত্যের অনুসরণ না করলে সে হবে ওইসব বিপথগামী লোকদের মতো যাদের সম্পর্কে আল্লাহ ﷻ বলেছেন,

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا ۗ أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ ﴿١٧٠﴾

"যখন তাদেরকে বলা হয়, তোমরা আল্লাহ যা নাযিল করেছেন তা অনুসরণ করো, তারা বলে, বরং আমরা অনুসরণ করব আমাদের পিতৃ-পুরুষদেরকে যার উপর পেয়েছি। যদি তাদের পিতৃ-পুরুষরা কিছু না বুঝে এবং হিদায়াতপ্রাপ্ত না হয়, তাহলেও কি?" (আল-বাক্বারাহ, ২:১৭০)

www.QuranerAlo.net

এমনকি আল্লাহ ও তাঁর রসূলের পর বাবা-মায়ের আনুগত্যকে সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া সত্ত্বেও আমাদেরকে বাবা-মায়ের ওইসব বিষয়ে আনুগত্য করতে আল্লাহ ﷻ নিষেধ করেছেন, যা নাবিদের আদর্শের পরিপন্থী। তিনি কুর'আনে বলেছেন,

وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا ۖ وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا ۚ

"আর আমি মানুষকে নির্দেশ দিয়েছি তার বাবা-মায়ের সাথে সদাচরণ করতে। তবে যদি তারা তোমার উপর অপচেষ্টা চালায় আমার সাথে এমন কিছুকে শরিক করতে যার সম্পর্কে তোমার কোনো জ্ঞান নেই, তাহলে তুমি তাদের আনুগত্য করবে না।...." (আল-আনকাবুত; ২৯:৮)

জন্মসূত্রে মুসলিম

মুসলিম পরিবারে জন্ম লাভের সৌভাগ্য হয়েছে এমন 'মুসলিমদের' অবশ্যই মনে রাখা উচিত যে, এ কারণে এমনিতেই তারা জান্নাত পেয়ে যাবেন না। কারণ নাবি ﷺ সতর্ক করে বলেছেন যে, মুসলিম জাতির একটি বিরাট অংশ ইহুদি-খ্রিষ্টানদের এমনভাবে অনুসরণ করবে যে, তারা যদি গুইসাপের গর্তে প্রবেশ করে, তারাও তাদের পিছু নেবে।[১২] তিনি আরও বলেছেন যে, কিয়ামাতের পূর্বে কিছু মুসলিম বাস্তবেই মূর্তিপূজা করবে।[১৩] এদের সবাই মুসলিম নাম ধারণ করবে এবং নিজেদেরকে মুসলিম বলে বিবেচনা করবে। কিন্তু শেষ বিচারের দিন এসব তাদের কোনো উপকারেই আসবে না। আজ সবখানেই এমন একদল মুসলিম রয়েছে যারা মৃতদের

(১২) আবূ সাঈদ আল-খুদ্‌রি ﷺ থেকে বর্ণিত। আল-বুখারি, (আরবি-ইংরেজি), খণ্ড ৯, পৃ. ৩১৪-৫, হাদীস্ নং ৪২২ এবং মুসলিম, (ইংরেজি অনুবাদ), খণ্ড ১, পৃ. ১৪০৩, হাদীস্ নং ৬৪৪৮।

(১৩) আবূ হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত। আল-বুখারি, (আরবি-ইংরেজি), খণ্ড ৯, পৃ. ১৭৮, হাদীস্ নং ২৩২ এবং মুসলিম, (ইংরেজি অনুবাদ), খণ্ড ৪, পৃ. ১৫০৬, হাদীস্ নং ৬৯৪৪-৫।

www.QuranerAlo.net

কাছে প্রার্থনা করছে, কবরের উপর স্মৃতিসৌধ এবং মাসজিদ নির্মাণ করছে, এমনকি সেগুলোকে সামনে রেখে 'ইবাদাত করছে। এমনও লোক আছে যারা নিজদেরকে মুসলিম দাবি করে, আবার আলিকে আল্লাহ মনে করে তার পূজা করে।[১৪] অনেকেই কুর'আনকে সৌভাগ্যের মন্ত্র বানিয়ে গলায়, গাড়ীতে, চাবির রিং ইত্যাদিতে ঝুলিয়ে রেখেছে। কাজেই পূর্বপুরুষদের অন্ধ অনুসারী এমন মুসলিম সমাজে জন্মগ্রহণকারীদেরকে অবশ্যই ভেবে দেখতে হবে, তারা কি ঘটনাক্রমে মুসলিম নাকি ইসলাম ধর্মকে তারা সত্যিই পছন্দ করে গ্রহণ করেছে। তাদের বাবা-মা কিংবা সমাজ ও জাতির লোকেরা যা করে, সেটাই কি তাদের কাছে ইসলাম? নাকি কুর'আন যা শিক্ষা দেয় এবং নাবি ﷺ ও তাঁর সহাবিগণ যা করেছিলেন তা-ই ইসলাম?

একটি নির্ধারিত অঙ্গীকার

সৃষ্টির পূর্বেই প্রতিটি মানুষ আল্লাহর কাছে অঙ্গীকার করেছিল যে, তারা তাঁকে প্রভু এবং প্রতিপালক হিসেবে স্বীকার করবে এবং কোনো অবস্থাতেই তিনি ছাড়া অন্য কারও 'ইবাদাত করবে না। এটিই হলো শাহাদাহ্‌র মৌলিক তাৎপর্য। 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' (আল্লাহ ছাড়া প্রকৃত কোনো ইলাহ নেই) হলো আল্লাহর একত্বের স্বীকৃতি যা কালিমা আত-তাওহীদ নামেও পরিচিত। মুসলিম হতে হলে এই স্বীকৃতি দেওয়া অপরিহার্য। দুনিয়াতে স্রষ্টার একত্বের স্বীকৃতি দেওয়ার মাধ্যমে রূহের জগতে থাকতে নেওয়া সেই অঙ্গীকারকেই পুনঃস্বীকৃতি দেওয়া হয় মাত্র। কিন্তু প্রশ্ন হলো, কীভাবে সেই অঙ্গীকার বাস্তবায়ন করতে হবে?

সেই অঙ্গীকারের বাস্তবায়ন হবে যদি অন্তর দিয়ে বিশুদ্ধভাবে তাওহীদে বিশ্বাস করা হয় এবং বাস্তব জীবনে সেই বিশ্বাসের প্রয়োগ করা হয়। তাওহীদের প্রয়োগ হলো সব ধরনের শির্ক বর্জন করা এবং শেষ নাবির পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুসরণ করা, আল্লাহ যাকে তাওহীদভিত্তিক জীবনের বাস্তব এবং জীবন্ত উদাহরণ হিসেবে প্রেরণ করেছিলেন। মানুষ যেহেতু আল্লাহকে তার প্রতিপালক হিসেবে মেনে নিয়েছে, তাই সে শুধু ঐসব কাজকেই ভালো বলে গণ্য করবে, যেসব কাজকে আল্লাহ এবং তাঁর রসূল ﷺ ভালো

(১৪) সিরিয়ার নুসাইরি এবং ফিলিস্তিন ও লেবাননের দ্রুয সম্প্রদায়ের লোকেরা।

www.QuranerAlo.net

বলেছেন। মন্দ কাজের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। আদর্শিক ও চিন্তাগত দিক থেকে এভাবেই তাওহীদের বাস্তবায়ন ঘটে। ভালো এবং মন্দ কাজের মধ্যে পার্থক্য করতে এই পদ্ধতির অনুসরণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ কোনো কাজ দেখে বাহ্যিকভাবে ভালো মনে হলেও প্রকৃতপক্ষে তা মন্দ হতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, লোকেরা বলে, রাজাকে কিছু বলতে হলে উত্তম হলো রাজকুমার বা রাজার ঘনিষ্ঠ কোনো লোক মারফত কথাটা জানানো। এই সূত্র ধরে তারা বলে, আল্লাহর কাছে কবুল করাতে হলে নাবি কিংবা কোনো অলিকে দিয়ে তার পক্ষ থেকে আল্লাহর কাছে দুআ করানো উত্তম। কথাটি শুনতে বেশ যৌক্তিক মনে হতে পারে; কিন্তু বাস্তবে এটা মোটেই ঠিক নয়। তবে আল্লাহ এবং তাঁর নাবি ﷺ উভয়েই কোনো মারফত ছাড়াই সরাসরি আল্লাহর কাছে দুআ করার জন্য মানুষকে সুস্পষ্টভাবে নির্দেশ দিয়েছেন। কুর'আনে আল্লাহ ﷻ বলেছেন,

وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ

আর তোমাদের রব বলেছেন, তোমরা আমাকে ডাকো, আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দেবো।" (আল-মু'মিন: ৪০:৬০)

এবং নাবি ﷺ বলেছেন,

"তুমি কিছু চাইলে শুধু আল্লাহর কাছেই চাও; এবং তুমি যদি সাহায্য চাও, তাহলে তা-ও শুধুমাত্র আল্লাহর কাছেই চাও।"(১৫)

একইভাবে, কোনো কাজ দেখে মন্দ মনে হতে পারে যা প্রকৃতপক্ষে ভালো। উদাহরণস্বরূপ, কেউ বলতে পারেন, চুরি করলে কারও হাত কেটে ফেলা এক ধরনের বর্বরতা কিংবা কেউ মদ্যপান করলে বেত্রাঘাত করাটা অমানবিক। আবার কেউ মনে করবেন, শাস্তি হিসেবে এসব অনেক নির্মম এবং মঙ্গলজনক নয়। তথাপি, আল্লাহ ﷻ এবং তাঁর নাবি ﷺ, এসব শাস্তির বিধান দিয়েছেন। এগুলো প্রয়োগের সুফলই এসব শাস্তির যথার্থতার পক্ষে কথা বলে। অতএব, কেবলমাত্র সেই মুসলিমের দ্বারাই আল্লাহর সাথে তার

(১৫) ইবন 'আব্বাস ﷺ থেকে বর্ণিতে এবং তিরমিযি কর্তৃক সংকলিত। আন-নাওয়াউই'র চল্লিশ হাদীস' (ইংরেজি অনুবাদ), পৃ. ৬৪ দ্রষ্টব্য।

www.QuranerAlo.net

অঙ্গীকারের বাস্তবায়ন হতে পারে, যে সচেতনভাবে পছন্দ করে ইসলাম গ্রহণ করেছে। এক্ষেত্রে তার বাবা-মা মুসলিম কি না, তা মোটেই কোনো বিষয় নয়।

প্রকৃতপক্ষে, ইসলামের বিধিবিধান পালনই হলো এই অঙ্গীকার বাস্তবায়নের উপায়। মানুষের ফিত্‌রাহ্ হলো ইসলামের ভিত্তি। ফলে কেউ যখন ইসলামকে চর্চা করে, তখন তার বাহ্যিক আচার-আচরণ এবং কাজকর্ম তার সেই অভ্যন্তরীণ প্রকৃতির সাথে ছন্দময় হয়ে ওঠে। কারণ এই প্রকৃতি দিয়েই আল্লাহ মানুষের অভ্যন্তরীণ সত্তাকে সৃষ্টি করেছেন। যখন এমনটি ঘটে, মানুষের অভ্যন্তরীণ সত্তা তখন তার বাহ্যিক সত্তার সাথে একীভূত হয়ে যায়। এটি তাওহীদের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। তাওহীদের এই দিকটির বাস্তবায়ন হলে আদামের বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন প্রকৃত পুণ্যবান মানুষের সৃষ্টি হয়, যে আদামকে আল্লাহ ফেরেশতাদের দ্বারা সিজদাহ করিয়েছেন এবং পৃথিবীর প্রতিনিধি মনোনীত করেছেন। কারণ শুধুমাত্র তাওহীদে বিশ্বাসী মানুষই প্রকৃত নিষ্ঠার সাথে বিচার করতে এবং ন্যায়ানুগভাবে পৃথিবীকে শাসন করতে পারেন।

www.QuranerAlo.net

চতুর্থ অধ্যায়

জাদুটোনা ও শুভ-অশুভ লক্ষণ

প্রথম অধ্যায়ে তাওহীদের আলোচনায় আল্লাহকে মহাবিশ্বের স্রষ্টা এবং পালনকর্তা হিসেবে উপলব্ধি করাকে তাওহীদুর রুবূবিয়্যাহ্ বলে উল্লেখ করা হয়েছিল। মহাবিশ্বে যা কিছু রয়েছে সবকিছুর সৃষ্টি, রক্ষণাবেক্ষণ এবং চূড়ান্ত ধ্বংস আল্লাহর হুকুমের অধীন। সৌভাগ্য এবং দুর্ভাগ্য উভয়ই আসে আল্লাহর পক্ষ থেকে। তথাপি সব যুগের মানুষেরই একটি সাধারণ প্রশ্ন হলো, "সামনে সুদিন নাকি দুর্দিন আছে, তা আগে থেকেই জানার কি কোনো উপায় আছে?" কারণ আগে থেকেই জানার কোনো উপায় থাকলে, দুর্ভাগ্য এড়িয়ে সাফল্য নিশ্চিত করা যেত। প্রাচীনকাল থেকেই কিছু মানুষ নিজেদেরকে গুপ্তজ্ঞানের অধিকারী বলে দাবি করে আসছে। আর মূর্খ জনসাধারণ বিশাল অঙ্কের টাকা-পয়সা খরচ করে ভাগ্যের খবর নেওয়ার জন্য তাদের চারপাশে ভিড় জমিয়েছে। দুর্ভাগ্য এড়ানোর জন্য তাদের আবিষ্কৃত মন্ত্রগুলোর কিছু কিছু সাধারণ মানুষের মাঝে প্রচলিত হয়ে গেছে। একারণেই তাদের মন্ত্রগুলোর মতো হাজারো সৌভাগ্যের মন্ত্র অধিকাংশ সমাজেই খুঁজে পাওয়া যায়; যেগুলোর কয়েকটা এই অধ্যায়ে উল্লেখ করা হয়েছে। ভাগ্য জানার কিছু কল্পিত গুপ্তপন্থাও জনসাধারণের মাঝে প্রচলিত হয়ে গেছে। ফলে সব সভ্যতাতেই নানা রকম শুভ-অশুভ লক্ষণ এবং সেগুলোর ব্যাখ্যা খুঁজে পাওয়া যায়। তবে এসব জ্ঞানের একটা অংশ এখনও গোপন রয়ে গেছে। ভাগ্য গণনা ও জাদুটোনার মধ্য দিয়ে জ্যোতিষবিদ্যার বিভিন্ন রূপ এক প্রজন্ম থেকে আরেক প্রজন্মে হাত বদল হয়েছে।

মানব সমাজে এ ধরনের চর্চার ব্যাপক ছড়াছড়ির কারণে এসব ব্যাপারে একটা স্বচ্ছ ধারণা তৈরি হওয়া খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এসব ব্যাপারে সুস্পষ্ট ধারণা না থাকলে একজন মুসলিম খুব সহজেই গুরুতর শির্কে লিপ্ত হতে পারে। কেননা এসব চর্চার সবগুলোর মূলেই রয়েছে শির্ক। পরবর্তী চার

www.QuranerAlo.net

অধ্যায়ে, যেসব দাবি আল্লাহর অনন্য গুণাবলির সাথে সাংঘর্ষিক এবং মানুষকে সৃষ্টির উপাসনার দিকে ঠেলে দেয়, সেসব ব্যাপারে ইসলামের অবস্থান আরও বিস্তারিত আলোচনা করা হবে। প্রতিটি দাবিকে কুর'আন ও সুন্নাহ্‌র আলোকে বিশ্লেষণ করা হবে। সত্যিকার তাওহীদপন্থীদের জন্য দিকনির্দেশনা হিসেবে প্রতিটি দাবির বিপরীতে ইসলামি বিধান উপস্থাপন করা হবে।

জাদুটোনা

বিপদ-আপদ এড়ানো এবং সৌভাগ্য বয়ে আনার জন্য নাবি মুহাম্মাদ ﷺ এর সময় আরবদের মাঝে রক্ষাকবজ হিসেবে চুড়ি, বালা, কড়ি, পুঁতির মালা ইত্যাদি ব্যবহারসহ নানারকম পন্থার প্রচলন ছিল। পৃথিবীর সব অঞ্চলেই বিভিন্ন রূপে তাবিজ-কবজ এবং মাদুলি পাওয়া যায়। অথচ এই তাবিজ-কবজ এবং মাদুলিতে বিশ্বাস করা আল্লাহর রুবূবিয়্যাহ্‌তে (প্রভুত্ব) বিশ্বাসের সাথে সাংঘর্ষিক। কারণ এই বিশ্বাসের মাধ্যমে বিপর্যয় এড়ানো এবং সৌভাগ্য বয়ে আনার ক্ষমতা সৃষ্ট বস্তুর উপর আরোপ করা হয়। নাবি ﷺ এর জীবদ্দশায় এ ধরনের যত বিশ্বাস তাঁর চোখে পড়েছিল, তিনি সেগুলোর বিরোধিতা করেছিলেন। এর মাধ্যমে তিনি একটা ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করে দিয়েছেন, যেন পরবর্তীতে যখনই কোথাও অনুরূপ বিশ্বাস ও চর্চা দেখা যাবে, সেগুলোকে নিষিদ্ধ করা যায়। বস্তুত, এ ধরনের বিশ্বাস পৌত্তলিক সমাজে মূর্তিপূজার সপক্ষে আদর্শগত ভিত্তি তৈরি করে। আর জাদুমন্ত্র নিজেই সেই মূর্তিপূজার একটি শাখা। এই যোগসূত্রটা খ্রিস্টধর্মের ক্যাথলিকদের মাঝে খুব সহজেই চোখে পড়ে। তারা নাবি ঈসা ﷺ কে ঈশ্বর মনে করে এবং তাঁর মা মেরি ও সাধুসন্তদের উপাসনা করে। পাশাপাশি তাদের কল্পিত চেহারার ছবি, মূর্তি এবং পদক বানিয়ে সৌভাগ্যের জন্য নিজেদের সঙ্গে রাখে।

নাবি ﷺ এর জীবদ্দশায় যখন লোকেরা ইসলাম গ্রহণ করত, তাদের অনেকেই নিজেদের সাথে জাদুমন্ত্রের প্রতি বিশ্বাস বয়ে আনত। এসব জাদুমন্ত্রের সমষ্টিবাচক আরবি পরিভাষা হলো তামাইম (একবচনে, তামীমাহ)। নাবি ﷺ থেকে বিশুদ্ধভাবে প্রমাণিত এমন অনেক হাদীস্ রয়েছে

www.QuranerAlo.net

যেগুলোতে তিনি এ ধরনের চর্চাকে কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন। নিম্নে হাদীসগুলোর কয়েকটি মাত্র উল্লেখ করা হলোঃ

ইমরান ইব্ন হুসাইন ﷺ বর্ণনা করেন,

"নাবি ﷺ এক ব্যক্তির বাহুতে দস্তার বালা দেখে তাকে বললেন, তোমার সর্বনাশ হোক! এটা কী? লোকটি বলল যে সেটা আল-ওয়াহিনাহ(১) নামক রোগ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য। নাবি তখন বললেন, ওটা ছুঁড়ে ফেলো, কারণ ওটাই তোমার দুর্বলতা বৃদ্ধি করবে। আর তুমি যদি ওটা পরা অবস্থায় মারা যাও, কখনোই তুমি সফল হবে না।"(২)

অতএব, রোগ-প্রতিরোধ কিংবা রোগ-মুক্তির জন্য তামা, দস্তা কিংবা লোহার চুড়ি, বালা এবং আংটি পরা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। রোগের চিকিৎসার ব্যাপারে যে সকল পদ্ধতি নিষিদ্ধ এগুলো তার অন্তর্ভুক্ত। এ সম্পর্কে নাবি ﷺ বলেছেন,

"একে অন্যের রোগের চিকিৎসা করো, তবে নিষিদ্ধ বস্তু দ্বারা রোগের চিকিৎসা করো না।"(৩)

এছাড়াও আবূ ওয়াকিদ আল-লাইসি বর্ণনা করেন,

"আল্লাহর রসূল ﷺ হুনাইনের(৪) উদ্দেশে যাত্রাকালে একটি গাছের পাশ দিয়ে অতিক্রম করলেন যেটিকে যাতু আন্‌ওয়াত(৫) বলা হতো। পৌত্তলিকরা সৌভাগ্যের জন্য ওই গাছের ডালে তাদের অস্ত্র ঝুলিয়ে রাখত। নতুন ইসলাম গ্রহণকারী কয়েকজন সহাবা নাবি ﷺ কে অনুরোধ করলেন, তিনি যেন তাদের জন্যও

(১) আক্ষরিক অর্থে, দুর্বলতা। সম্ভবত, গেঁটেবাত (Arthritis) বুঝানো হয়েছে।
(২) আহ্‌মাদ, ইব্ন মাজাহ এবং ইব্ন হিব্বাহ কর্তৃক সংকলিত।
(৩) আবু দাউদ, সুনান আবি দাউদ, (ইংরেজি অনুবাদ), খণ্ড ৩, পৃ. ১০৮৭, হাদীস নং ৩৮৬৫ এবং বায়হাকি কর্তৃক সংকলিত।
(৪) হিজরাত পরবর্তী ১০ম বছরে, নাবি ﷺ এবং আরবের পৌত্তলিকদের মাঝে সংঘটিত সর্বশেষ গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধের ময়দান।
(৫) আক্ষরিক অর্থে, "এমন কিছু যার উপর কিছু ঝুলে থাকে।"

www.QuranerAlo.net

অনুরূপ একটি গাছ নির্ধারণ করে দেন। নাবি ﷺ উত্তরে বললেন, সুবহানাল্লাহ![৬] এটা ঠিক সে কথাই হলো, যা নাবি মূসার জাতি তাঁকে বলেছিলঃ

...اجْعَل لَّنَا إِلَٰهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ

"তাদের যেমন উপাস্য আছে, আমাদের জন্য তেমনি উপাস্য নির্ধারণ করে দাও।" (আল-আরাফ, ৭:১৩৮)

তাঁর শপথ, যার হাতে আমার প্রাণ! তোমরা তোমাদের পূর্ববর্তীদের পথ অনুসরণ করবে।"[৭]

এই হাদীসে নাবি ﷺ শুধু সৌভাগ্য-মন্ত্রের ধারণাকে বাতিলই করেননি, তিনি ভবিষ্যদ্বাণীও করেছেন যে, মুসলিমরা ইহুদি এবং খ্রিষ্টানদের রীতিনীতির অনুকরণ করবে। মুসলিমদের মাঝে তসবিহ্ দানার প্রচলন ক্যাথলিকদের জপমালার অনুকরণ, মিলাদ ও মিলাদুননাবি ক্রিসমাসের অনুকরণ। মুসলিমদের অনেকেই অলি-আওলিয়াদের যে সুপারিশ ক্ষমতায় বিশ্বাস করে, তাও খ্রিষ্টানদের বিশ্বাসেরই অনুরূপ। আসলে ইতিমধ্যেই সেই ভবিষ্যদ্বাণী সত্য প্রমাণিত হয়েছে।

যারা মাদুলি পরে, নাবি ﷺ তাদের উপর অভিশাপ দিয়েছেন। এর দ্বারা তিনি মূলত মাদুলি পরার ভয়াবহতার উপর আরও বেশি গুরুত্বারোপ করেছেন। উকবাহ্ ইব্ন আমির ﷺ বর্ণনা করেন যে, একবার নাবি ﷺ বললেন,

"যে ব্যক্তিই তাবিজ-কবজ পরবে বা অন্যকে পরাবে, আল্লাহ যেন তার জন্য ব্যর্থতা এবং অশান্তি সৃষ্টি করেন।"[৮]

জাদুমন্ত্র এবং তাবিজ-কবজের ব্যাপারে নাবি ﷺ এর সহাবিগণ তাঁর নির্দেশ কঠোরভাবে মান্য করেছেন। এ কারণে বিশুদ্ধভাবে বর্ণিত অনেক

---

(৬) আল্লাহ পবিত্র এবং মহান।

(৭) তিরমিযি, নাসাঈ এবং আহমাদ কর্তৃক সংকলিত। শাইখ আল-আলবানি সহীহ্ সুনান তিরমিযি-তে সহীহ্ বলেছেন। (বৈরুত : আল-মাক্তাব আল-ইসলামি, ১ম সংস্করণ, ১৯৮৮, খণ্ড ২, পৃ. ২৩৫, হাদীস্ নং ১৭৭১)।

(৮) ইমাম আহমাদ এবং আল-হাকিম কর্তৃক সংকলিত।

www.QuranerAlo.net

ঘটনা থেকে দেখা যায়, যখনই এ ধরনের চর্চা তাদের চোখে পড়েছে, তাঁরা সেগুলোর প্রবল বিরোধিতা করেছেন। উরওয়া ﷺ বর্ণনা করেন যে, সহাবি হুযাইফা ﷺ এক অসুস্থ ব্যক্তিকে দেখতে গিয়ে তার বাহুতে একটা বালা দেখে তিনি সেটাকে খুলে এনে ভেঙে ফেললেন। তারপর নিম্নোক্ত আয়াত পাঠ করলেনঃ

وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُّشْرِكُونَ ﴿١٠٦﴾

"তাদের অধিকাংশ আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস করে, তবে ('ইবাদাতে) শির্করত অবস্থায়।" (ইউসুফ, ১২:১০৬)

অন্য এক ঘটনায় রয়েছে, তিনি অসুস্থ এক ব্যক্তির বাহুতে একটা খায়েত বা ডোরার বালা খুঁজে পেলেন। তিনি জানতে চাইলেন সেটা কী; লোকটি উত্তর দিল, "এটা আমার জন্য বিশেষভাবে মন্ত্রপড়া একটা জিনিস।" তখন তিনি লোকটির বাহু থেকে ওটা টেনে খুলে ফেলে বললেন, "তুমি যদি এটা পড়া অবস্থায় মারা যেতে, আমি কিছুতেই তোমার জানাযা পড়তাম না!"(৯)

আব্দুল্লাহ ইব্ন মাসউদ ﷺ এর স্ত্রী, যায়নাব ﷺ বর্ণনা করেন,

> একবার ইব্ন মাসউদ তার গলায় একটা ডোরার মালা দেখলেন। সাথে সাথে তিনি জানতে চাইলেন ওটা কী, তিনি উত্তর দিলেন, "এটা একটা ডোরা যাতে আমাকে সাহায্য করার জন্য মন্ত্র পড়া আছে।" তিনি তার গলা থেকে ওটা ছিনিয়ে নিয়ে ছিড়ে ফেললেন এবং বললেন, "নিঃসন্দেহে আবদুল্লাহর পরিবারে শির্কের কোনো প্রয়োজন নেই! আমি আল্লাহর রসূলকে বলতে শুনেছি,
>
> "নিশ্চয়ই জাদুটোনা এবং তাবিজ-কবজ হলো শির্ক।"
>
> যায়নব বললেন, 'আপনি একথা বলছেন কেন? আমার চোখ লাফাত বলে আমি অমুক ইহুদির কাছে গিয়েছিলাম এবং সে এটাতে মন্ত্র পড়ে দিয়েছে, আর তাতেই লাফানো থেমে গেছে!' ইব্ন মাসউদ তখন বলেন, 'নিশ্চয়ই কোনো শয়তান এসে তোমার চোখে খোঁচা দিচ্ছিল। তাই যখন তুমি তাকে মন্ত্র

(৯) ইব্ন ওয়াকী কর্তৃক সংকলিত।

www.QuranerAlo.net

দিয়ে বশ করিয়েছ, সে নিজে থেকেই পালিয়ে গেছে। তোমার জন্য এটুকু বলাই যথেষ্ট হতো যেমনটি নাবি ﷺ বলতেন,

اَذهِب البأس رَبَّ النَاس وَشف أنتَ الشَافي لَا شِفَآ إلَّا شِفَاؤُكَ، شَفَاء لَا يُغَادره سَقمَا

"কষ্ট দূর করুন, হে মানবজাতির রব এবং পরিপূর্ণ আরোগ্য দান করুন, আপনিই সত্যিকার আরোগ্য দানকারী, আপনার দেওয়া আরোগ্য ছাড়া আর কোনো আরোগ্য নেই, এমন আরোগ্য যার পরে আর কোনো অসুস্থতা নেই।"(১০)

জাদুটোনা সম্পর্কিত বিধান

আমাদেরকে মনে রাখতে হবে, মাদুলি, তাবিজ-কবজ এবং জাদুটোনার ক্ষেত্রে যে নিষেধাজ্ঞা, তা শুধু তৎকালীন আরবে প্রচলিত ধরনগুলোর মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। একই উদ্দেশ্যে একই ধরন প্রকৃতির যা কিছুই ব্যবহার করা হোক, সবক্ষেত্রেই এই নিষেধাজ্ঞা প্রযোজ্য। জ্ঞান-বিজ্ঞানে এত উন্নতি লাভের পরও আজকের পশ্চিমা সমাজে নানা ধরনের জাদুটোনার প্রচলন রয়েছে। অনেক তাবিজ-কবজ দৈনন্দিন জীবনের সাথে এতটাই আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে গেছে যে, খুব কম মানুষেরই এসব নিয়ে ভাববার সময় আছে। তবে এসবের উৎপত্তি সম্পর্কে যখন সত্য উন্মোচন করা হয়, তখন ঠিকই এসবের মূলে নিহিত শির্ক স্পষ্ট হয়ে ওঠে। পশ্চিমা সমাজে জনপ্রিয় তাবিজ-কবজের মধ্য থেকে মাত্র দুটো দৃষ্টান্ত নীচে উল্লেখ করা হলোঃ

---

(১০) সুনান আবি দাউদ, (ইংরেজি অনুবাদ), খণ্ড ৩, পৃ. ১০৮৯, হাদীস় নং ৩৮৭৪, আহ়মাদ, ইব্ন মাজাহ় এবং ইব্ন হিব্বান। শাইখ আল-আলবানি এটিকে স়হীহ় বলে সত্যায়ন করেছেন [স়হীহ় সুনান আবি দাউদ, খণ্ড ২, পৃ. ৭৩৬-৭, হাদীস় নং ৩২৮৮)। দুআটি আইশাহ এবং আনাস ﷺ উভয়েই বর্ণনা করেছেন [আল-বুখারি, (আরবি-ইংরেজি), খণ্ড ৭, পৃষ্ঠা ৪২৭-৮, হাদীস় নং ৫, ৬৩৮-৯ এবং মুসলিম, (ইংরেজি অনুবাদ), খণ্ড ৩, পৃ. ১১৯৫, হাদীস় নং ৫৪৩৪)।

www.QuranerAlo.net

খরগোশের পায়ের থাবা

খরগোশের পেছনের পায়ের থাবা কিংবা সোনা ও রূপার তৈরি নকল থাবাকে সৌভাগ্যের কবজ মনে করে পাশ্চাত্যের হাজারো মানুষ এটাকে গলার হার এবং হাতের বালায় পরে থাকে। তাদের এই বিশ্বাসের উৎপত্তি হয়েছে খরগোশের পেছনের পায়ে ভর করে মাটিতে লাফিয়ে চলার অভ্যাস থেকে। প্রাচীন জাহেলী বিশ্বাস অনুযায়ী, মাটির উপর ভর করে চলার সময় খরগোশ কবর দেওয়া মৃত মানুষদের আত্মার সাথে যোগাযোগ করে। তাই নিজের ইচ্ছাগুলোকে মৃতদের আত্মাকে জানানোর মাধ্যমে হিসেবে তারা এটা ব্যবহার করে থাকে। এভাবে মৃতদের সাহায্যে তারা সৌভাগ্য লাভ করতে চায়।

ঘোড়ার খুরের নাল

অ্যামেরিকার অনেক বাড়িঘরের দরজায় ঘোড়ার খুরের নাল কাঁটা দিয়ে আটকানো থাকে। এসব নালের ক্ষুদ্রাকার প্রতিলিপি বানিয়ে সেগুলোকে হাতের বালা, চাবির রিং বা গলার হারে পরা হয় এবং এগুলো সৌভাগ্য বয়ে আনবে বলে বিশ্বাস করা হয়। গ্রিক পুরাণে এই বিশ্বাসের উৎপত্তি খুঁজে পাওয়া যায়। প্রাচীন গ্রিসে, ঘোড়াকে একটি পবিত্র প্রাণী মনে করা হতো। বাড়ির দরজায় ঘোড়ার খুরের নাল ঝুলিয়ে রাখলে তা সৌভাগ্য বয়ে আনবে বলে বিশ্বাস করা হতো। নালের খোলা প্রান্তটি উর্ধ্বমুখী রাখা হতো, যেন তা সৌভাগ্যকে ধারণ করে। তাদের বিশ্বাস অনুযায়ী, ওটাকে অধঃমুখী রাখলে সৌভাগ্য বাইরে ছিটকে পড়ে যায়!

জাদুটোনায় বিশ্বাস করা দ্বারা যে ভয়ংকর অপরাধটি সংঘটিত করা হয় তা হলো, এর দ্বারা আল্লাহ ছাড়া অন্য কিছুকে বিপদ-আপদ থেকে রক্ষাকারী বানিয়ে নেওয়া হয়। ফলে যারা এ ধরনের বিশ্বাস পোষণ করে, তারা আল্লাহর রুবূবিয়্যাহ্ (প্রভুত্ব) তাঁর সৃষ্টির মধ্যেই সীমাবদ্ধ বলে তর্ক জুড়ে দেয়। তাদের অবস্থা এমন হয়ে দাঁড়ায় যে, জাদুমন্ত্রকে তারা আল্লাহর চেয়েও অধিক শক্তিশালী মনে করে। কারণ তাদের ধারণা, এসব জাদুমন্ত্র আল্লাহর নির্ধারিত বিপদ-আপদ ও অকল্যাণকে প্রতিহত করতে সক্ষম। অতএব, জাদুটোনায় বিশ্বাস একটি সুস্পষ্ট শির্ক। ইব্ন মাসঊদ ﷺ এর উল্লিখিত হাদীসে এমনটিই

www.QuranerAlo.net

বলা হয়েছে। এই বিধান নিম্নোক্ত হাদীসের মাধ্যমে আরও জোরালো হয়েছে। উকবাহ্ ইব্ন আমির ﷺ বর্ণনা করেন,

> "নাবি ﷺ এর কাছে একবার দশজন লোকের একটি দল আসলো বাইআত গ্রহণের জন্য। তিনি তাদের নয়জনের বাইআত গ্রহণ করলেন। তারা জিজ্ঞেস করল, ইয়া রসূলাল্লাহ! কেন আপনি আমাদের নয়জনের বাইআত গ্রহণ করলেন এবং এই লোকের বাইআত নিতে অস্বীকৃতি জানালেন? নাবি ﷺ উত্তর দিলেন, নিশ্চয়ই সে তাবিজ পরে আছে। এরপর লোকটি তার জুব্বার ভেতর হাত ঢুকিয়ে তাবিজটা বের করে ভেঙে ফেলল। নাবি ﷺ তার থেকে বাইআত গ্রহণ শেষে ফিরে বললেন, যে তাবিজ পরল, সে শির্ক করল"(১১)

কুর'আনের তাবিজ

ইব্ন মাসউদ, ইব্ন 'আব্বাস এবং হুযাইফাহ্ ﷺ সহ সকল সহাবি কুর'আনের তাবিজ পরার বিরোধিতা করেছেন। তাবিউন অর্থাৎ সহাবিদের পরের প্রজন্মের কিছু 'আলিম এ ধরনের তাবিজকে সমর্থন করলেও তাদের অধিকাংশই ছিলেন এসবের বিরোধী। তবে, তাবিজ নিষিদ্ধকারী হাদীসগুলোতে কুর'আনের তাবিজ এবং সাধারণ তাবিজের মধ্যে কোনো পার্থক্য করা হয়নি। অধিকন্তু, নাবি ﷺ নিজে কুর'আনের তাবিজ পরেছেন বা অন্যকে পরার অনুমতি দিয়েছেন মর্মে কোনো প্রমাণ আমাদের হাতে নেই। জাদু থেকে সুরক্ষার জন্য নাবি ﷺ থেকে যে পদ্ধতি প্রমাণিত রয়েছে তার সাথেও কুর'আনের তাবিজ ব্যবহার সাংঘর্ষিক। অনিষ্ট থেকে বাঁচার জন্য সূরা আল-ফালাক্ব ও আন-নাস এবং আয়াতুল-কুরসি(১২) তিলাওয়াত করাই হলো সুন্নাহ্। কুর'আন থেকে উপকৃত হওয়ার একমাত্র নির্দেশিত পন্থা হলো, তা তিলাওয়াত করা এবং বাস্তব জীবনে কুর'আনের বিধিবিধান মেনে চলা। নাবি ﷺ বলেছেন,

---

(১১) হাদীসটি ইমাম তিরমিযি এবং আহমাদ সংকলন করেছেন। শাইখ আল-আলবানি এটিকে সহীহ্ বলে সত্যায়ন করেছেন [সিলসিলাহ্ আল-আহাদীস আস-সাহীহাহ্, খণ্ড ১, পৃ. ২৬১, হাদীস নং ৪৯২)।

(১২) আবু হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত এবং আল-বুখারি কর্তৃক সংকলিত, (আরবি-ইংরেজি), খণ্ড ৬, পৃ. ৪৯১, হাদীস নং ৫৩০।

www.QuranerAlo.net

"যে ব্যক্তি আল্লাহর কিতাবের একটি অক্ষর পাঠ করবে, সে একটি সাওয়াব লাভ করবে এবং প্রতিটি সাওয়াবকে দশ গুণ বৃদ্ধি করে দেওয়া হবে। আমি বলছি না যে, আলিফ লাম মীম একটি অক্ষর; বরং আলিফ একটি অক্ষর, লাম একটি অক্ষর এবং মীম একটি অক্ষর।"(১৩)

মাদুলিতে কুর'আন লিখে ভরে রাখাটা ওই রোগীর মতো যাকে ডাক্তার ব্যবস্থাপত্র লিখে দিয়েছেন, কিন্তু তিনি ব্যবস্থাপত্র অনুযায়ী ঔষধ সেবন না করে, তা গলায় ঝুলিয়েছেন। আর ভাবছেন যে, ওটাই তাকে সুস্থ করবে।

কুর'আনের তাবিজ পরে যদি কেউ বিশ্বাস করে যে, সেই তাবিজই তার অনিষ্ট দূর করবে এবং সৌভাগ্য বয়ে আনবে, তাহলে সে আল্লাহ ভাগ্যে যা লিপিবদ্ধ করেছেন, তা পরিবর্তনের ক্ষমতা অন্যের উপর আরোপ করল। পরিণামে, সে আল্লাহর পরিবর্তে তাবিজের উপর নির্ভর করতে শুরু করে। তাবিজ-কবজের সাথে সংশ্লিষ্ট শির্কের এটিই মূলকথা যা নিম্নোক্ত হাদীস্ দ্বারা সুস্পষ্ট। ঈসা ইব্ন হামযাহ্ বলেন,

"একবার আমি আব্দুল্লাহ ইব্ন উকাইমকে দেখতে এলাম এবং হামযাহ্কে তার সাথেই পেলাম। আমি আব্দুল্লাহ্কে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কোনো তামীমাহ্ (তাবিজ) পরেন না? তিনি উত্তর দিলেন, আল্লাহ তা থেকে আমাদের আশ্রয় দান করুন! আপনি কি জানেন না, আল্লাহর রসূল বলেছেন, যে ব্যক্তিই গলায় মালা বা হাতে বালা পরল, সে তার উপরই নির্ভর করল?"(১৪)

লকেটে ভরে পরার উদ্দেশ্যে ক্ষুদ্রাকার কুর'আন ছাপানোর চর্চাও মানুষকে শির্কের দিকে ঠেলে দেয়। অনুরূপভাবে, দুষ্পাঠ্য হরফে লেখা আয়াতুল কুরসি খচিত অলঙ্কার তস্তি হিসেবে পরাও শির্কের দিকে ঠেলে দেয়। যে কেবল ফ্যাশন হিসেবে পরলে শির্ক হয় না ঠিকই, তবে অধিকাংশই ফ্যাশনের সাথে সাথে অনিষ্ট থেকে বাঁচার জন্যই সেগুলো পরে। ফলে তাওহীদের ইসলামি মূলনীতি অনুযায়ী তারা কার্যত এক প্রকার শির্কে পতিত হয়।

---

(১৩) আহ্মাদ এবং আল-হাকিম কর্তৃক সংকলিত। শাইখ আল-আলবানি এটিকে সহীহ্ বলে সত্যায়ন করেছেন [সহীহ্ সুনান তিরমিযি, খণ্ড ৩, পৃ. ৯, হাদীস্ নং ২৩২৭)।

(১৪) ইব্ন মাসউদ ﷺ থেকে বর্ণিত এবং আহ্মাদ, তিরমিযি এবং আল-হাকিম কর্তৃক সংকলিত। আল-আরনাউত এটিকে হাসান বলে মূল্যায়ন করেছেন [শারহ আস-সুন্নাহ (বেরুত : আল মাক্তাব আল-ইসলামি, ১ম সংস্করণ, ১৯৭৮, খণ্ড ১২, পৃ. ১৬০-১, পাদটীকা ৫))।

www.QuranerAlo.net

কুর'আনকে তাবিজ হিসেবে ব্যবহার করার এ অপচর্চা মুসলিমদেরকে অবশ্যই পরিহার করতে হবে। অমুসলিমরা যেমন তাবিজ-কবজ এবং মাদুলি ব্যবহার করে, তেমনি মুসলিমরাও তাদের গাড়িতে, চাবির আংটায়, হাতের বালায়, গলার মালায় কুর'আনের তাবিজ টাঙিয়ে নিজেদের জন্য শির্ক সংঘটনের দরজা খুলে দেয়। অতএব, বিশুদ্ধ তাওহীদের ধারণা থেকে বিচ্যুতকারী সবধরনের অপবিশ্বাস থেকে নিজেকে পবিত্র রাখার জন্য সচেতন প্রচেষ্টা চালাতে হবে।

শুভ-অশুভ লক্ষণ

ইসলামপূর্ব আরবের লোকেরা পশুপাখির গন্তব্যের গতিপথকে আসন্ন সৌভাগ্য বা দুর্ভাগ্যের লক্ষণ মনে করত এবং এসব লক্ষণ অনুযায়ী তাদের জীবনের পরিকল্পনা গ্রহণ করত। পশুপাখির গতিবিধির উপর নির্ভর করে শুভ-অশুভ লক্ষণ নির্ণয়ের চর্চাকে আরবিতে তিয়ারাহ্' বলা হতো। এটি ক্রিয়ামূল তারা' থেকে নির্গত, যার অর্থ 'উড়াল দেওয়া।' উদাহরণস্বরূপ, কেউ যদি সফরে বের হয়ে মাথার উপর কোনো পাখিকে বাম দিকে উড়ে যেতে দেখতেন, তবে সেটিকে তিনি আসন্ন বিপদের লক্ষণ ভেবে বাড়ি ফিরে যেতেন। ইসলাম এইসব চর্চাকে বাতিল করে দিয়েছে। কারণ এগুলো তাওহীদ আল-ইবাদাহ্' এবং তাওহীদ আল-আসমা' ওয়াস-সিফাত' এর ভিত্তিকে ক্রমশ ধ্বংস করে দেয়। যেমনঃ

১. ভরসা বা তাওয়াক্কুল করা এক প্রকার 'ইবাদাত। এসব ক্ষেত্রে আল্লাহকে ছেড়ে অন্যের উপর এ ভরসা করা হয়।

২. আসন্ন বিপদ-আপদ সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করার এবং আল্লাহর নির্ধারিত নিয়তিকে পরিবর্তন করার ক্ষমতা আল্লাহ ব্যতীত অন্যকে দেওয়া হয়।

নাবি ﷺ এর দৌহিত্র, হুসাইন ﷺ থেকে বর্ণিত একটি হাদীসের উপর ভিত্তি করে তিয়ারাহ্ নিষিদ্ধ হওয়ার বিষয়টি প্রতিষ্ঠিত। তিনি বর্ণনা করেন যে, নাবি ﷺ বলেছেন,

www.QuranerAlo.net

"যে তিয়ারাহ্ করল বা করাল, নিজের সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করাল অথবা কারও উপর জাদুটোনা করল, সে আমাদের দলভুক্ত নয়।"(১৫)

এখানে 'আমাদের' বলে মুসলিম উম্মাহ্কে বোঝানো হয়েছে। অতএব, তিয়ারাহ্ ওইসব কর্মের অন্তর্ভুক্ত যাতে কেউ বিশ্বাস করলে সে ইসলামের গণ্ডি থেকে বের হয়ে যায়। মুআবিয়াহ্ ইব্ন আল-হাকাম ﷺ থেকে বর্ণিত অন্য এক হাদীসেও নাবি ﷺ তিয়ারাহ্-এর প্রভাবকে নাকচ করে দিয়েছেন।

মুআবিয়াহ্ ﷺ নাবি ﷺ কে বলেন,

"আমাদের মধ্যে এমন লোকও আছে যারা পাখিদের লক্ষণ অনুসরণ করে।" নাবি ﷺ উত্তরে বললেন, "এটা তোমাদের নিজেদের মনগড়া বিষয়। অতএব, এটা যেন তোমাদের বিরত না রাখে।"(১৬)

অর্থাৎ, তোমরা যা করতে চাও, এসব লক্ষণ যেন তোমাদেরকে সেসব কাজ থেকে বিরত না রাখে। কারণ এসব শুভ-অশুভ লক্ষণ মানুষের তৈরি বানোয়াট কাহিনী; এসবের কোনো বাস্তবতা নেই। উল্লিখিত হাদীসে আল্লাহর নাবি ﷺ সুস্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করেছেন যে, মহান আল্লাহ পাখিদের উড়ে যাওয়ার গতিপথকে কোনো কিছুর সংকেত হিসেবে ঘোষণা দেননি। পাখিদের ওড়ার গতিপথের সাথে কল্যাণ অকল্যাণের কোনো সম্পর্ক নেই। তাদের গতিপথ দেখে কোনো ভবিষ্যদ্বাণীও করা যায় না। ইসলামপূর্ব এসব বিশ্বাসের সাথে কোনো ঘটনার মিল আছে মনে হলে, তা কেবলই কাকতালীয় ব্যাপার।

সাহাবিগণ কাউকে এসব বিশ্বাস করতে দেখলে তা কঠোরভাবে প্রত্যাখ্যান করেছেন। উদাহরণস্বরূপ, ইকরিমাহ্ ﷺ বলেন, আমরা একবার ইব্ন 'আব্বাসের সাথে বসে ছিলাম। তখন হঠাৎ একটা পাখি আমাদের উপর দিয়ে উড়ে গেল এবং কর্কশ ও তীক্ষ্ণস্বরে ডাক পাড়ল। তখন এক লোক চিৎকার করে বলে উঠল, "শুভ লক্ষণ! শুভ লক্ষণ!" ইব্ন 'আব্বাস ﷺ তাকে ভর্ৎসনা করে বললেন, "এতে শুভ-অশুভর কিছু নেই।"(১৭) অনুরূপভাবে, তাবিউনরাও কাউকে এসব কুসংস্কারে বিশ্বাস করতে দেখলে কঠোর নিন্দা

(১৫) ইমাম তিরমিযি কর্তৃক সংকলিত।
(১৬) মুসলিম, (ইংরেজি অনুবাদ), খণ্ড ৪, পৃ. ১২০৯, হাদীস নং ৫৫৩২।
(১৭) তাইসীর আল-আযীয আল-হামিদ –এ উদ্ধৃত, পৃ. ৪২৮।

www.QuranerAlo.net

করতেন। উদাহরণস্বরূপ, একবার তাউস ﷺ তার এক বন্ধুর সাথে সফরে যাচ্ছিলেন। তখন একটা কাক জোরে ডাক দেয় এবং তার বন্ধু তাকে বলেন, "শুভ লক্ষণ!" তিনি তখন তাকে বলেন, "এতে শুভ লক্ষণের কী হলো? তুমি আর এক মুহূর্তও আমার সাথে থাকবে না।"(১৮)

তবে সহীহ আল-বুখারিতে(১৯) নাবি ﷺ থেকে একটি হাদীস উল্লেখ করা হয়েছে। বাহ্যিকভাবে যার অর্থ নিয়ে কিছুটা সন্দেহ সৃষ্টি হতে পারে। এ হাদীসে নাবি ﷺ বলেন,

"কুলক্ষণ আছে তিনটি জিনিসে: নারী, সওয়ারি জন্তু এবং বাসগৃহ।"(২০)

কিন্তু আইশাহ ﷺ কঠোরভাবে এ হাদীসটিকে প্রত্যাখ্যান করে বলেন যে,

"তাঁর শপথ! যিনি আবুল-কাসিমের(২১) উপর ফুরকান (কুর'আন) অবতীর্ণ করেছেন। যে এটি বর্ণনা করেছে সে মিথ্যা বলেছে। বরং আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন যে, অজ্ঞ লোকেরা বলত, নারী, বাসগৃহ এবং বোঝা বহনকারী পশুদের মধ্যে তিয়ারাহ্ (কুলক্ষণ) আছে।" তারপর তিনি নিম্নোক্ত আয়াতটি পাঠ করেনঃ

مَا أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِّن قَبْلِ أَن نَّبْرَأَهَا

"পৃথিবীতে কিংবা তোমাদের নিজেদের মধ্যে এমন কোনো মুসীবত আপতিত হয় না, যা আমি সংঘটিত করার পূর্বে কিতাবে লিপিবদ্ধ রাখি না..."

(আল-হাদীদ; ৫৭:২২)

যদিও হাদীসটি সহীহ, তবে এর ব্যাখ্যা করার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বর্ণনাগুলোকে মনে রাখতে হবে। যেমন, অন্য এক বর্ণনায় এ হাদীসটি এসেছে এইভাবে,

---

(১৮) তাইসীর আল-আযীয আল-হামিদ –এ উদ্ধৃত, পৃ. ৪২৮।

(১৯) ইমাম বুখারি কর্তৃক সংকলিত হাদীসের বিশুদ্ধতম সংকলন।

(২০) আল-বুখারি, (আরবি-ইংরেজি), খণ্ড ৭, পৃ. ৪৪৭-৮, হাদীস নং ৬৬৬।

(২১) আবুল-কাসিম ছিল নাবি ﷺ এর ডাকনাম। এর মাধ্যমে 'আল্লাহর শপথ' বুঝানো হয়েছে।

www.QuranerAlo.net

"যদি কোনোকিছুর মধ্যে কুলক্ষণ থাকত, তাহলে সেগুলো হতো ঘোড়া, নারী এবং বাসস্থান।"(২২)

এ বর্ণনা থেকে বোঝা যায়, নাবি ﷺ একথার দ্বারা কুলক্ষণকে প্রমাণ করেননি; বরং তিনি বলতে চেয়েছেন যে, যদি কুলক্ষণ বলে আদৌ কিছু থাকত তাহলে তা এগুলোর মধ্যে থাকত। এই তিনটি বিষয়কে সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করার কারণ হতে পারে, তখনকার দিনে এই তিনটিই ছিল পুরুষদের জীবনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ জিনিস। বিপদ-আপদ যা-ই আসত সেগুলো এই তিনটি বিষয়ের সাথেই সংশ্লিষ্ট থাকত। এজন্য ঘোড়ার মালিক হলে, স্ত্রী লাভ করলে কিংবা বাসগৃহে প্রবেশ করলে, সেইসব বিপদ-আপদ থেকে আশ্রয়ের জন্য নাবি ﷺ কিছু নির্ধারিত দুআ পাঠ করার নির্দেশ দিয়েছেন। নাবি ﷺ বলেছেন,

"যদি তোমাদের কেউ বিয়ে করে কিংবা কোনো দাসি রাখে, সে যেন তার কপালের কেশগুচ্ছ হাত দিয়ে ধরে আল্লাহর নাম স্মরণ করে, কল্যাণ প্রার্থনা করে বলে:

اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا وَخَيْرَ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهَا وَ أَعُوْذُبِكَ مِن شَرِّهَا وَشَرِّ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهَا

হে আল্লাহ! তার ও তার স্বভাব-চরিত্রের মধ্যে আপনি যা রেখেছেন, আমি তা থেকে সর্বোৎকৃষ্ট কল্যাণ কামনা করছি। আর আমি সেসব অনিষ্ট থেকে আপনার আশ্রয় নিচ্ছি যা আপনি তার ও তার স্বভাব-চরিত্রের অংশ হিসেবে তৈরি করেছেন।"

"কেউ যদি কোনো উট ক্রয় করে, তবে যেন এর কুঁজের চূড়া ধরে এই কথাগুলো বলে।"(২৩)

---

(২২) আল-বুখারি, (আরবি-ইংরেজি), পৃ. ৪৩৫, হাদীস নং ৬৪৯, মুসলিম, (ইংরেজি অনুবাদ), খণ্ড ৪, পৃ. ১২০৮, হাদীস নং ৫৫২৮-৯ এবং সুনান আবি দাউদ (ইংরেজি অনুবাদ), খণ্ড ৩, পৃ. ১০৯৯, হাদীস নং ৩৯১১।

(২৩) আমর ইব্ন শুআইব ﷺ থেকে বর্ণিত। সুনান আবি দাউদ, (ইংরেজি অনুবাদ), খণ্ড ২, পৃ. ৫৭৯, হাদীস নং ২১৫৫ এবং ইব্ন মাজাহ্।

www.QuranerAlo.net

আরও বর্ণিত হয়েছে যে, নাবি ﷺ বলেছেন,

"বাড়িতে প্রবেশ করার সময় তোমরা বলবে,

اَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِن شَرِّ مَا خَلَقَ

আল্লাহ অনিষ্টকর যা কিছু সৃষ্টি করেছেন, তা থেকে আল্লাহর পরিপূর্ণ কালিমার মাধ্যমে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।"(২৪)

নীচের হাদীসটিও শুভ-অশুভ লক্ষণকে সমর্থন করে বলে মনে হতে পারেঃ

আনাস ইব্ন মালিক, ইয়াহয়া ইব্ন সাঈদের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন যে, তিনি বলেছেন,

এক মহিলা আল্লাহর রসূলের নিকট এসে বলল, "এক বাড়ি ছিল যাতে অনেক সদস্য ছিল এবং তাদের সম্পদও ছিল প্রচুর। তাদের সংখ্যা কমে গেছে এবং তাদের সম্পদও হারিয়ে গেছে। আমরা কি ওটা ত্যাগ করতে পারি?" নাবি উত্তরে বললেন, "ওটা ত্যাগ করো, কারণ ওটা অভিশপ্ত।"(২৫)

এখানে মূলত নাবি ﷺ তাদেরকে জানিয়ে দিয়েছেন যে, তারা যদি উল্লিখিত কারণে বাড়িটি ছেড়ে যায় তাহলে তাতে তিয়ারাহ্ করা হবে না। বরং দুর্ঘটনা এবং বাড়ির সদস্যদের একাকীত্বের কারণে মনস্তাত্ত্বিক দিক থেকেই বাড়িটা তাদের উপর একটা বোঝা হয়ে গিয়েছিল। আল্লাহ মানুষের মধ্যে যে স্বভাব-প্রকৃতি দিয়েছেন তাতে কখনো এমন হওয়াটা অস্বাভাবিক নয়। যখনই মানুষ কোনোকিছু থেকে দুর্ভাগ্য বা দুর্ঘটনার শিকার হয়, তখন তার মধ্যে তা অপছন্দ করার প্রবণতা দেখা দেয় এবং যতদূর সম্ভব সেটা থেকে সে দূরে থাকতে চায়। যদিও ওই জিনিসটার কারণেই ওই অনিষ্ট বা বিপর্যয় ঘটেনি। আরও লক্ষণীয় যে, বাড়িটি ত্যাগ করার অনুমতি চাওয়া

---

(২৪) খাওলাহ্ বিনতে হাকিম থেকে বর্ণিত। মুসলিম, (ইংরেজি অনুবাদ), খণ্ড ৪, পৃ. ১৪২১, হাদীস্ নং ৬৫২১।

(২৫) আবু দাউদ [সুনান আবি দাউদ, (ইংরেজি অনুবাদ), খণ্ড ৩, পৃ. ১০৯৯-১০০, হাদীস্ নং ৩৯১৩) এবং মালিক, মুহাম্মাদ রাহিমুদ্দীন, মুওয়াত্তা ইমাম মালিক, (ইংরেজি অনুবাদ), লাহোর : শাইখ মুহাম্মাদ আশরাফ, ১৯৮০, পৃ. ৪১৩, হাদীস্ নং ১৭৫৮।

www.QuranerAlo.net

হয়েছিল তারা বিপদগ্রস্ত হওয়ার পরে, আগে নয়। কোনো জায়গা বা কোনো লোকজনের উপর আযাব-গজব আসার কারণে ওই জায়গা বা লোকদেরকে অভিশপ্ত বলা একেবারে ভুল নয়। নিশ্চয়ই তারা এমন কিছু করেছে যার জন্য আল্লাহ তাদেরকে শাস্তি দিয়েছেন। অনুরূপভাবে, মানুষের প্রবণতা হলো, যা কিছুতে সৌভাগ্য এবং সাফল্য আসে, সেটাকে সে ভালোবাসে এবং তার সংস্পর্শে থাকতে চায়। বিষয়টি যদি কেবল এটুকুর মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে, তবে তা তিয়ারাহ্ হবে না। তবে এটা নিয়ে বাড়াবাড়ি করা হলে তা তিয়ারাহ্ এবং শির্কের দিকে মোড় নেবে। যদি কেউ সেসব জায়গা বা বস্তু সম্পূর্ণ এড়িয়ে চলার চেষ্টা করে যেগুলোতে অন্যদের বিপদ ঘটেছিল অথবা যদি ওইসব জায়গা বা বস্তুর সন্ধান করে যেসবে অন্যদের সৌভাগ্য ঘটেছিল তবে তা তিয়ারাহ্‌র অন্তর্ভুক্ত হবে। কেননা এক্ষেত্রে সে স্বয়ং বস্তু এবং স্থানগুলোর উপরেই মঙ্গল-অমঙ্গল ঘটানোর ক্ষমতা আরোপ করতে শুরু করে।

ফা'ল (শুভ লক্ষণ)

আনাস ﷺ বর্ণনা করেন যে, নাবি ﷺ বলেছেন,

"সংক্রমণ[২৬] বলতে কিছু নেই, তিয়ারাহ্ বলতেও কিছু নেই। তবে ফা'ল আমার পছন্দ।" তখন সহাবিরা জিজ্ঞেস করলেন, "তাহলে ফা'ল কী?" তিনি উত্তর

(২৬) আবু হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত এবং বুখারি এবং মুসলিম কর্তৃক সংকলিত অন্য এক হাদীসে নাবি ﷺ সংক্রমণের অস্তিত্বকে প্রত্যাখ্যান করেছেন যখন এক বেদুঈন জিজ্ঞেস করেছিল, "হে আল্লাহর রসূল! মরুভূমির একপাল হৃষ্টপুষ্ট উটের ব্যাপারে কী বলা যায়, যখন সেগুলোর মাঝে অসুস্থ কোনো উটকে আনা হয়, বাকি সবগুলো এটার কারণে অসুস্থ হয়ে যায়?" নাবি ﷺ উত্তরে বলছিলেন, "প্রথমটাকে কে সংক্রমিত করেছিল?" আল-বুখারি, (আরবি-ইংরেজি), খণ্ড ৭, পৃ. ৪১১-২, হাদীস নং ৬১২ এবং মুসলিম, (ইংরেজি অনুবাদ), খণ্ড ৪, পৃ. ১২০৬, হাদীস নং ৫৫০৭। আরও দেখুন : সুনান আবি দাউদ, (ইংরেজি অনুবাদ), খণ্ড ৩, পৃ. ৩৯০৭। এখানে ইসলামপূর্ব বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করে নাবি ﷺ সংক্রমণের বিষয়টি প্রত্যাখ্যান করেছেন। এসব বিশ্বাস অনুযায়ী, এ ধরনের সংক্রমণের পেছনে আল্লাহর পাশাপাশি বিভিন্ন দেবদেবী এবং প্রেতাত্মার হস্তক্ষেপে বিশ্বাস করা হতো।

www.QuranerAlo.net

দিলেন, "কোনো শুভ কথা।"[২৭]

কোনো কিছুতে কুলক্ষণ আছে বলে মনে করলে আল্লাহ সম্পর্কে কুধারণা পোষণ করা হয়; এতে শির্কের ধারণাও বিদ্যমান। যদিও শুভ লক্ষণে বিশ্বাসকে আল্লাহর প্রতি সুধারণার প্রমাণ মনে হতে পারে, তারপরও এর মাধ্যমে সৃষ্ট বস্তুর উপর আল্লাহর ক্ষমতা আরোপের মতো শির্ক নিহিত। এ কারণেই সহাবিরা খুবই আশ্চর্য হয়েছিলেন যখন নাবি ফা'ল তথা শুভ লক্ষণের প্রতি তাঁর পছন্দের কথা ব্যক্ত করেছিলেন। তবে ইসলামি বিশ্বাস অনুযায়ী কোনো কোনো ক্ষেত্রে শুভ লক্ষণ গ্রহণ করা অনুমোদিত। তবে তার যথেচ্ছ ব্যবহারেরও কোনো সুযোগ নেই; কারণ এর পরিসীমাও নাবি ﷺ নির্ধারণ করে দিয়েছেন। ফা'ল হলো আশাব্যঞ্জক কথা বা শব্দের ব্যবহার। উদাহরণস্বরূপ, কোনো অসুস্থকে 'সালিম' (সুস্থ) নামে ডাকা কিংবা যে ব্যক্তি কোনো কিছু হারিয়েছে, তাকে 'ওয়াজিদ' (যে হারানো জিনিস খুঁজে পায়) নামে ডাকা। এ জাতীয় শব্দের ব্যবহার হতভাগ্যের মনে আশার সঞ্চার করে এবং কল্যাণের অনুভূতি সৃষ্টি করে। সর্বাবস্থায় আল্লাহর সাহায্য সম্পর্কে আশাবাদী থাকা মু'মিনদের জন্য আবশ্যক।[২৮]

শুভ-অশুভ লক্ষণ বিষয়ে ইসলামের বক্তব্য

উল্লিখিত হাদীসসমূহ থেকে এটা সুস্পষ্ট যে, তিয়ারাহ্ বলতে শুভ-অশুভ লক্ষণের প্রতি সাধারণ বিশ্বাসকে বোঝায়। পাখিদের গতিবিধি থেকে পূর্বাভাস লাভ করার যে তত্ত্ব, তা নাবি ﷺ এর সুন্নাহ দ্বারা সম্পূর্ণরূপে প্রত্যাখ্যাত। প্রাচীন আরবের লোকেরা পাখিদের থেকে শুভ-অশুভ লক্ষণ গ্রহণ করত। আর আজকের লোকেরা আরো অনেকভাবে তা গ্রহণ করে থাকে। পদ্ধতি ভিন্ন হলেও কাজ যেহেতু একই, তাই উভয় ক্ষেত্রে একই বিধান প্রযোজ্য। এগুলোর অধিকাংশের উৎপত্তি লাভের ইতিহাস অনুসন্ধান করলে এগুলোর

(২৭) আল-বুখারি, (আরবি-ইংরেজি), খণ্ড ৭, পৃ. ৪৩৬, হাদীস নং ৬৫১ এবং মুসলিম, (ইংরেজি অনুবাদ), খণ্ড ৪, পৃ. ১০৯৮, হাদীস নং ৩৯০৬।
(২৮) তাইসীর আল-আযিয আল-হামীদ, পৃ. ৪৩৪-৫।

www.QuranerAlo.net

মধ্যে নিহিত শির্ক সুস্পষ্ট হয়ে যায়। পশ্চিমা সমাজে প্রচলিত এমন অসংখ্য লক্ষণগুলোর কয়েকটা মাত্র নীচে উল্লেখ করা হলো।

কাঠে টোকা দেওয়া

কেউ কোনোকিছু লাভ করলে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার জন্য এবং ভাগ্য যেন সুপ্রসন্ন থাকে সেজন্য বলে, "কাঠে দিলাম টোকা"। আর টোকা দেওয়ার জন্য চারিদিকে কাঠ খোঁজে। এই বিশ্বাসের উৎপত্তি হয়েছে সেই সময় যখন ইউরোপের লোকেরা ভাবত দেবতারা গাছের ভিতরে বসবাস করে। বৃক্ষ-দেবতার কাছে অনুগ্রহ কামনা করে তারা ওই গাছে টোকা দিত। তাদের ইচ্ছা পূর্ণ হলে দেবতাকে ধন্যবাদ দেওয়ার জন্য তারা আবার ওই গাছে টোকা দিত।

লবণ ছিটে পড়া

লবণ ছিটে পড়লে বা লবণের বাটি উল্টে পড়লে শিগগিরই বিপদ আসবে বলে অনেকে বিশ্বাস করেন। এই বিপদ কাটানোর জন্য ছিটে পড়া লবণকে বাম কাঁধের উপর দিয়ে ছুঁড়ে মারা হয়। লবণের অনেক কিছুকে তাজা বা সতেজ রাখার বৈশিষ্ট্য থেকেই এই লক্ষণের উৎপত্তি। লবণের অলৌকিক ক্ষমতার কারণে এমনটি হয় বলে প্রাচীন জাহিল লোকেরা বিশ্বাস করত। এভাবেই লবণ ছিটে পড়া বিপদের সতর্ক সংকেত হয়ে গেছে। যেহেতু তারা মনে করে যে, দুষ্টু আত্মারা মানুষের বামপাশে অবস্থান করে, তাই বাম কাঁধের উপর দিয়ে লবণ ছুঁড়ে দিলে তারা সন্তুষ্ট থাকবে বলে ধরে নেওয়া হতো।

আয়না ভেঙে যাওয়া

অনেক মানুষ বিশ্বাস করে, আয়না ভেঙে যাওয়া সাত বছরের জন্য দুর্ভাগ্য সংকেত। প্রাচীন লোকেরা পানিতে নিজেদের প্রতিবিম্বকে তাদের আত্মা বলে মনে করত এবং তাদের প্রতিবিম্ব যদি খণ্ডবিখণ্ড হতো (পানিতে ঢিল ছুঁড়লে যেমনটি ঘটে), তাদের আত্মাও খণ্ডবিখণ্ড হতো। আয়না আবিষ্কারের পর এই বিশ্বাস আয়নাতে স্থানান্তরিত হয়ে যায়।

www.QuranerAlo.net

কালো বিড়াল

অনেকের ধারণা, কারও সামনে দিয়ে কালো বিড়াল অতিক্রম করলে তা আসন্ন বিপদের পূর্বাভাস। এই বিশ্বাসের উৎপত্তি হয়েছে মধ্যযুগে যখন কালো বিড়ালকে লোকজন ডাইনিদের পোষা প্রাণী বলে বিশ্বাস করত। লোকেরা মনে করত, ডাইনিরা কালো বিড়ালের মগজের সাথে ব্যাঙ, সাপ এবং পোকা-মাকড়ের বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ মিশিয়ে এক জাদুর শক্তিসম্পন্ন চোলাই মদ তৈরি করে। আর কোনো কালো বিড়াল যদি ডাইনির সাথে সাত বছর পর্যন্ত থাকত তাহলে সেটি নিজেও ডাইনি হয়ে যেত।

১৩ সংখ্যা

অ্যামেরিকায় তেরো সংখ্যাটিকে অশুভ মনে করা হয়। এ কারণে অনেক বহুতল ভবনের ১৩তম তলাকে বলা হয় ১৪তম তলা। ১৩ তারিখের শুক্রবারকে বিশেষভাবে অশুভ বিবেচনা করা হয় এবং অনেক মানুষ এই দিনে ভ্রমণ কিংবা গুরুত্বপূর্ণ কাজ থেকে বিরত থাকেন। এদিনে কোনো অঘটন ঘটলে তাৎক্ষণিকভাবে এই দিনটিকেই দায়ী করা হয়। অনেকেই ভাবতে পারেন, এই ব্যাপারটি শুধু সাধারণ লোকজনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। কিন্তু ব্যাপারটি আসলে মোটেই তা নয়। যেমন, ১৯৭০ সালে চন্দ্র অভিযানে পাঠানো মহাকাশ যান অ্যাপোলো ১৩ অল্পের জন্য দুর্ঘটনা থেকে বেঁচে যায়। মহাকাশ যানটি পৃথিবীতে ফিরে আসার পর তার ফ্লাইট কমান্ডার দুর্ঘটনার ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে বলেন, তার আগেই বোঝা উচিত ছিল যে, কিছু একটা ঘটতে যাচ্ছে। তার এ মন্তব্যের কারণ জানতে চাওয়া হলে তিনি বলেন, এটি উৎক্ষেপণ করা হয় শুক্রবার গ্রিনিচ মান ১৩০০ ঘণ্টার সময়, সেদিনটি ছিল ১৩ তারিখ, আবার নভোযানটির নামও ছিল এ্যাপোলো ১৩।

বাইবেলে বর্ণিত যিশুখ্রিষ্টের শেষ নৈশভোজ থেকেই এই বিশ্বাসের উৎপত্তি হয়েছে। এই নৈশভোজে যোগ দিয়েছিল ১৩ জন লোক। এই ১৩ জনের একজন হলো জুডাস, যে যিশুখ্রিষ্টের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল বলে মনে করা হয়। কমপক্ষে দুটি কারণে ১৩ তারিখের শুক্রবারকে বিশেষভাবে অশুভ মনে করা হয়। প্রথমত, এই শুক্রবারেই যিশুখ্রিষ্টকে

www.QuranerAlo.net

ক্রুশবিদ্ধ করা হয়েছিল বলে তাদের ধারণা। দ্বিতীয়ত, মধ্যযুগীয় বিশ্বাস অনুযায়ী, ডাইনিরা শুক্রবারেই তাদের সভা আয়োজন করে থাকে।

এই ধরনের বিশ্বাসের দ্বারা ভালো এবং মন্দ ঘটানোর ব্যাপারে আল্লাহর একচ্ছত্র ক্ষমতায় তাঁর সৃষ্টিকে অংশীদার করা হয়। এছাড়াও এক্ষেত্রে আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো থেকে দুর্ভাগ্য আসার ভয় করা হয় এবং আল্লাহ ব্যতীত অন্যের কাছ থেকে সৌভাগ্য কামনা করা হয়। অথচ এ উভয়টিই হলো ইবাদাহ, যা শুধুমাত্র আল্লাহর উদ্দেশ্যেই নিবেদন করা যাবে। এ ধরনের কাজের মাধ্যমে ভবিষ্যৎ এবং অদৃশ্যের জ্ঞান রাখারও দাবি করা হয়। অথচ এই বৈশিষ্ট্য শুধুমাত্র আল্লাহর। বিষয়টি তিনি তাঁর গুণবাচক নাম, 'আলিম আল-গাইব এর মাধ্যমে সুস্পষ্ট করে দিয়েছেন। এমনকি আল্লাহ কুর'আনে নাবিকে এই স্বীকারোক্তি দিতে বলেছেন যে, তিনি যদি অদেখা ভবিষ্যতের জ্ঞান রাখতেন, তাহলে সকল বিপদ-আপদ থেকেই তিনি নিজেকে বাঁচিয়ে রাখতে সক্ষম হতেন।[২৯]

অতএব, তাওহীদের প্রধান দিকগুলোর আলোকেই, শুভ-অশুভ লক্ষণে বিশ্বাস করাকে সুস্পষ্টরূপে শির্কের অন্তর্ভুক্ত করা যায়। ইব্ন মাসউদ ﷺ থেকে বর্ণিত হাদীসের মাধ্যমে এই বিধানটি আরও বেশি সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে, যেখানে আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন,

"তিয়ারাহ্ হলো শির্ক! তিয়ারাহ্ হলো শির্ক! তিয়ারাহ্ হলো শির্ক!"[৩০]

আব্দুল্লাহ ইব্ন আম্‌র ইবনুল-আস ﷺ থেকেও বর্ণিত হয়েছে যে, নাবি ﷺ বলেছেন,

"তিয়ারাহ্'র কারণে যে কোনো কিছু করা থেকে বিরত থাকল, সে শির্ক করল।" সহাবিরা জিজ্ঞেস করলেন, "এর কাফ্‌ফারা কী?" তিনি উত্তরে বললেন, "বলবে, হে আল্লাহ! আপনার দেওয়া কল্যাণ ছাড়া কোনো কল্যাণ নেই এবং

(২৯) সূরা আল-আরাফ, ৭:১৮৮

(৩০) হাদীসটি আবূ দাউদ, সুনান আবি দাউদ, (ইংরেজি অনুবাদ), খণ্ড ৩, পৃ. ১০৯৬-৭, হাদীস নং ৩৯০১, তিরমিযি এবং ইব্ন মাজাহ্ কর্তৃক সংকলিত।

www.QuranerAlo.net

Contents

আপনার সৃষ্ট শুভ-অশুভ ছাড়া অন্য কোনো শুভ-অশুভ নেই এবং আপনি ব্যতীত সত্য কোনো উপাস্য নেই।"[৩১]

উল্লিখিত হাদীস্ থেকে এটি সুস্পষ্ট যে, তিয়ারাহ্ বা শুভ-অশুভ লক্ষণ শুধু পাখিদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। সকল প্রকার শুভ-অশুভ লক্ষণে বিশ্বাস করাই এর অন্তর্ভুক্ত। এ ধরনের বিশ্বাসের ধরন-প্রক্রিয়া স্থান ও কালভেদে ভিন্ন ভিন্ন হলেও এগুলোর সবই শির্কের অন্তর্ভুক্ত।

অতএব, মুসলিম জাতির উচিত এইসব অপবিশ্বাস থেকে জন্ম নেওয়া সকল ধ্যান-ধারণা সতর্কতার সাথে বর্জন করে চলা। যদি অজ্ঞানতাবশত তারা এইসব বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করে কোনো কাজে জড়িয়ে যায়, তাহলে তাওবা করবে এবং আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করে তারা উল্লিখিত দুআ পাঠ করবে।

বিষয়টিকে এত বেশি স্পর্শকাতর হিসেবে তুলে ধরাকে কারো কাছে নিরর্থক মনে হতে পারে। কিন্তু ইসলাম এর উপর এত গুরুত্বারোপ করার কারণ হলো, এটা সেই বীজ যার থেকে সবচেয়ে গুরুতর শির্ক জন্ম নিতে পারে। মূর্তিপূজা, মানুষপূজা, কবরপূজা, বৃক্ষপূজা ও তারকাপূজা ইত্যাদির প্রচলন রাতারাতি শুরু হয়নি। কালের দীর্ঘ পরিক্রমায় পৌত্তলিকতার এই বিষবৃক্ষ ডালপালা ছড়িয়েছে। শির্কের বীজ গভীর থেকে গভীরে শিকড় গেড়েছে। সাথে সাথে আল্লাহর একত্বে মানুষের বিশ্বাস ক্রমশ ক্ষীণ হতে থেকেছে। এজন্যই জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে রয়েছে ইসলামের দিকনির্দেশনা। একজন মুসলিমের বিশ্বাসের ভিত্তিকে ধ্বংস করার পূর্বেই ইসলাম শির্কের বীজকে সমূলে উৎপাটন করার চেষ্টা করে।

---

(৩১) আহ্মাদ এবং আত-তাবারানি কর্তৃক সংকলিত।

www.QuranerAlo.net

পঞ্চম অধ্যায়

ভাগ্য গণনা করা

এমন কিছু লোক প্রায় সকল সমাজেই আছে যারা ভবিষ্যৎ এবং অদৃশ্যের জ্ঞান রাখে বলে দাবি করে। এরা বিভিন্ন নামে পরিচিত। যেমন গণক, ভবিষ্যদ্বক্তা, ভবিষ্যৎদ্রষ্টা, গ্রহাচার্য, জাদুকর, লক্ষণবিদ, দৈবজ্ঞ, জ্যোতিষী, হস্তরেখাবিদ ইত্যাদি। এরা বিভিন্ন কৌশল এবং মাধ্যম ব্যবহার করে তাদের তথ্য উদ্‌ঘাটন করে বলে দাবি করে থাকে। যেমন, চায়ের পাতা পড়া, নকশা অঙ্কন করা, সংখ্যা লেখা, হাত দেখা, রাশি গণনা করা, স্ফটিক-বলের দিকে তাকিয়ে থাকা, হাড় দিয়ে হাড়ে আঘাত করা, লাঠি চালান করা ইত্যাদি। এই অধ্যায়ে শুধু ভাগ্য গণনার বিভিন্ন কলাকৌশল নিয়ে আলোচনা করা হবে এবং পরবর্তী অধ্যায়ে জাদু নিয়ে আলোচনা করা হবে।

সাধারণত গুপ্তবিদ্যার (Occult Art) মাধ্যমে অদৃশ্য বিষয় প্রকাশ করা এবং ভবিষ্যদ্বাণী করার দাবি করা হয়। যারা এসব চর্চা করে তাদেরকে দুটি প্রধান শ্রেণিতে ভাগ করা যায়ঃ

১. প্রথম দলটি হলো, যাদের কাছে কোনো বাস্তবিক কিংবা গুপ্তজ্ঞান বলতে কিছুই থাকে না। ভবিষ্যৎ সম্পর্কে বলতে গিয়ে এরা কেবল সেইসব সাধারণ ঘটনাবলির উপর নির্ভর করে, যেগুলো অধিকাংশ মানুষের জীবনেই ঘটে থাকে। প্রায়ই দেখা যায়, তারা প্রথমেই কিছু অর্থহীন কাজ করে। তারপর খুব বুঝে-শুনে কিছু অনুমানভিত্তিক কথা বলে। স্বাভাবিকভাবেই এসব কথার কিছু কিছু সত্য হয়। কারণ কথাগুলো সাধারণভাবে সব মানুষের ক্ষেত্রেই সত্য। মানুষের প্রবণতা হলো, যে ক'টা কথা সত্য হয়, সেগুলো মনে রেখে বাকিগুলো ভুলে যাওয়া। এমন প্রবণতার কারণ হলো, কিছুদিন পরেই ভবিষ্যদ্বাণীগুলো অবচেতন মনে অর্ধভোলা ভাবনায় পরিণত হয় এবং প্রাসঙ্গিক ঘটনার সূত্র ধরেই কেবল তা মনে পড়ে। যেমন, প্রতি বছরের

www.QuranerAlo.net

শুরুতেই প্রখ্যাত বিভিন্ন গণকদের ভবিষ্যদ্বাণী প্রকাশ করা উত্তর অ্যামেরিকায় একটি সাধারণ রীতি হয়ে গিয়েছে। ১৯৮০ সালের বিভিন্ন ভবিষ্যদ্বাণীর উপর চালানো এক সমীক্ষা অনুযায়ী, ভবিষ্যদ্বক্তাদের মধ্যে যিনি সবচেয়ে নির্ভুল ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন তিনি একজন মহিলা, যার ভবিষ্যদ্বাণীর মাত্র ২৪ শতাংশ সঠিক হয়েছিল!

২. দ্বিতীয় দলটি হলো, সত্যিকার গণক। এরা জিনদের সাথে সংযোগ স্থাপন করে। এদের ব্যাপারটি বেশি গুরুতর। কারণ স্বাভাবিকভাবেই এই দলটির সাথে সবচেয়ে গুরুতর শির্ক জড়িত। যারা এসব চর্চা করে, তাদের দেওয়া তথ্য অনেক নির্ভুল হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। এতে করে মুসলিম-অমুসলিম নির্বিশেষে এটার প্রতি একটা দুর্নিবার আকর্ষণ সৃষ্টি হয়।

জিনদের জগৎ

কিছু মানুষ জিন জাতির অস্তিত্বকে অস্বীকার করার চেষ্টা করেছেন। অথচ কুর'আনে জিনদের সম্পর্কে, 'আল-জিন' নামে একটি সম্পূর্ণ সূরা-ই রয়েছে। 'জিন' শব্দটি এসেছে ক্রিয়ামূল জান্না-ইয়াজুন্নু থেকে যার অর্থ, 'আবৃত করা, লুকানো বা গোপন করা।' এই আক্ষরিক অর্থের উপর ভিত্তি করে তাদের দাবি হলো, জিন বলতে প্রকৃত অর্থে 'চালাক ভিনদেশী' বুঝায়। অনেকে আবার এমনও বলেছেন যে, যাদের মন বলতে কিছু নেই এবং মেজাজ সারাক্ষণ আগুন হয়ে থাকে, তারাই হলো জিন। কিন্তু বাস্তবতা হলো, জিন জাতি আল্লাহর এক স্বতন্ত্র সৃষ্টি যারা এই পৃথিবীতে মানুষের সাথেই সহাবস্থান করছে। মানুষ সৃষ্টি করার আগেই আল্লাহ জিনদের সৃষ্টি করেছেন এবং তাদেরকে মানুষের থেকে আলাদা উপাদান দিয়ে তৈরি করেছেন। আল্লাহ ﷻ এ প্রসঙ্গে বলেন,

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ ﴿٢٦﴾ وَالْجَانَّ
خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ مِن نَّارِ السَّمُومِ ﴿٢٧﴾

www.QuranerAlo.net

"আর অবশ্যই আমরা মানুষকে সৃষ্টি করেছি শুকনো ঠনঠনে, কালচে কাদামাটি থেকে। আর ইতঃপূর্বে জিনকে সৃষ্টি করেছি উত্তপ্ত অগ্নিশিখা থেকে।"

(আল-হিজ্‌র, ১৫:২৬-২৭)

এদেরকে জিন বলার কারণ হলো, এদের অবস্থান মানুষের দৃষ্টির আড়ালে। আল্লাহ যখন আদামকে সিজদা করার জন্য ফেরেশতাদের আদেশ দিয়েছিলেন, ইবলীস (শয়তান) তখন ফেরেশতাদের মধ্যে অবস্থান করলেও, সে ছিল মূলত জিন জাতির সদস্য। আদামকে সিজদা করতে অস্বীকার করার কারণ জানতে চাওয়া হলে সে যা বলেছিল, সে সম্পর্কে আল্লাহ ﷻ বলেছেন,

قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ ﴿٧٦﴾

"সে বলল, আমি তার চেয়ে শ্রেষ্ঠ। আপনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন আগুন থেকে আর তাকে সৃষ্টি করেছেন মাটি থেকে।" (সদ, ৩৮:৭৬)

আইশাহ ﵂ বর্ণনা করেন যে, নাবি ﷺ বলেছেন,

"ফেরেশতাদের সৃষ্টি করা হয়েছে আলো থেকে এবং জিনদের ধোঁয়াহীন অগ্নিশিখা থেকে।"(১)

আল্লাহ ﷻ আরও বলেন,

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ

"আর যখন আমি ফেরেশতাদের বলেছিলাম, তোমরা আদামকে সিজদা করো। অতঃপর ইবলীস ছাড়া তারা সকলেই সিজদা করল।। সে ছিল জিনদের একজন।..."

(আল-কাহ্‌ফ, ১৮:৫০)

অতএব, ইবলীসকে কোনো পথভ্রষ্ট ফেরেশতা মনে করাটা মারাত্মক ভুল।

(১) মুসলিম, (ইংরেজি অনুবাদ), খণ্ড ৪, পৃ. ১৫৪০, হাদীস নং ৭১৩৪।

www.QuranerAlo.net

অস্তিত্বের ধরন অনুযায়ী, জিনদেরকে তিনটি প্রধান শ্রেণিতে ভাগ করা যায়। নাবি ﷺ বলেছেন,

"জিনদের মধ্যে তিনটি শ্রেণি আছে, একটি শ্রেণি সব সময় বাতাসে উড়ে বেড়ায়, আরেকটি শ্রেণি সাপ ও কুকুরের আকৃতিতে বিদ্যমান এবং অন্য শ্রেণিটি এই পৃথিবীর অধিবাসী, যারা কোনো নির্দিষ্ট স্থানে বাস করে অথবা বিভিন্ন স্থানে ঘুরে বেড়ায়।"(২)

আদর্শিক দিক থেকে জিনদেরকে দুই শ্রেণিতে ভাগ করা যায়, আল্লাহর অনুগত মুসলিম এবং কাফির। সূরা 'আল-জিন'-এ বিশ্বাসী জিনদের উদ্দেশ্যে আল্লাহ ﷻ বলেন,

قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا ﴿١﴾
يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ ۖ وَلَن نُّشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا ﴿٢﴾ وَأَنَّهُ تَعَالَىٰ جَدُّ
رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا ﴿٣﴾ وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ
شَطَطًا ﴿٤﴾

"বলুন, আমার প্রতি ওয়াহ্‌য়ি করা হয়েছে যে, নিশ্চয়ই জিনদের একটি দল মনোযোগ সহকারে শুনেছে। অতঃপর বলেছে, আমরা তো এক বিস্ময়কর কুর'আন শুনেছি, যা সত্যের দিকে পথ প্রদর্শন করে; অতঃপর আমরা তাতে ঈমান এনেছি। আর আমরা কখনো আমাদের রবের সাথে কাউকে শরিক করব না। নিশ্চয়ই আমাদের রবের মর্যাদা সুউচ্চ। তিনি কোনো সঙ্গিনী গ্রহণ করেননি এবং না কোনো সন্তান। আর আমাদের মধ্যকার নির্বোধরা আল্লাহর ব্যাপারে অবাস্তব কথাবার্তা বলত।" (আল-জিন, ৭২:১-৪)

وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ ۖ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَٰئِكَ تَحَرَّوْا
رَشَدًا ﴿١٤﴾ وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا ﴿١٥﴾

(২) আত-তাবারানি এবং আল-হাকিম কর্তৃক সংকলিত।

www.QuranerAlo.net

"নিশ্চয়ই আমাদের মধ্যে কিছু সংখ্যক আছে আত্মসমর্পণকারী এবং কিছু সংখ্যক সীমালঙ্ঘনকারী। কাজেই যারা আত্মসমর্পণ করেছে তারাই সঠিক পথ বেছে নিয়েছে। আর যারা সীমালঙ্ঘনকারী তারা তো জাহান্নামের ইন্ধন।"

(আল-জিন, ৭২:১৪-১৫)

কাফির জিনদেরকে আরবি এবং বাংলা উভয় ভাষাতেই বিভিন্ন নামে ডাকা হয়: ইফ্‌রীত, শাইত্বান, কারীন, দানব, প্রেত, প্রেতাত্মা, ভূত ইত্যাদি। এরা বিভিন্ন পন্থায় মানুষকে বিপথগামী করার চেষ্টা করে। যারাই এদের কথায় কান দেয় এবং তাদের হয়ে কাজ করে, তাদেরকে বলা হয় মানব শয়তান। আল্লাহ ﷻ বলেন,

وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ

"আর এভাবেই আমি মানুষ ও জিনের মধ্য থেকে শয়তানদেরকে প্রত্যেক নাবির জন্য শত্রু বানিয়েছি...।" (আল-আনআম, ৬:১১২)

প্রতিটি মানুষের সাথে একটি জিন রয়েছে, যাকে কারীন বা সঙ্গী বলা হয়। পার্থিব জীবনে মানুষের পরীক্ষার অংশ এটি। এই জিন মানুষের পাশবিক প্রবৃত্তিগুলোকে উস্কে দিতে থাকে এবং প্রতি মুহূর্তে তাকে সৎকর্মশীলতা থেকে বিচ্যুত করার চেষ্টা চালায়। এই ব্যাপারটিকে নাবি ﷺ এভাবে ব্যাখ্যা করেছেন,

> "তোমাদের প্রত্যেকের জন্য একটি জিন সঙ্গী নিযুক্ত করা হয়েছে।" সহাবিরা জিজ্ঞেস করলেন, "হে আল্লাহর রসূল! আপনার জন্যেও কি?" নাবি ﷺ উত্তরে বললেন, "এমনকি আমার জন্যেও, তবে তার বিরুদ্ধে আল্লাহ আমাকে সাহায্য করেছেন এবং সে আত্মসমর্পণ করেছে। এখন সে আমাকে শুধু ভালোটাই করতে বলে।"(৩)

নুবুওয়াতের প্রমাণস্বরূপ নাবি সুলাইমান ﷺ কে জিনদেরকে নিয়ন্ত্রণ করার অলৌকিক ক্ষমতা দান করা হয়েছিল। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ ﷻ বলেছেন,

(৩) সহীহ মুসলিম, (ইংরেজি অনুবাদ), খণ্ড ৪, পৃ. ১৪৭২, হাদীস নং ৬৭৫৭।

www.QuranerAlo.net

وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ

"আর সুলাইমানের জন্য তার সেনাবাহিনী থেকে জিন, মানুষ ও পাখিদের সমবেত করা হলো। তারপর এদেরকে বিন্যস্ত করা হলো।" (আন-নাম্‌ল, ২৭:১৭)

তবে এই ক্ষমতা আর কাউকে দেওয়া হয়নি। অন্য আর কাউকেই জিনদের নিয়ন্ত্রণ করার অনুমতি বা ক্ষমতা দেওয়া হয়নি এবং কেউ তা করতেও পারে না। একদিন নাবি ﷺ বলেন,

> "এটা নিশ্চিত যে, আমার সলাত ভাঙার জন্য গত রাতে জিনদের মধ্য থেকে একটা ইফরীত[৪] আমার দিকে থুথু নিক্ষেপ করেছিল। তবে তার উপর বিজয়ী হতে আল্লাহ আমাকে সাহায্য করেছেন। সকালবেলা তোমাদেরকে দেখানোর জন্য তাকে মাসজিদের খুঁটির সাথে বাঁধতে চেয়েছিলাম। তখনই আমার ভাই, সুলাইমানের দুআ আমার মনে পড়ে গেল। তিনি বলেছিলেন,
>
> قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَّا يَنبَغِي لِأَحَدٍ مِّن بَعْدِي
>
> **"হে আমার রব! আমাকে ক্ষমা করুন এবং আমাকে এমন এক রাজত্ব দান করুন যা আমার পর আর কারও জন্যই প্রযোজ্য হবে না।..."** (সূদ, ৩৮:৩৫)(৫)

অতএব কোনো মানুষই জিনদের উপর নিয়ন্ত্রণ লাভ করতে পারে না। কারণ এটি এক বিশেষ অলৌকিকত্ব যা কেবল নাবি সুলাইমান ﷺ কেই দেওয়া হয়েছিল। সত্যি বলতে, ঘটনাক্রমে কিংবা জিন কারো উপর ভর না করলে, জিনদের সাথে সংযোগ স্থাপনের জন্য যা কিছুই করা হয়, সবকিছুই চরম ঘৃণিত শারীআহ বিরোধী কাজ।[৬] এসব পন্থায় কেউ দুষ্ট জিন হাজির

---

(৪) একটি শক্তিশালী বা ক্ষমতাধর দুষ্ট জিন (E. W. Lane, Arabic-English Lexicon, Cambridge, Engiland: Islamic Texts Society, 1984, vol. 2, পৃ. ২০৮৯).

(৫) বুখারি, (আরবি-ইংরেজি), খণ্ড ১, পৃ. ২৬৮, হাদীস্ নং ৭৫ এবং মুসলিম, (ইংরেজি অনুবাদ), খণ্ড ১, পৃ. ২৭৩, হাদীস্ নং ১১০৪।

(৬) Abu Ameenah Bilal Philips, Ibn Taymiyah's Essay on the Jinn, (Riyadh: Tawhid Publication, 1989, পৃ. ২১).

www.QuranerAlo.net

করলে সে তাকে নানাবিধ পাপাচার ও কুফ্‌রি করতে প্ররোচিত করতে পারে। এদের লক্ষ্যই হলো আল্লাহ ব্যতীত কিংবা আল্লাহর পাশাপাশি অন্যের উপাসনা করার মতো জঘন্য কাজে মানুষকে প্ররোচিত করা।

গণকদের সাথে জিনদের সংযোগ স্থাপন এবং বোঝাপড়া হয়ে গেলে, জিনেরা তখন গণকদেরকে ভবিষ্যতের বিভিন্ন ঘটনা সম্পর্কে আগাম তথ্য জানায়। জিনেরা কীভাবে ভবিষ্যৎ সম্পর্কে তথ্য জোগাড় করে, সে সম্পর্কে নাবি ﷺ বর্ণনা দিয়েছেন। তিনি বলেছেন যে, জিনেরা প্রথম আকাশের নিম্নসীমা পর্যন্ত পৌঁছতে এবং ভবিষ্যৎ ঘটনাবলি সম্পর্কে ফেরেশতাদের মধ্যে পারস্পরিক আলোচনায় আড়িপাততে সক্ষম। তারা পৃথিবীতে ফিরে এসে ওইসব তথ্য তাদের বন্ধু মানব শয়তানদের কাছে সরবরাহ করে থাকে।[৭] মুহাম্মাদের ﷺ নুবুওয়াত প্রাপ্তির পূর্ব পর্যন্ত এমন ঘটনা প্রচুর পরিমাণে ঘটত। তাই তখনকার সময়ে গণকদের ভবিষ্যদ্বাণীগুলোও হতো বেশ নির্ভুল। এ কারণে তারা রাজসভায় পদ লাভ করত এবং বিপুল জনপ্রিয়তা অর্জন করত। এমনকি পৃথিবীর অনেক অঞ্চলে তাদের পূজাও করা হতো।

নাবি ﷺ নুবুওয়াত প্রাপ্তির পর পরিস্থিতি বদলে গেল। আল্লাহ আকাশের নিম্নসীমায় ফেরেশতাদেরকে প্রহরায় নিযুক্ত করলেন। অধিকাংশ জিনদেরকে তারা উল্কাপিণ্ড এবং নিক্ষিপ্ত তারকা দিয়ে তাড়িয়ে দিতে লাগলো। এক জিন কর্তৃক বর্ণিত এই বিস্ময়কর ঘটনাটি আল্লাহ কুর'আনের নিম্নোক্ত আয়াতে বর্ণনা করেছেনঃ

وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا ﴿٨﴾
وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ ۖ فَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا
رَّصَدًا ﴿٩﴾

"আর নিশ্চয়ই আমরা আকাশ স্পর্শ করতে চেয়েছিলাম, কিন্তু আমরা সেটাকে পেলাম যে, তা কঠোর প্রহরী এবং উল্কাপিণ্ড দ্বারা পরিপূর্ণ। আর আমরা তো

(৭) বুখারি এবং মুসলিম, (ইংরেজি অনুবাদ), খণ্ড ৪, পৃ. ১২১০, হাদীস নং ৫৫৩৮।

www.QuranerAlo.net

সংবাদ শোনার জন্য আকাশের বিভিন্ন ঘাঁটিতে বসতাম, কিন্তু এখন যে শুনতে চাইবে তার জন্য প্রস্তুত রয়েছে জ্বলন্ত উল্কাপিণ্ড।" (আল-জিন, ৭২:৮-৯)

আল্লাহ ﷻ আরও বলেন,

وَحَفِظْنَاهَا مِن كُلِّ شَيْطَانٍ رَّجِيمٍ ﴿١٧﴾ إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُّبِينٌ ﴿١٨﴾

"আর আমি তাকে সুরক্ষিত করেছি প্রত্যেক বিতাড়িত শয়তান থেকে। যে গোপনে শুনতে যায়, তৎক্ষণাৎ সুস্পষ্ট জ্বলন্ত অগ্নিশিখা তার পিছু নেয়।" (আল-হিজ্‌র, ১৫:১৭-১৮)

ইব্‌ন 'আব্বাস ﷺ বলেন,

"একদিন নাবি ﷺ এবং তাঁর একদল সহাবি উকাযের বাজারের উদ্দেশে রওনা হলেন, তখন শয়তানদেরকে আকাশের তথ্য শোনা থেকে বাধা দেওয়া হলো। তাদের উপর বৃষ্টির মতো উল্কাপিণ্ড নিক্ষেপ করা হলো। ফলে তারা নিজ গোত্রের জিনদের কাছে ফিরে এলো। অন্যরা যখন ঘটনা সম্পর্কে জানতে চাইল, তারা তাদেরকে তা বলল। তাদের কেউ বলল, অবশ্যই কিছু একটা ঘটেছে। তাই কারণ খুঁজতে তারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ল। তাদের কেউ কেউ সলাত অবস্থায় নাবি ﷺ এবং তাঁর সহাবিদের দেখা পেল এবং কুর'আন শুনল। তারা নিজের মাঝে বলাবলি করতে লাগল যে, নিশ্চিতভাবে এটিই তাদেরকে (আকাশের খবর) শোনা থেকে বাধা দিয়েছে। যখন তারা স্বজাতির কাছে ফিরে এলো, তারা তাদেরকে বলল,

...إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا ﴿١﴾ يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ ۖ وَلَن نُّشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا ﴿٢﴾

"...নিশ্চয়ই জিনদের একটি দল মনোযোগ সহকারে শুনেছে। অতঃপর বলেছে, আমরা তো এক বিস্ময়কর কুর'আন শুনেছি, যা সত্যের দিকে পথ প্রদর্শন করে;

www.QuranerAlo.net

অতঃপর আমরা তাতে ঈমান এনেছি। আর আমরা কখনো আমাদের রবের সাথে কাউকে শরিক করব না।" (আল-জিন, ৭২:১-২)(৮)

এ কারণেই নাবি ﷺ-এর দীন প্রচারের কার্যক্রম শুরুর আগে জিনেরা যত সহজে ভবিষ্যৎ সম্পর্কে তথ্য জোগাড় করতে পারত, এখন আর তত সহজে তা পারে না। এ কারণেই তারা এখন তাদের তথ্যের সাথে অনেক মিথ্যার সংমিশ্রণ ঘটায়। নাবি ﷺ বলেছেন,

> "তারা (জিনেরা) পৃথিবীতে তথ্য পাঠাতেই থাকে, যতক্ষণ না তা কোনো জাদুকর বা গণকের মুখে পৌঁছায়। অনেক সময় তথ্য পাচার করার আগেই তারা উল্কাপিণ্ডের আঘাতে ধরাশায়ী হয়। তবে ধরাশায়ী হওয়ার আগেই যদি তথ্য পাচার হয়ে যায়, তবে এর সাথে তারা একশটা মিথ্যা জুড়ে দেয়।"(৯)

আইশাহ ﷺ বর্ণনা করেন, তিনি আল্লাহর রসূল ﷺ কে গণকদের সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি উত্তরে বলেছিলেন, তারা আসলে কিছুই না। তারপর আইশাহ ﷺ উল্লেখ করেন যে, গণকেরা তাদেরকে মাঝে মাঝে এমন কিছু কথা বলেছিল যেগুলো সত্য হয়েছিল। একথা শুনে নাবি ﷺ বলেন,

> "ওটা হলো সত্যের সেই সামান্য অংশ যা ওই জিন চুরি করে শুনে নেয় এবং তার (মানব শয়তান) বন্ধুর কানে পৌঁছে দেয়; আর সে তার সাথে একশটা মিথ্যা যোগ করে বলে বেড়ায়।"(১০)

উমার ইবনুল-খাত্তাব ﷺ একদিন বসেছিলেন। এমন সময় এক সুদর্শন ব্যক্তি(১১) তাঁর পাশ দিয়ে চলে গেল। তাকে দেখে তিনি বললেন,

> "আমার যদি ভুল না হয়, তবে এই লোক এখনও তার ইসলামপূর্ব ধর্মের অনুসরণ করছে, নয়তো সে একজন গণক ছিল।" তিনি সেই লোককে তাঁর সামনে হাজির করার নির্দেশ দিলেন এবং তিনি যে আশঙ্কা করেছিলেন সে

(৮) বুখারি, (আরবি-ইংরেজি), খণ্ড ৬, পৃ. ৪১৫-৬, হাদীস নং ৪৪৩, মুসলিম, (ইংরেজি অনুবাদ), খণ্ড ১, পৃ. ২৪৩-৪, হাদীস নং ৯০৪, তিরমিযি এবং আহমাদ।

(৯) বুখারি, (আরবি-ইংরেজি), খণ্ড ৮, পৃ. ১৫০, হাদীস নং ২৩২ এবং তিরমিযি।

(১০) বুখারি, (আরবি-ইংরেজি), খণ্ড ৭, পৃ. ৪৩৯, হাদীস নং ৬৫৭ এবং মুসলিম, (ইংরেজি অনুবাদ), খণ্ড ৪, পৃ. ১২০৯, হাদীস নং ৫৫৩৫।

(১১) তার নাম ছিল সাওয়াদ ইব্ন কারিব।

www.QuranerAlo.net

সম্পর্কে জানতে চাইলেন। লোকটি উত্তরে বলল, "আমি কখনোই এমন একটি দিনের মুখোমুখি হইনি, যখন একজন মুসলিমকে এই ধরনের অভিযোগের শিকার হতে হয়েছে।" উমার ﷺ বললেন, "তোমার থেকে যা জানতে চেয়েছি তা বলো।" লোকটি তখন বলল, "জাহেলী যুগে আমি গণক ছিলাম।" একথা শুনে উমার জানতে চাইলেন, "সবচেয়ে অদ্ভুত যে বিষয়টি তোমার নারী জিনটি তোমাকে বলেছিল, আমাকে তা বলো।" লোকটি তখন বলল, "একদিন আমি যখন বাজারে ছিলাম, সে পুরোপুরি বিচলিত হয়ে আমার কাছে এসে বলল, লাঞ্ছিত হওয়ার পর নিরাশ অবস্থায় তুমি কি জিনদেরকে দেখোনি? তুমি কি তাদেরকে উটনী আরোহীদের পিছু নিতে দেখোনি?"[১২] উমার বিস্ময় প্রকাশ করে বললেন, "এটা কি সত্যি?"[১৩]

জিনেরা তাদের মানব দোসরদেরকে কিছু অদৃশ্য বিষয় সম্পর্কে জানাতেও সক্ষম। উদাহরণস্বরূপ, কেউ যখন গণকের কাছে আসে, আসার আগে সে কী পরিকল্পনা করেছে, গণকের জিন ওই ব্যক্তির কারীন[১৪] এর কাছ থেকে তা জেনে নেয়। এ কারণেই গণক তাকে বলে দিতে পারে, সে অমুক কাজ করার পরিকল্পনা করেছে কিংবা অমুক অমুক জায়গায় যাবে। এই পদ্ধতির মাধ্যমে একজন সত্যিকার গণক অপরিচিত একজন ব্যক্তির অতীত সম্পর্কে খুঁটিনাটি সবকিছু জেনে যেতে সক্ষম। সে সম্পূর্ণ অপরিচিত একজন মানুষের বাবা-মার নাম, জন্মস্থান, শৈশবের বিভিন্ন ঘটনা ইত্যাদি বলে দিতে পারে। এ ধরনের অদৃশ্য বিষয় বলতে পারাটা সত্যিকার গণকের একটি লক্ষণ। এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, জিনদের সাথে তার সংযোগ আছে। কারণ জিনেরা মুহূর্তের মধ্যে হাজার মাইলের দূরত্ব অতিক্রম করতে পারে। তারা গোপন বস্তু, হারানো জিনিসপত্র, চোখের আড়ালে ঘটে যাওয়া ঘটনা ইত্যাদি সম্পর্কে যাবতীয় তথ্য সংগ্রহ করতেও সক্ষম। কুর'আনে নাবি সুলাইমান ﷺ এবং শেবার রাণী বিলকীসের ঘটনার মধ্যেই জিনদের এই ক্ষমতার প্রমাণ পাওয়া যায়। রাণী বিলকীস নাবি সুলাইমান ﷺ এর সাথে দেখা করতে এলে

---

(১২) ফেরেশতাদের আলোচনায় আড়িপাতা থেকে বাধাপ্রাপ্ত হলে, এই বাধাপ্রাপ্তির কারণ কী, তা জানার জন্য জিনেরা আরবদের পিছু নিয়েছিল।

(১৩) বুখারি, (আরবি-ইংরেজি), খণ্ড ৫, পৃ. ১৩১-২, হাদীস নং ২০৬।

(১৪) প্রত্যেক মানুষের জন্য নিযুক্ত যে জিন থাকে।

www.QuranerAlo.net

রানির দেশ থেকে তার সিংহাসনটিকে নিয়ে আসার জন্য সুলাইমান ﷺ জিনদেরকে নির্দেশ দিয়েছিলেন।

قَالَ عِفْرِيتٌ مِّنَ الْجِنِّ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَن تَقُومَ مِن مَّقَامِكَ ۖ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ ﴿٣٩﴾

"এক শক্তিশালী জিন বলল, আপনি আপনার স্থান থেকে ওঠার পূর্বেই আমি তা এনে দেব। আমি নিশ্চয়ই এই ব্যাপারে শক্তিমান, বিশ্বস্ত।"

(আন-নামল, ২৭:৩৯)

ভাগ্য গণনার ব্যাপারে ইসলামি বিধান

ভাগ্য গণনার মধ্যে শারীআহবিরোধী এবং তাওহীদ বিনষ্টকারী অনেক বিষয় জড়িত থাকার কারণে এর বিরুদ্ধে ইসলামের অবস্থান খুবই কঠোর। ইসলাম ভাগ্য গণকদের সাথে সকল প্রকার সম্পৃক্ততার বিরোধিতা করে এবং তাদেরকে এইসব নিষিদ্ধ কাজকর্ম পরিত্যাগ করার জন্য আহ্বান জানায়।

গণকের কাছে যাওয়া

কোনো অবস্থাতেই গণকদের শরণাপন্ন হওয়া বৈধ নয়। কারণ নাবি ﷺ এই ব্যাপারে সুস্পষ্টভাবে নীতি নির্ধারণ করে দিয়েছেন। নাবি ﷺ এর স্ত্রী হাফ্সা থেকে সাফিয়্যা বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন,

> "গণকের কাছে গিয়ে যদি কেউ কোনো বিষয়ে জানতে চায়, তবে তার ৪০ দিন এবং ৪০ রাতের সলাত কবুল হবে না।"(১৫)

হাদীসে উল্লিখিত শাস্তি শুধু গণকের কাছে যাওয়া এবং কৌতূহলবশত তার কাছে কিছু জানতে চাওয়ার জন্য। এই নিষেধাজ্ঞা মুআবিয়া ইবনুল-

(১৫) মুসলিম, (ইংরেজি অনুবাদ), খণ্ড ৪, পৃ. ১২১১, হাদীস নং ৫৫৪০।

www.QuranerAlo.net

হাকাম আস-সালামী ﷺ থেকে বর্ণিত হাদীসের দ্বারা আরও বেশি জোরালো হয়েছে। তিনি বলেন,

> "হে আল্লাহর রসূল! আমাদের মধ্যে এমন লোক আছে যারা গণকের কাছে যায়।" নাবি ﷺ উত্তরে বলেন, "তাদের কাছে যাবে না।"(১৬)

শুধু গণকের কাছে গেলেই এমন কঠোর শাস্তির বিধান রাখা হয়েছে। কারণ গণকের কাছে যাওয়াই হলো ভাগ্য গণনায় বিশ্বাসের শুরু। ভাগ্য গণনার বাস্তবতা সম্পর্কে সন্দিহান কোনো লোক যদি গণকের কাছে যায় এবং তার দু'একটা ভবিষ্যদ্বাণী যদি সত্যি হয়ে যায়, তাহলে ওই লোক প্রকৃত অর্থেই গণকের ভক্ত এবং ভাগ্য গণনায় একনিষ্ঠ বিশ্বাসী হয়ে পড়বে।

কোনো ব্যক্তি যদি গণকের কাছে যায়, তারপরও তাকে পুরো ৪০ দিনের ফরজ সলাত আদায় করতে হবে। যদিও সে এই সলাতের বিনিময়ে কোনো সওয়াব পাবে না। কবুল হবে না মনে করে যদি সে সলাত আদায়ই ত্যাগ করে বসে, তাহলে সে আরও একটি কাবীরা গুনাহ করল। চুরি করা সামগ্রীর উপরে কিংবা ভিতরে সলাত আদায় করলে সাওয়াব পাওয়া না পাওয়ার ব্যাপারে অধিকাংশ ফাকীহদের যে মত, এটিও তেমনই একটি বিষয়। তাদের মতে, স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে কেউ যখন ফরজ সলাত আদায় করে তখন তার ফলাফল দুটিঃ

১. ব্যক্তি সলাত আদায়ের দায়বদ্ধতা থেকে মুক্তি পায়।

২. সলাতের বিনিময়ে সে সওয়াব পায়।

চুরি করা সামগ্রীর উপরে কিংবা অন্যায়ভাবে দখলকৃত সম্পত্তির মধ্যে সলাত আদায় করলে, সলাত আদায়ের দায়বদ্ধতা থেকে মুক্তি পাওয়া যায় ঠিকই, তবে এজন্য কোনো সওয়াব পাওয়া যায় না।(১৭) এ কারণেই নাবি ﷺ একই ফরজ সলাত দুইবার পড়তে নিষেধ করেছেন।

---

(১৬) মুসলিম, (ইংরেজি অনুবাদ), খণ্ড ৪, পৃ. ১২০৯, হাদীস নং ৫৫৩২।

(১৭) তাইসীর আল-আযীয আল-হামীদ, পৃ. ৪০৭ –তে উদ্ধৃত আন-নাওয়াউইর বক্তব্য।

www.QuranerAlo.net

গণকের কথা বিশ্বাস করা

কেউ যদি এমন বিশ্বাস পোষণ করে যে, কোনো গণক অদৃশ্য এবং ভবিষ্যতের জ্ঞান রাখে; তাহলে ইসলামি বিধান অনুযায়ী সে কুফ্‌রি করল। আবু হুরায়রা এবং আল-হাসান ﷺ উভয়েই নাবি ﷺ থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন,

"যে ব্যক্তি কোনো ভবিষ্যদ্বক্তা বা গণকের কাছে গেল এবং সে যা বলে তা বিশ্বাস করল, সে মুহাম্মাদের উপর যা অবতীর্ণ হয়েছে তা অবিশ্বাস করল।"(১৮)

অদৃশ্য এবং ভবিষ্যতের জ্ঞান রাখা একমাত্র আল্লাহর গুণ। এ ধরনের বিশ্বাস আল্লাহর সেই গুণকে তাঁর সৃষ্টির উপর আরোপ করে। এতে তাওহীদ আল-আসমা' ওয়াস-সিফাত ধ্বংস হয়ে যায়। তাওহীদের এই শাখায় এটি এক প্রকার শির্ক।

যারা গণকদের রচিত বই ও পত্র-পত্রিকায় তাদের লিখনি পড়ে এবং রেডিও-টিভিতে তাদের কথা শোনে, তারা কুফ্‌রিতে লিপ্ত হয়ে পড়ে। কেননা গণকের কাছে যাওয়া আর এই কাজের মধ্যে মূলত কোনো পার্থক্য নেই। বিংশ শতাব্দীর গণকরা বহুল প্রচলিত এসব মাধ্যম ব্যবহার করে তারা তাদের কথাবার্তা মানুষের মাঝে ছড়িয়ে দিচ্ছে।

কুর'আনে আল্লাহ সুস্পষ্টরূপে জানিয়ে দিয়েছেন যে, তিনি ছাড়া আর কেউই অদৃশ্যের খবর জানে না। এমনকি নাবি মুহাম্মাদও ﷺ না। আল্লাহ ﷻ বলেছেনঃ

وَعِندَهُۥ مَفَاتِحُ ٱلْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَآ إِلَّا هُوَ ۚ .....

"কেবল তাঁর কাছেই রয়েছে অদৃশ্যের চাবিসমূহ, তিনি ছাড়া এ বিষয়ে কেউ জানে না...।" (আল-আনআম, ৬:৫৯)

অতঃপর তিনি নাবি ﷺ কে বলেন,

---

(১৮) ইমাম আহ্‌মাদ, সুনান আবি দাউদ, (ইংরেজি অনুবাদ), খণ্ড ৩, পৃ. ১০৯৫, হাদীস্ নং ৩৮৫৯ এবং আল-বায়হাকি।

www.QuranerAlo.net

قُل لَّا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ ۚ وَلَوْ كُنتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ ۚ

"বলুন, আমি আমার নিজের কোনো উপকার ও ক্ষতির ক্ষমতা রাখি না, তবে আল্লাহ যা চান। আর আমি যদি গাইব জানতাম, তাহলে অধিক পরিমাণ কল্যাণ নিজের ভাগে তুলে নিতাম এবং আমাকে কোনো ক্ষতি স্পর্শ করত না..."

(আল-আরাফ, ৭:১৮৮)

আল্লাহ ﷻ আরও বলেন,

قُل لَّا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ ۚ

"বলুন, আল্লাহ ছাড়া মহাবিশ্ব ও পৃথিবীতে যারা আছে তারা গাইব জানে না।..."

(আন-নাম্‌ল, ২৭:৬৫)

অতএব, পৃথিবীজুড়ে দৈবজ্ঞ, গণক, হস্তরেখা বিশারদ এবং তাদের মতো লোকেরা যতসব কলাকৌশল ব্যবহার করে, তার সবগুলোই মুসলিমদের জন্য নিষিদ্ধ। হাত দেখা, আই-চিং (I-Ching—চীনাদের ভাগ্য গণনার প্রাচীন লিপি), সৌভাগ্যের বিস্কুট, চা পাতা, রাশিচিহ্ন, বায়ো-রিদম্ নামের কম্পিউটার প্রোগ্রাম ইত্যাদি সবকিছুই ভবিষ্যৎ বলে দেওয়ার দাবি করে। কিন্তু মহান আল্লাহ দ্ব্যর্থহীন ভাষায় জানিয়ে দিয়েছেন যে, একমাত্র তিনিই ভবিষ্যৎ সম্পর্কে জানেন,

إِنَّ اللَّهَ عِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ ۖ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا ۖ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿٣٤﴾

"একমাত্র আল্লাহর নিকটই কিয়ামাতের জ্ঞান রয়েছে। আর তিনি বৃষ্টি বর্ষণ করেন এবং জরায়ুতে যা আছে তা তিনি জানেন। আর কেউ জানে না আগামীকাল

www.QuranerAlo.net

তার কী হবে এবং কেউ জানে না কোন স্থানে সে মারা যাবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সম্যক অবহিত।" (লুকমান; ৩১:৩৪)

অতএব, যেসব বই-পুস্তক, পত্র-পত্রিকা এবং যে সকল ব্যক্তি কোনো না কোনোভাবে ভবিষ্যৎ কিংবা অদৃশ্যের জ্ঞান রাখার দাবি করে, তাদেরকে বর্জনের ব্যাপারে মুসলিমদের অবশ্যই সর্বোচ্চ সতর্ক হতে হবে। উদাহরণস্বরূপ, কোনো মুসলিম আবহাওয়াবিদ যখন আগামীকালের বৃষ্টিপাত, তুষারপাত কিংবা জলবায়ু সংক্রান্ত কোনো পূর্বাভাস দেবেন, তার উচিত হবে অবশ্যই তার কথার সাথে "ইনশা'আল্লাহ" (যদি আল্লাহ ইচ্ছা করেন) যুক্ত করা। অনুরূপভাবে, কোনো মুসলিম মহিলা ডাক্তার যখন কোনো গর্ভবতীকে তার সন্তান জন্মদানের সম্ভাব্য দিনক্ষণের কথা বলবেন, তার উচিত হবে ইনশা'আল্লাহ' বলার ব্যাপারে যত্নশীল হওয়া। কারণ এসব ক্ষেত্রে ডাক্তারদের বক্তব্য একটি পরিসংখ্যান বা প্রযুক্তি নির্ভর অনুমান মাত্র।

www.QuranerAlo.net

ষষ্ঠ অধ্যায়

জ্যোতিষশাস্ত্র

অতীতের মুসলিম বিদ্বানরা গ্রহ-নক্ষত্রের গণনাবিদ্যা বা জ্যোতিষশাস্ত্রকে 'তানজীম' বলে অভিহিত করতেন। ইসলামি বিধানের আলোকে বিচার বিশ্লেষণের উদ্দেশ্যে এসবকে তারা তিনটি প্রধান শ্রেণিতে ভাগ করেছেনঃ

১. প্রথম শ্রেণির বিশ্বাস হলো, পৃথিবীর প্রাণীরা গ্রহ-নক্ষত্রের দ্বারা প্রভাবিত হয় এবং গ্রহ-নক্ষত্রের আবর্তন পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে ভবিষ্যতের বিভিন্ন ঘটনা সম্পর্কে পূর্বাভাস পাওয়া সম্ভব।[১]

এই বিশ্বাস 'জ্যোতিষশাস্ত্র' নামে পরিচিতি পেয়েছে। যতদূর জানা যায়, ঈসা ﷺ জন্মের ৩০০০ বছর আগে মেসোপটেমিয়াতে এই বিশ্বাসের উৎপত্তি। পরবর্তীতে গ্রিক সভ্যতার পৃষ্ঠপোষকতায় এ শাস্ত্র পূর্ণ বিকাশ লাভ করে। এই বিশ্বাসের একটি অপেক্ষাকৃত পুরাতন মেসোপটেমীয় ধারা খ্রিষ্টপূর্ব ৬ষ্ঠ শতকে ভারত এবং চীনে পৌঁছে যায়। তবে চীনে নক্ষত্রের মাধ্যমে শুধু ভবিষ্যদ্বাণীই গ্রহণ করা হতো। মেসোপটেমিয়াতে জ্যোতিষশাস্ত্র ছিল একটি রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান। এখানে আকাশের লক্ষণ থেকে রাজা এবং তার রাজ্যের কল্যাণ সম্পর্কে গবেষণা করা হতো। মেসোপটেমীয়রা প্রতিটি গ্রহ-নক্ষত্রকে একেকটি শক্তিশালী দেবতা মনে করত। এটিই ছিল তাদের এসব বিশ্বাসের মূল। খ্রিষ্টপূর্ব ৪র্থ শতকে গ্রিসে এসব নক্ষত্র-দেবতা পরিচিতি পেলে, তারা গ্রিক জ্যোতিষবিদ্যার উৎসে পরিণত হয়। ভবিষ্যৎ গণনার বিজ্ঞান হিসেবে জ্যোতিষশাস্ত্র তৎকালীন গ্রিসের রাজ দরবারের বাইরেও যারা সামর্থ্যবান, তাদের কাছে সহজলভ্য হয়ে যায়।[২]

---

(১) তাইসীর আল-আযীয আল-হামীদ, পৃ. ৪৪১।

(২) William D. Halsey (ed.), Collier's Encyclopedia, (USA : Crowell-Collier Education Corporation, 1970, vol. 3, পৃ. ১০৩).

www.QuranerAlo.net

দুই হাজার বছরের অধিক সময় ধরে ইউরোপের পৌত্তলিকদের এবং পরবর্তীতে খ্রিস্টানদের ধর্ম, দর্শন এবং বিজ্ঞানের উপর জ্যোতিষশাস্ত্র প্রবল প্রভাব খাটিয়েছে। ত্রয়োদশ শতকের ইউরোপীয় দার্শনিক দান্তে (Dante) এবং সেইন্ট টমাস অ্যাকুইনাস (St. Thomas Aquinas), দুজনেই তাদের নিজ নিজ দর্শনে জ্যোতিষশাস্ত্রীয় কার্যকরণকে গ্রহণ করে নিয়েছিলেন। নাবি ইব্‌রাহীম ﷺ এর জাতি সাবিয়ানরাও এই বিশ্বাস পোষণ করত। তারা চন্দ্র, সূর্য এবং বিভিন্ন নক্ষত্রকে দেবতা হিসেবে গ্রহণ করে সেগুলোকে সিজদা করত। বিশেষ ধরনের উপাসনালয়ও তারা নির্মাণ করেছিল যেগুলোতে বিভিন্ন গ্রহ-নক্ষত্রের প্রতিমূর্তি এবং প্রতিচ্ছবি স্থাপন করা হয়েছিল। তাদের বিশ্বাস ছিল, আকাশের গ্রহ-নক্ষত্রের আত্মা এইসব ছবিমূর্তির মধ্যে আবির্ভূত হয়ে তাদের সাথে যোগাযোগ করে এবং মানুষের বিভিন্ন প্রয়োজন পূরণ করে।[৩] এই শ্রেণির জ্যোতিষশাস্ত্র একটি সুস্পষ্ট কুফ্‌র । কারণ এর মাধ্যমে তাওহীদ আল-আসমা' ওয়াস-সিফাত (আল্লাহর নাম এবং গুণাবলির একত্ব) বিনষ্ট হয়ে যায়। এ ধরনের বিশ্বাসের মাধ্যমে স্রষ্টার অনন্য কিছু বৈশিষ্ট্য গ্রহ-নক্ষত্র এবং তারকামণ্ডলীর উপর আরোপ করা হয়। এর মধ্যে ভাগ্য (কদ্‌র) নিয়ন্ত্রণ সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য। যারা জ্যোতিষশাস্ত্র চর্চা করে, তারাও কুফ্‌রিতে লিপ্ত। কারণ তারা ভবিষ্যতের জ্ঞান রাখার দাবি করে; অথচ তা কেবল আল্লাহই জানেন। তারা আল্লাহর ঐশ্বরিক জ্ঞানের কিছুটা নিজেরাও রাখার দাবি করে। যারা তাদেরকে বিশ্বাস করে, তাদেরকে তারা আল্লাহর নির্ধারিত ভাগ্যের ভালো-মন্দ পরিবর্তনের মিথ্যা আশ্বাস দেয়। ইব্‌ন 'আব্বাস ﷺ থেকে বর্ণিত একটি হাদীসের উপর ভিত্তি করেও জ্যোতিষশাস্ত্র হারাম (নিষিদ্ধ) বলে বিবেচিত। হাদীসটিতে নাবি ﷺ বলেছেন,

> "জ্যোতিষশাস্ত্রের কোনো শাখায় যে জ্ঞান অর্জন করল, সে যেন জাদুবিদ্যারই একটি শাখায় জ্ঞান অর্জন করল। তার এই জ্ঞান সে যতই বাড়াবে, তার পাপও সে ততই বাড়াবে।"[৪]

---

(৩) তাইসীর আল-আযীয আল-হামীদ, পৃ. ৪৪১।

(৪) সুনান আবি দাউদ, (ইংরেজি অনুবাদ), খণ্ড ৩, পৃ. ১০৯৫, হাদীস নং ৩৯৮৬ এবং ইব্‌ন মাজাহ।

www.QuranerAlo.net

২. দ্বিতীয় আরেক শ্রেণির দাবি হলো, আল্লাহর ইচ্ছাতেই গ্রহ-নক্ষত্রের আবর্তন ঘটে; তবে এটাও সত্য যে তাদের আবর্তন পৃথিবীর বিভিন্ন ঘটনা সংঘটনের ব্যাপারে ইঙ্গিত প্রদান করে।[৫] এটি ছিল মুসলিম জ্যোতিষীদের বিশ্বাস, যারা বিজ্ঞানভিত্তিক ব্যাবেলনীয় জ্যোতিষশাস্ত্র শিখেছিল এবং চর্চা করত। উমাইয়া শাসনামলের শেষের এবং 'আব্বাসীয় শাসনামলের শুরুর দিকের খলিফাদের মাধ্যমে রাজসভায় জ্যোতিষশাস্ত্রের অভিষেক ঘটে। দৈনন্দিন কাজকর্মে পরামর্শ দেওয়ার পাশাপাশি আসন্ন বিপদ সম্পর্কে সতর্ক করার জন্য প্রত্যেক খলিফা নিজের কাছে একজন রাজজ্যোতিষী রাখতেন। তবে প্রকৃত জ্যোতিষশাস্ত্র যে কুফ্‌র, তা তখনকার সাধারণ মুসলিমরাও জানত। তাই এর চর্চাকারীরা একটি ঐকমত্যে পৌঁছল, যেন ইসলামি দৃষ্টিকোণ থেকে এটিকে দেখে বৈধ মনে হয়। এ উদ্দেশ্যে জ্যোতিষীদের ভবিষ্যদ্বাণীকে আল্লাহর ইচ্ছারই প্রতিফলন বলে প্রচার করা হলো।

যেভাবেই ঘুরিয়ে ব্যাখ্যা করা হোক না কেন, জ্যোতিষশাস্ত্রের এই রূপটিও সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ এবং যারা এসব চর্চা করবে, তারা কাফির হয়ে যাবে। কারণ এই বিশ্বাস এবং পৌত্তলিকদের বিশ্বাসের মধ্যে মৌলিক কোনো পার্থক্য নেই। এ ক্ষেত্রেও গ্রহ-নক্ষত্রের উপর আল্লাহর ক্ষমতা আরোপ করা হয় এবং যারা এসব ব্যাখ্যা করতে পারে বলে দাবি করে, তারাও ভবিষ্যৎ সম্পর্কে জ্ঞান রাখার দাবি করে। অথচ ভবিষ্যতের জ্ঞান কেবল আল্লাহই রাখেন। তবে পরবর্তীকালের কিছু বিশেষজ্ঞ এ ব্যাপারে শারঈ বিধান প্রয়োগের ক্ষেত্রে শৈথিল্য দেখিয়েছেন এবং জ্যোতিষশাস্ত্রের এই রূপটিকে অনুমতি দিয়েছেন। কারণ তাদের মতে, জ্যোতিষশাস্ত্রের এই রূপটি মুসলিম সমাজে ব্যাপকভাবে গৃহীত একটি বিশ্বাসে পরিণত হয়ে গেছে।

৩. তৃতীয় এবং সর্বশেষ প্রকারটি হলো, আকাশে তারকার অবস্থান দেখে নাবিক কিংবা মরুভূমির যাত্রীদের দিক নির্ণয় করা অথবা কৃষকের শস্য রোপণের মৌসুম নির্ধারণ করা ইত্যাদি।[৬] এ ধরনের বাস্তবিক ব্যবহারই জ্যোতিষশাস্ত্রের একমাত্র দিক যা কুর'আন এবং সুন্নাহ অনুযায়ী মুসলিমদের জন্য হালাল।

---

(৫) তাইসীর আল-আযীয আল-হামীদ, পৃ. ৪৪২।
(৬) তাইসীর আল-আযীয আল-হামীদ, পৃ. ৪৪৭-৮।

www.QuranerAlo.net

এই ব্যতিক্রমের ভিত্তি হলো কুর'আনের নিম্নোক্ত আয়াতটিঃ

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ

"আর তিনিই তোমাদের জন্য তারকারাজি সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমারা স্থল ও সমুদ্রের অন্ধকারে পথ খুঁজে পাও..." (আল-আনআম, ৬:৯৭)

কৃতাদাহ্(৭) থেকে ইমাম বুখারি ﷺ নিম্নোক্ত বর্ণনাটি সংকলন করেছেনঃ "মহান আল্লাহ তারকারাজি সৃষ্টি করেছেন আসমানের সৌন্দর্য বর্ধন, শয়তানদের উদ্দেশ্যে নিক্ষেপ করা এবং তা দেখে যেন পথনির্দেশনা পাওয়া যায় সে উদ্দেশ্যে। অতএব, তারকারাজি থেকে এর বাইরে কেউ অন্যকিছু খুঁজলে, সে অতিরঞ্জিত অনুমান করল। সে তার ভাগ্যকে বরবাদ করল, পার্থিব কল্যাণ হারাল এবং নিজে থেকে এমন কিছু বলল, যে সম্পর্কে তার কোনো জ্ঞান নেই।"

তারকারাজির ব্যবহারের ক্ষেত্রে কৃতাদাহ্ যে সীমারেখা নির্ধারণ করেছেন, তার ভিত্তি হলো সূরা আল-আনআমের ৯৭ নম্বর আয়াত, যা ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। নিম্নোক্ত আয়াতের ভিত্তিতেও এই সীমারেখা নির্ধারিত হয়েছেঃ

وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِّلشَّيَاطِينِ

"আমি নিকটবর্তী আসমানকে প্রদীপমালা দিয়ে সুশোভিত করেছি এবং সেগুলোকে শয়তানদের প্রতি নিক্ষেপের বস্তু বানিয়েছি।..." (আল-মুল্ক, ৬৭:৫)

নাবি ﷺ বলেছেন, জিনেরা অনেক সময় পৃথিবীর নিকটবর্তী আকাশের প্রান্তসীমা পর্যন্ত পৌঁছে যায় এবং পৃথিবীতে ঘটিতব্য বিষয় সম্পর্কে ফেরেশতাদের অভ্যন্তরীণ আলোচনায় আড়ি পাতে। এরপর তারা পৃথিবীতে

(৭) সরাসরি সহাবিদের ﷺ তত্ত্বাবধানে যারা পড়াশোনা করেছিলেন তাদের মধ্যকার একজন শীর্ষস্থানীয় 'আলিম।

www.QuranerAlo.net

ফিরে এসে ভবিষ্যদ্বক্তাদের সেগুলো জানিয়ে দেয়। নাবি ﷺ আরও বলেন, শয়তানদের বিতাড়িত করতে তারকা (উল্কাপিণ্ড) নিক্ষেপ করা হয়। একারণে কদাচিৎ দু'একটি ছাড়া অধিকাংশই আড়িপাততে পারে না। এজন্যই নাবি ﷺ বলেছেন, গণকদের ভবিষ্যদ্বাণী হলো দু'একটা সত্য আর হাজারটা মিথ্যার সংমিশ্রণ।[৮] অতএব, নক্ষত্রসমূহের যেসব ব্যবহার আল্লাহ সুস্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছেন এবং যেসব ব্যবহার তাঁর নির্দেশের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ, সেগুলো ছাড়া মুসলিমরা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে নক্ষত্রের ব্যবহার করতে পারবে না।

মুসলিম জ্যোতিষীদের যুক্তি

জ্যোতিষশাস্ত্র চর্চার সাথে জড়িত মুসলিমরা কুর'আনের কিছু আয়াত ব্যবহার করে তাদের এ কাজকে তারা হালাল করার চেষ্টা চালিয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, ইদানীং সূরা আল-বুরূজ' নামটিকে ইংরেজিতে 'The Zodiacal Signs'[৯] এবং এই সূরার প্রথম আয়াত والسماء ذات البروج এর অনুবাদ করা হয়েছে By the Zodiacal Signs বা 'রাশি চিহ্নসমূহের শপথ' হিসেবে। নিঃসন্দেহে এগুলো 'বুরূজ' শব্দের বিভ্রান্তিকর অনুবাদ। শব্দটির অনুবাদ হবে মূলত 'কক্ষপথবিশিষ্ট নক্ষত্রের বিন্যাসসমূহ' এবং কখনোই 'রাশি চিহ্নসমূহ' নয়। বিভিন্ন নক্ষত্রের আপেক্ষিক অবস্থান চিহ্নিত করার জন্য প্রাচীন ব্যাবিলন এবং গ্রিসের অধিবাসীরা বিভিন্ন প্রাণীর প্রতিমূর্তি ব্যবহার করত। এইসব প্রতিমূর্তিই হলো রাশিচক্রের বিভিন্ন চিহ্ন। অতএব, কোনো অবস্থাতেই এই আয়াতকে পৌত্তলিকদের এসব নক্ষত্রপূজার সমর্থনে ব্যবহার করা যায় না। নক্ষত্রসমূহের এইসব সচিত্র উপস্থাপনার সাথে তাদের আপেক্ষিক অবস্থানের কোনো সম্পর্ক নেই। শুধু তা-ই নয়; বরং সময়ের পরিক্রমায়, মহাশূন্যে নক্ষত্রসমূহের গতিশীলতার কারণে তাদের বর্তমানের আপেক্ষিক অবস্থানেও ব্যাপক পরিবর্তন ঘটতে পারে।

---

(৮) বুখারি, (আরবি-ইংরেজি), খণ্ড ৭, পৃ. ৪৩৯, হাদীস নং ৬৫৭ এবং মুসলিম, (ইংরেজি অনুবাদ), খণ্ড ৪, পৃ. ১২০৯, হাদীস নং ৫৫৩৫।

(৯) A. Yusuf Ali, The Holy Qur'an, (Trans., Beirut: Dar al-Qur'an al-Karim), পৃ. ১৭১৪.

www.QuranerAlo.net

অতীতে খলিফাদের দরবারে জ্যোতিষশাস্ত্রের সমর্থনে সূরা আন-নাহ্‌লের নিম্নোক্ত আয়াতটি ব্যবহার করা হতোঃ

وَعَلَٰمَٰتٍ ۚ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ ﴿١٦﴾

"আর চিহ্নসমূহ ও তারকারাজির মাধ্যমে তারা সঠিক পথপ্রাপ্ত হয়।"

(আন-নাহ্‌ল, ১৬:১৬)

মুসলিম জ্যোতিষীদের দাবি অনুযায়ী, এ আয়াতে "চিহ্নসমূহ" বলতে নক্ষত্রসমূহকে বুঝানো হয়েছে যেগুলো অদৃশ্য জগৎ সম্পর্কে ইঙ্গিত দেয় এবং এই জ্ঞানের মাধ্যমে মানুষ তার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে দিকনির্দেশনা পেতে পারে।[১০] তবে স্বয়ং নাবি ﷺ যাকে কুর'আনের মুখপাত্র বলেছেন, সেই ইব্‌ন 'আব্বাসের মতে, উল্লিখিত আয়াতে "চিহ্নসমূহ" বলতে দিনের বেলার পথ বা স্থান নির্দেশক চিহ্নসমূহকে বুঝানো হয়েছে। এসবের মাধ্যমে কোনোভাবেই নক্ষত্রসমূহকে বুঝানো হয়নি। তিনি আরও বলেন, "তারকারাজির মাধ্যমে তারা সঠিক পথপ্রাপ্ত হয়"—এর অর্থ হলো, এদের মাধ্যমে তারা রাতের বেলা স্থলে এবং সাগরে ভ্রমণের সময় পথের দিশা পায়।[১১] মোট কথা, এই আয়াতের অর্থ এবং সূরা আল আনআমের ৯৮ নম্বর আয়াতের অর্থ একই।

পরিস্থিতি যা-ই হোক, জ্যোতিষশাস্ত্রীয় কল্পনা-বিজ্ঞানের অধ্যয়ন এবং প্রয়োগকে হালাল বানাতে কুর'আনের কোনো আয়াত ব্যবহার করা সম্পূর্ণরূপে অবৈধ। এমনটি করা কুর'আনের সেসব আয়াতের সাথে সাংঘর্ষিক যেগুলোতে কেবল আল্লাহই ভবিষ্যৎ সম্পর্কে জানেন বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এমনটি করা অনেক হাদীসের সাথেও সাংঘর্ষিক যেগুলো সুস্পষ্টভাবে জ্যোতিষশাস্ত্র ও এ সংশ্লিষ্ট কল্পনা-বিজ্ঞানের অধ্যয়ন এবং এগুলোতে বিশ্বাস করার বিরোধিতা করে। উদাহরণস্বরূপ, ইব্‌ন 'আব্বাস ﷺ বর্ণনা করেন যে, নাবি ﷺ বলেছেন,

(১০) তাইসীর আল-আযীয আল-হামীদ, পৃ. ৪৪৪।

(১১) ইব্‌ন জারীর আত-তাবারি কর্তৃক তার তাফসীরের মধ্যে সংকলিত, জামি আল-বাইয়ান তা'ওয়ীল আল-কুর'আন, (Egypt: al-Halabi Publishing, 3rd Edition, 1968, vol. 14, পৃ. ৯১).

www.QuranerAlo.net

"জ্যোতিষবিজ্ঞানের কোনো শাখা সম্পর্কে যে শিখল, সে জাদুর একটি শাখা সম্পর্কে শিখল।"(১২)

আবু মাহজাম থেকেও বর্ণিত হয়েছে যে, নাবি ﷺ বলেছেন,

"আমার পরে আমার উম্মাতের জন্য আমি যে ব্যাপারে সবচেয়ে বেশি শঙ্কিত তা হলো, তাদের নেতাদের অন্যায় আচরণ, নক্ষত্রে বিশ্বাস করা এবং আল্লাহর নির্ধারিত ভাগ্যকে অস্বীকার করা।"(১৩)

অতএব, ইসলামে জ্যোতিষশাস্ত্রে বিশ্বাস করা এবং তা চর্চা করার বাস্তবিক কোনো ভিত্তিই নেই। যারা কুর'আন এবং হাদীসের কথাকে নিজেদের বিকৃত বাসনার সাথে মিলানোর চেষ্টা করে, তারা তা-ই করে যা ইহুদিরা করেছিল। ইহুদিরা পূর্বাপর প্রসঙ্গ উপেক্ষা করে তাওরাতের বিভিন্ন আয়াত বেছে নিয়ে ইচ্ছাকৃতভাবে সেগুলোর অর্থ বিকৃত করত।(১৪)

রাশিচক্রের ব্যাপারে ইসলামের বিধান

ইতিমধ্যে আলোচনা করা হয়েছে যে, জ্যোতিষশাস্ত্র শুধু চর্চা করাই হারাম নয়; বরং জ্যোতিষীর কাছে যাওয়া, তাদের ভবিষ্যদ্বাণী শোনা, জ্যোতিষশাস্ত্র বিষয়ক বই-পুস্তক কেনা কিংবা নিজের রাশিচক্র নিয়ে পড়াশোনা করাও নিষিদ্ধ! যেহেতু জ্যোতিষশাস্ত্র মূলত ভবিষ্যদ্বাণী করার জন্যই ব্যবহৃত হয়, তাই যারা এসব চর্চা করে তাদেরকে বলা হয় ভবিষ্যদ্বক্তা। এজন্যই যে নিজের রাশিচক্র অনুসন্ধান করে তার ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত হাদীসের বিধান প্রযোজ্যঃ

---

(১২) সুনান আবি দাউদ, (ইংরেজি অনুবাদ), খণ্ড ৩, পৃ. ১০৯৫, হাদীস নং ৩৮৯৬ এবং ইব্ন মাজাহ্।

(১৩) ইব্ন আসাকির কর্তৃক সংকলিত এবং আস-সুয়ূতি এটিকে সহীহ্ বলে সত্যায়ন করেছেন (তাইসীর আল-আযীয আল-হামীদ, পৃ. ৪৪৫ –এ উদ্ধৃত)।

(১৪) সূরা আন-নিসা', ৪:৪৭ এবং সূরা আল-মা'ইদাহ, ৫:১৩ ও ৪১ দ্রষ্টব্য।

www.QuranerAlo.net

"যে ব্যক্তি কোনো গণকের কাছে যাবে এবং তার কাছে কোনো বিষয়ে জানতে চাইবে, তার ৪০ দিন এবং ৪০ রাতের সলাত কবুল হবে না।"(১৫)

গণকের কথা বিশ্বাস না করলেও, শুধু তার কাছে যাওয়া এবং কিছু জানতে চাওয়ার জন্যই এই শাস্তি। কেউ যদি গণকের ভবিষ্যদ্বাণীর সত্য-মিথ্যার ব্যাপারে সন্দেহের মধ্যে থাকে, তাহলে সে আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ অদৃশ্যের জ্ঞান রাখে কি না, সেই ব্যাপারেই সন্দেহের মধ্যে আছে। এমন সন্দেহ করাও শির্ক। কারণ আল্লাহ স্পষ্টভাবে বলে দিয়েছেন,

وَعِندَهُۥ مَفَاتِحُ ٱلْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَآ إِلَّا هُوَ

"আর তাঁর কাছেই রয়েছে অদৃশ্যের চাবিসমূহ, তিনি ছাড়া এ বিষয়ে কেউ জানে না...।" (আল-আনআম, ৬:৫৯)

قُل لَّا يَعْلَمُ مَن فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ٱلْغَيْبَ إِلَّا ٱللَّهُ

"বলুন, আল্লাহ ছাড়া আসমানসমূহের ও পৃথিবীতে যারা আছে তারা গাইব (অদৃশ্য) জানে না।..." (আন-নাম্‌ল, ২৭:৬৫)

জ্যোতিষী থেকে শুনে হোক কিংবা কোনো পত্র-পত্রিকা বা বই-পুস্তকে পড়ে হোক—কেউ যদি তার রাশিচক্রের ভবিষ্যদ্বাণীতে বিশ্বাস করে, তাহলে সে সরাসরি কুফ্‌রিতে লিপ্ত হয়। কেননা নাবি ﷺ বলেছেন,

"যে ভবিষ্যদ্বক্তা বা গণকের কাছে গেল এবং সে যা বলে তা বিশ্বাস করল, সে মুহাম্মাদের উপর যা অবতীর্ণ হয়েছে তা অবিশ্বাস করল।"(১৬)

পূর্বের হাদীসটির মতো, এখানেও আক্ষরিক অর্থে যদিও গণককে বুঝানো হয়েছে, তবে জ্যোতিষীদের ক্ষেত্রেও এটি সমানভাবে প্রযোজ্য। কেননা এদের উভয়েরই মূল বিষয় হলো ভবিষ্যতের জ্ঞান রাখার দাবি করা। গণকের মতো

(১৫) হাফ্‌সা ﷺ থেকে বর্ণিত এবং মুসলিম কর্তৃক সংকলিত, (ইংরেজি অনুবাদ), খণ্ড ৪, পৃ. ২১১, হাদীস্ নং ৫৫৪০।

(১৬) আবু হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত এবং আহ্‌মাদ ও আবু দাউদ কর্তৃক সংকলিত, সুনান আবি দাউদ, (ইংরেজি অনুবাদ), খণ্ড ৩, পৃ. ১০৯৫, হাদীস্ নং ৩৮৯৫।

www.QuranerAlo.net

জ্যোতিষীর দাবিও তাওহীদের পরিপন্থী। জ্যোতিষীর দাবি অনুযায়ী, মানুষের ব্যক্তিত্বের বৈশিষ্ট্যসমূহ নক্ষত্রদের দ্বারা নির্ধারিত হয় এবং মানুষের জীবনের ভবিষ্যৎ ঘটনাবলিও নক্ষত্রের মাঝে লেখা আছে। গণকদের দাবি অনুযায়ী, কাপের তলায় জমা হওয়া চা পাতার তলানি কিংবা হাতের রেখার বিন্যাস থেকেও একই তথ্য পাওয়া যায়। উভয় ক্ষেত্রেই, এসব সৃষ্টবস্তুর ধরন প্রকৃতি থেকে তারা অদৃশ্য জগৎ সম্পর্কে তথ্য জানতে সক্ষম বলে দাবি করছে।

জ্যোতিষশাস্ত্রে বিশ্বাস এবং রাশি পরীক্ষা করা সুস্পষ্টভাবে ইসলামি চেতনা ও আদর্শের পরিপন্থী। ঈমানের প্রকৃত স্বাদ পায়নি এমন অন্তঃসারশূন্য আত্মার লোকেরাই কেবল এইসব পথ খুঁজে ফেরে। মূলত এসব পথ ও পন্থা হলো আল্লাহর নির্ধারিত নিয়তি থেকে পালিয়ে বাঁচার এক ব্যর্থ প্রচেষ্টা। মূর্খরা মনে করে, আগামীকাল কী ঘটবে তা জানা গেলে তারা আজ থেকেই তার প্রস্তুতি নেবে। আর এভাবে তারা দুর্ভাগ্য এড়িয়ে সৌভাগ্য নিশ্চিত করবে। অথচ আল্লাহ ﷻ নিজেই তাঁর রসূল ﷺ কে বলতে বলেছেন,

.....وَلَوْ كُنتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ
إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿١٨٨﴾

"বলুন, আমি আমার নিজের কোনো উপকার ও ক্ষতি করার ক্ষমতা রাখি না, তবে আল্লাহ যা চান। আর আমি যদি গাইব জানতাম, তাহলে অধিক কল্যাণ নিজের ভাগে তুলে নিতাম এবং কোনো ক্ষতি আমাকে স্পর্শ করত না। আমি তো একজন সতর্ককারী ও সুসংবাদদাতা এমন কওমের জন্য, যারা বিশ্বাস করে।"

(আল-আরাফ, ৭:১৮৮)

যারা সত্যিকার মুসলিম তারা এইসব থেকে দূরে থাকতে নৈতিকভাবে দায়বদ্ধ। অতএব, তারা এমন কোনো আংটি বা গলার হার পরবে না যেগুলোতে রাশিচিহ্ন সংযুক্ত থাকে। এমনকি এমনিতেও তারা কখনো সেগুলো পরবে না। এগুলো এমন এক মিথ্যা মতবাদের অংশ যা কুফ্‌রির প্রাদুর্ভাব ঘটায়। কাজেই এগুলো সম্পূর্ণরূপে বর্জনীয়। বিশ্বাসী মুসলিমদের একজন অন্যজনের কাছে তার রাশি সম্পর্কে জানতে চাইবে না কিংবা তা নির্ণয়েরও চেষ্টা করবে না। তারা কেউই সংবাদপত্রে রাশিচক্রের পাতা পড়বে না, কেউ

www.QuranerAlo.net

পড়লেও তারা তা শুনবে না। অধিকন্তু, কোনো মুসলিম যদি জ্যোতিষীর ভবিষ্যদ্বাণীর আলোকে নিজের কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করে থাকে, তাহলে তাকে আল্লাহর কাছে তাওবাহ করতে হবে এবং নতুন করে ইসলাম গ্রহণ করতে হবে।

www.QuranerAlo.net

সপ্তম অধ্যায়

জাদুবিদ্যা

জাদুর সংজ্ঞা হিসেবে বলা যায়, জাদু হলো কোনো বিশেষ ক্রিয়াকর্মের মাধ্যমে অতীন্দ্রিয় বা অতিপ্রাকৃত বিভিন্ন শক্তির নামোচ্চারণ করে প্রাকৃতিক শক্তিসমূহকে বাহ্যত বশ করা বা তাদের সম্পর্কে পূর্বজ্ঞান লাভ করার বিদ্যা। কোনো বিশেষ প্রক্রিয়ায়, মন্ত্রবাক্য এবং ক্রিয়াকর্মের মাধ্যমে মানুষ প্রকৃতিকে বশে আনতে সক্ষম—মনে করাটাও জাদুর অন্তর্ভুক্ত।[১] পশ্চিমা সমাজে প্রাকৃতিক ঘটনাবলি সংক্রান্ত অধ্যয়ন ও গবেষণাকে 'সাদা' (White) বা 'প্রাকৃতিক জাদু' (Natural Magic) বলা হয়ে থাকে। বর্তমানে তা 'আধুনিক ভৌতবিজ্ঞান' (Modern Natural Science) হিসেবে বিকাশ লাভ করেছে। সাদা বা প্রাকৃতিক জাদু থেকে 'কালো জাদু' (Black Magic) বা 'ডাকিনীবিদ্যা' আলাদা। কারণ এ জাদুর মাধ্যমে স্বার্থসিদ্ধি বা অসৎ উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য অতীন্দ্রিয় বা অতিপ্রাকৃতিক শক্তিকে আহ্বান করা হয়। জাদুবিদ্যা এবং এসব চর্চাকারীদের ক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত কয়েকটি পরিভাষা হলো 'ডাকিনীবিদ্যা' (Witchcraft), 'অদৃষ্টপরীক্ষা' (Divination) এবং 'প্রেতসিদ্ধি' (Necromacy)। সংজ্ঞা অনুযায়ী, প্রেত বা অপদেবতা ভর করেছে এমন কোনো নারী যে জাদুবিদ্যার চর্চা করে তা-ই হলো ডাকিনীবিদ্যা। ভবিষ্যৎ সম্পর্কে অলৌকিক জ্ঞান লাভের প্রচেষ্টাকে অদৃষ্টপরীক্ষা বলে উল্লেখ করা হয়। আর প্রেতসিদ্ধি বা মৃতব্যক্তির আত্মার সাথে যোগাযোগ করা হলো অদৃষ্টপরীক্ষার বিভিন্ন কৌশলগুলোর একটি।

তবে আরবি 'সিহ্‌র' (জাদু) পরিভাষাটির মাধ্যমে এর সকল প্রকার জাদুকেই বুঝানো হয়। এর বিভিন্ন প্রকার ও শাখার মধ্যে কোনো পার্থক্য করা হয়নি। কাজেই এর মধ্যে মায়াবিদ্যা, ডাকিনীবিদ্যা, অদৃষ্টপরীক্ষা, প্রেতসিদ্ধি

---

(১) Reader's Digest Great Encyclopedic Dictionary, (New York: Fund & Wagnalls Publishing Co., 10th ed., 1975, পৃ. ৮১৩).

www.QuranerAlo.net

ইত্যাদি সবকিছুই অন্তর্ভুক্ত। কেননা, আরবিতে "সিহ্‌র" শব্দটি দিয়ে এমন সবকিছুই বুঝায় যা কোনো গোপন বা অদৃশ্য শক্তির মাধ্যমে ঘটানো হয়।[২] উদাহরণস্বরূপ, নাবি ﷺ বলেছেন,

"নিশ্চয়ই কিছু কিছু কথা আছে যা জাদু।"[৩]

একজন বাগ্মী ভুলকে ঠিক, আর ঠিককে ভুল হিসেবে উপস্থাপন করেও মানুষকে তার দ্বারা মুগ্ধ করতে সক্ষম। এ কারণেই নাবি ﷺ এই ধরনের বক্তব্যকে জাদুময়ী বলে উল্লেখ করেছেন। সওম পালনের উদ্দেশ্যে সুবহ্ সাদিকের পূর্বে যে খাবার খাওয়া হয়, তাকে বলা হয় 'সাহুর'[৪]। এ শব্দটিও 'সিহ্‌র' ধাতুমূল থেকে উদ্ভূত। এই খাবার রাতের শেষ প্রহরে অন্ধকার থাকতেই খাওয়া হয় বলেই একে সাহুর বলা হয়।[৫]

জাদুর বাস্তবতা

জাদুর বাস্তবতাকে অস্বীকার করাটা এখন এক কথায় হালের ফ্যাশন হয়ে দাঁড়িয়েছে। জাদুর প্রভাবে সংঘটিত ব্যাপারগুলোকে হিস্টেরিয়ার মতো মনোবৈকল্য বা মনোরোগ আখ্যা দেওয়া হচ্ছে। আরও বলা হচ্ছে, যারা জাদুতে বিশ্বাস করে, কেবল তাদের উপরই জাদু প্রভাব বিস্তার করে;[৬] জাদুর মাধ্যমে যেসব ক্রিয়া-কসরত দেখানো হয়, তার সবকিছুই ভেলকিবাজি এবং চোখের ভ্রম ও চাতুরী।

ইসলাম জাদুটোনা বা তাবিজ-কবজের মাধ্যমে দুর্ভাগ্য এড়ানো বা সৌভাগ্য আনয়নের ক্ষমতাকে প্রত্যাখ্যান করলেও, জাদুবিদ্যার অস্তিত্ব

(২) Arabic-English Lexicon, vol. ১, পৃ. ১৩১৬-৭.

(৩) বুখারি, (আরবি-ইংরেজি), খণ্ড ৭, পৃ. ৪৪৫, হাদীস্ নং ৬৬২, মুসলিম, আবু দাউদ, সুনান আবি দাউদ, (ইংরেজি অনুবাদ), খণ্ড ৩, পৃ. ১৩৯৩, হাদীস্ নং ৪৯৮৯ এবং তিরমিযি।

(৪) অথবা সুহূর। দেখুন, Arabaic-English Lexicon, vol. ১, পৃ. ১৩১৭.

(৫) তাইসীর আল-আযীয আল-হামীদ, পৃ. ৩৮২।

(৬) একজন আশআরী ঘরানার বিশেষজ্ঞ, ফাখরুদ-দীন আর-রাযি (মৃত্যু ১২১০ সাল) সূরা আল-বাকারাহর ১০২ নং আয়াতের ব্যাখ্যায় তিনি এই ধারণার প্রস্তাব করেন এবং প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ, ইব্‌ন খালদূন এই ধারণার পরবর্তী বিকাশ সাধন করেন।

www.QuranerAlo.net

এবং এর কতিপয় দিককে ইসলাম বাস্তবিক বলেই স্বীকার করে। হ্যাঁ, এটা সত্য যে, বর্তমানে চারপাশে যেসব জাদু দেখা যায় তার বেশিরভাগই হলো ভেলকিবাজি, যেগুলোতে সূক্ষ্ম কলাকৌশল ব্যবহার করে মানুষকে ফাঁকি দেওয়া হয়। তবে এমন লোকও আছে যারা জিন শয়তানদের সাথে যোগাযোগ স্থাপনের মাধ্যমে ভাগ্য গণনার মতো প্রকৃত জাদুবিদ্যা চর্চা করে থাকে। জিনদের ক্ষমতা ও সীমাবদ্ধতার ব্যাপারে আলোচনার পূর্বে, কুর'আন ও সুন্নাহর সেই সব দলিলের প্রতি দৃষ্টি দেওয়া যাক, যেগুলোর মাধ্যমে প্রমাণ হয় যে, ইসলাম জাদুর বাস্তবতাকে স্বীকার করে। বিষয়টি আলোচনার ক্ষেত্রে এভাবে অগ্রসর হওয়াটা অত্যাবশ্যক। কারণ ইসলামে সত্য ও মিথ্যার চূড়ান্ত মানদণ্ড এ কুর'আন ও সুন্নাহ্‌র মাঝেই নিহিত।

কুর'আনে আল্লাহ নিম্নোক্ত আয়াতগুলোর মাধ্যমে জাদুবিদ্যার প্রতি ইসলামের মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গির ব্যাখ্যা দিয়েছেনঃ

وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ
أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٠١﴾

"আর যখন তাদের নিকট আল্লাহর পক্ষ থেকে একজন রসূল (মুহাম্মাদ) এলো, তাদের কাছে যা আছে (অর্থাৎ, তাওরাতে মুহাম্মাদ সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী) তা সমর্থন করে, তখন আহলুল-কিতাবের একটি দল আল্লাহর কিতাবকে তাদের পেছনে ফেলে দিল, (এভাবে যে,) মনে হয় যেন তারা জানে না।"

(আল-বাক্বারাহ, ২:১০১)

ইহুদিদের মাঝে প্রেরিত নাবিদের প্রতি তাদের দ্বিমুখী আচরণের কথা উল্লেখ করার পর, নাবি সুলাইমান ﷺ সম্পর্কে তারা যে মিথ্যা উদ্ভাবন করেছিল, সেই মিথ্যা সম্পর্কেও আল্লাহ পুঙ্খানুপুঙ্খ ব্যাখ্যা দিয়েছেনঃ

وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ ۖ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ
وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى

www.QuranerAlo.net

الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ ۚ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّىٰ
يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ ۖ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ
الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ ۚ وَمَا هُم بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ۚ وَيَتَعَلَّمُونَ
مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ ۚ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ
خَلَاقٍ ۚ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ ۚ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿١٠٢﴾

"তারা অনুসরণ করেছে, যা শয়তানরা সুলাইমানের রাজত্বে পাঠ করত। আর সুলাইমান কুফ্‌রি করেনি; বরং শয়তানরা কুফ্‌রি করেছে। তারা মানুষকে জাদু শেখাত এবং (তারা অনুসরণ করেছে) যা নাযিল করা হয়েছিল বাবেলের দুই ফেরেশতা, হারূত ও মারূতের উপর। আর তারা কাউকে শেখাত না যে পর্যন্ত না বলত যে, আমরা তো পরীক্ষা, সুতরাং তোমরা কুফ্‌রি করো না। এর পরও তারা এদের কাছ থেকে শিখত, যার মাধ্যমে তারা পুরুষ ও তার স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটাত। যদিও তারা তার মাধ্যমে কারও কোনো ক্ষতি করতে পারত না আল্লাহর অনুমতি ছাড়া। আর তারা কেবল তা-ই শিখত যা তাদের ক্ষতি করত, তাদের উপকার করত না এবং তারা অবশ্যই জানত যে, যে ব্যক্তি তা ক্রয় করবে, আখিরাতে তার কোনো অংশ থাকবে না। আর তা নিশ্চিতরূপে কতই না মন্দ, যার বিনিময়ে তারা নিজেদের বিক্রয় করেছে। যদি তারা জানত।"

(আল-বাক্বারাহ, ২:১০২)

ইহুদিরা কাবালা' নামক এক অতীন্দ্রিয় তন্ত্রের আওতায় জাদুবিদ্যার চর্চাকে বৈধ বলে যুক্তি দেখাত। তাদের দাবি অনুযায়ী, তারা এই তন্ত্র স্বয়ং নাবি সুলাইমানের কাছ থেকে শিখেছিল। অথচ আল্লাহ স্পষ্টভাবে বলে দিয়েছেন যে, আল্লাহর কিতাবসমূহ ছুঁড়ে ফেলে এবং শেষ নাবিকে অস্বীকার করে ইহুদিরা শয়তানদের শেখানো মন্ত্রতন্ত্রের অনুসরণ করাকে বেছে নিয়েছে। এসব শিক্ষা দেওয়ার মাধ্যমে শয়তানরা ইতিমধ্যেই কুফ্‌রিতে লিপ্ত ছিল। তারপর, জ্যোতিষশাস্ত্রের নামে তারা মায়াবিদ্যার কলাকৌশলও শিক্ষা দিয়েছে।

www.QuranerAlo.net

প্রাচীনকালে বাবেলের জনগণের কাছে পরীক্ষাস্বরূপ পাঠানো 'হারূত' এবং 'মারূত' নামের দুজন ফেরেশতা লোকজনদের এসব বিদ্যা শিক্ষা দিয়েছিল। এগুলো শিক্ষা দেওয়ার পূর্বেই তারা মায়াবিদ্যা শিখে কুফ্‌রিতে লিপ্ত হওয়ার ব্যাপারে লোকজনকে সতর্ক করত। কিন্তু লোকজন তাদের কথায় কান দেয়নি। তারা এর মাধ্যমে মানুষের মাঝে শত্রুতা সৃষ্টি এবং বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটানোর বিষয়গুলো এতটাই দক্ষতার সাথে রপ্ত করেছিল যে, তারা ভাবত, চাইলেই তারা যেকোনো সময় যে কারও ক্ষতি করতে পারে। তবে কার উপর জাদুর প্রভাব পড়বে বা পড়বে না, তা কেবল আল্লাহই নির্ধারণ করেন। জাদুবিদ্যার এই জ্ঞান যারা অর্জন করেছিল, তা দিয়ে তারা নিজেদের কোনো কল্যাণ সাধন করতে পারেনি। এসব শিখে তারা নিজেদের ক্ষতিই করেছে। কারণ সত্যিকার জাদুবিদ্যা চর্চা করলে কুফ্‌রিতে লিপ্ত হওয়া অনিবার্য। আর তাই নিজেদেরকে জাহান্নামের উপযুক্ত করার মাধ্যমে তারা নিজেদেরকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে।

যেসব ইহুদিরা এসব কলাকৌশল রপ্ত করেছিল তারা ভালো করেই জানত যে, তারা অভিশপ্ত। কারণ তাদের ধর্মগ্রন্থ অনুযায়ীই এসব চর্চা করা নিষিদ্ধ ছিল। বর্তমানে তাদের কাছে যে তাওরাত রয়েছে, তাতেও নিম্নোক্ত পংক্তিগুলো খুঁজে পাওয়া যায়ঃ

> "তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু তোমাকে যে দেশ দিতেছেন, সেই দেশে উপস্থিত হইলে তুমি তথাকার জাতিগণের ঘৃণার্হ ক্রিয়ার ন্যায় ক্রিয়া করিতে শিখিও না। তোমার মধ্যে যেন এমন কোনো লোক পাওয়া না যায়, যে পুত্র বা কন্যাকে অগ্নির মধ্য দিয়া গমন করায়, যে মন্ত্র ব্যবহার করে বা গণক, বা মোহক, বা মায়াবী, বা ঐন্দ্রজালিক, বা ভূতড়িয়া, বা গুণী বা প্রেতসাধক। কেননা সদাপ্রভু এই সকল ক্রিয়াকারীকে ঘৃণা করেন; আর সেই ঘৃণার্হ ক্রিয়া প্রযুক্ত তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু তোমার সম্মুখ হইতে তাহাদিগকে অধিকারচ্যুত করিবেন।"(৭)

কিন্তু তারা তাদের ধর্মগ্রন্থকে এমনভাবে উপেক্ষা করেছে যেন তারা তা শোনেইনি। তাওরাতে আরও উল্লেখ আছে যে, যে কেউ জাদুবিদ্যার চর্চায় অংশ নেবে, সে স্বর্গের সকল প্রতিদান থেকে বঞ্চিত হয়ে অনন্তকাল

(৭) Deuteronomy 18:9-12.

www.QuranerAlo.net

আগুনে পুড়বে। অথচ ইহুদিরা তাওরাত থেকে এসব কথা সরিয়ে ফেলেছে এবং জাদুবিদ্যার কলাকৌশল চর্চা করেছে।

ইহুদিদের অবস্থার ভয়াবহতার কথা তুলে ধরার জন্যই আল্লাহ ﷻ তাদের প্রতি পরিতাপ ব্যক্ত করে উল্লিখিত আয়াতটির সমাপ্তি টেনেছেন। ইহুদিরা যদি শুধু জানত পরকালের শাস্তি কত ভয়াবহ, তাহলে ক্ষণস্থায়ী এই জীবনে সস্তা কিছু ভেলকিবাজি রপ্ত করার জন্য নিজেদের চিরকালীন ভবিষ্যতকে বিকিয়ে দিত না। তারা বুঝতে পারত কী সাঙ্ঘাতিক কাজ তারা করেছে।

উল্লিখিত আয়াতের নিম্নোক্ত অংশবিশেষ সুস্পষ্টভাবে ইঙ্গিত করে যে, জাদুবিদ্যা হারাম।

...وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ....

"...যে ব্যক্তি তা ক্রয় করবে, আখিরাতে তার কোনো অংশ থাকবে না।..."

(আল-বাকারাহ, ২:১০২)

জাহান্নামের চিরস্থায়ী আবাসই হতে পারে সর্বোচ্চ হারাম কর্মের একমাত্র শাস্তি। আয়াতটি থেকে এটাও প্রমাণিত হয় যে, জাদুকরের পাশাপাশি যে এটা শেখে বা শেখায়, তারা সবাই কাফির। "যে ব্যক্তি তা ক্রয় করবে" (অর্জন করবে) — এ বাক্যটি ব্যাপক অর্থবোধক। জাদুবিদ্যা শিখিয়ে উপার্জিত অর্থসম্পদ, শেখার জন্য খরচ করা অর্থসম্পদ কিংবা শুধু জাদুবিদ্যা সম্পর্কে জ্ঞান রাখা—সবই এর অন্তর্ভুক্ত। জাদুকে আল্লাহ কুফ্‌র বলেও উল্লেখ করেছেন আয়াতের এই অংশগুলোতে, "আমরা তো পরীক্ষা, সুতরাং তোমরা কুফ্‌রি করো না, এবং সুলাইমান কুফ্‌রি করেনি; বরং শয়তানরা মানুষকে জাদু শিখিয়ে কুফ্‌রি করেছে।" (আল-বাকারাহ, ২:১০২)

উল্লিখিত আয়াতগুলো থেকে সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয় যে, জাদুর কিছু বাস্তবতা সত্যিই রয়েছে। সহীহ বুখারিসহ অন্যান্য হাদীসগ্রন্থে একটি হাদীস রয়েছে, যাতে স্পষ্টতই উল্লেখ করা হয়েছে যে, নাবি ﷺ নিজেই জাদু দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেনঃ

www.QuranerAlo.net

"যাইদ ইব্‌ন আরকাম ﷺ বর্ণনা করেন যে, লাবীব ইব্‌ন আসাম নামের এক ইহুদি নাবি ﷺ কে জাদু করে এবং তিনি যখন এর প্রভাবে অসুস্থ হতে শুরু করেন তখন জিবরীল তাঁর নিকট মুআওয়া-যাতান (আল-ফালাক এবং আন-নাস) নিয়ে আসেন এবং তাঁকে বলেন, এক ইহুদি আপনার উপর জাদু করেছে এবং সেই জাদুর মন্ত্র রয়েছে অমুক কূপে। নাবি ﷺ আলি ইব্‌ন আবি তুলিবকে ওই মন্ত্র নিয়ে আসার জন্য পাঠালেন। তিনি যখন ওটা নিয়ে ফিরে আসলেন, নাবি ﷺ তাকে সূরাগুলোর প্রতিটি আয়াত পাঠের সাথে সাথে মন্ত্রের উপরের গিঁটগুলো একটা একটা করে খুলতে বললেন। এরপর নাবি এমনভাবে উঠে দাঁড়ালেন যেন তিনি বেঁধে রাখা অবস্থা থেকে মুক্ত হলেন।"(৮)

পৃথিবীর প্রতিটি জাতির মধ্যেই এমন কিছু লোক রয়েছে যারা কোনো না কোনোভাবে জাদুবিদ্যা চর্চা করে থাকে। এসবের কিছু কিছু মিথ্যা হলেও হতে পারে। তবে এমনটি হওয়া একেবারেই অসম্ভব যে, গোটা দুনিয়ার সব মানুষ একজোট হয়ে জাদুবিদ্যা এবং অতিপ্রাকৃত ঘটনাবলি সম্পর্কে মনগড়া কাহিনী বানিয়েছে। অতিপ্রাকৃত ঘটনাবলির যেসব প্রমাণিত দৃষ্টান্ত রয়েছে, সেগুলো সম্পর্কে যে কেউ মনোযোগ দিয়ে ভাবলে তিনি অবশ্যই এই সিদ্ধান্তে আসবেন যে, প্রতিটি ঘটনার মধ্যে বাস্তবিকভাবেই একটা সাধারণ যোগসূত্র বিদ্যমান। যারা জিনের জগতের সাথে পরিচিত নয়, তাদের কাছে ভূতুড়ে বাড়ি, প্রেতাত্মা হাজির করার বৈঠক (seance), এসব বৈঠকে ব্যবহৃত অক্ষর ও অন্যান্য চিহ্নবিশিষ্ট কাষ্ঠফলক (Ouija board), ভুডু (Voodoo) নামে ডাকিনীবিদ্যার একপ্রকার লোকায়ত রূপ, জিনের আসর (Demonic Possession), বিভিন্ন ভাষায় কথা বলা, শূন্যে দেহ ভাসিয়ে রাখা (Levitation) ইত্যাদি সবকিছুই বিস্ময়কর ধাঁধা বলে মনে হয়।

উল্লিখিত ঘটনাগুলো পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্নরূপে পরিলক্ষিত হয়। এমনকি মুসলিম বিশ্বেও। বিশেষ করে সুফিতন্ত্রের চরমপন্থী পিরেরা এই ব্যাধিতে মারাত্মকভাবে আক্রান্ত। তাদের অনেককেই দেহ শূন্যে ভাসানো, মুহূর্তে দীর্ঘ পথ অতিক্রম, অজ্ঞাত উৎস থেকে খাবার ও টাকা-পয়সা হাজির করা ইত্যাদির মতো কাজ করতে দেখা যায়। জাদুবিদ্যার এসব ক্রিয়াকর্মকে

(৮) বর্ণনাটি আবদ ইব্‌ন হুমায়েদ এবং আল-বায়হাকি সংকলন করেছেন। এর অধিকাংশই বুখারিতে পাওয়া যায়, বুখারি (আরবি-ইংরেজি), খণ্ড ৭, পৃ. ৪৪৩-৪, হাদীস্ নং ৬৬০ এবং মুসলিম, (ইংরেজি অনুবাদ), খণ্ড ৩, পৃ. ১১৯২-৩, হাদীস্ নং ৫৪২৮।

www.QuranerAlo.net

তাদের অন্ধ অনুসারীরা ঐশী নিদর্শন বলে বিশ্বাস করে। এ কারণে, নিজেদের জীবন ও ধনসম্পদ এসব পিরের সেবায় উৎসর্গ করে। অথচ এইসব বিস্ময়কর ঘটনার পেছনে থাকে অদৃশ্য ও অশুভ জিনজগতের হাত।

যেসব জিন সাপ এবং কুকুরের রূপ ধারণ করে থাকে তারা ব্যতীত জিনদের অন্যান্যরা সবাই মূলত অদৃশ্য।[৯] তবে তাদের কেউ কেউ মানুষের আকৃতিসহ যেকোনো রূপ ধারণ করতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, আবু হুরায়রা ﷺ বলেন,

"আল্লাহর রসূল ﷺ রমাদানের যাকাত পাহারা দেওয়ার জন্য আমাকে দায়িত্ব দিলেন। রাতে কেউ একজন এসে অঞ্জলি ভর্তি করে খাদ্যসামগ্রী নিতে লাগল। তাই আমি তাকে ধরে ফেললাম। আমি বললাম, 'আল্লাহর কসম! আমি তোমাকে আল্লাহর রসূলের কাছে নিয়ে যাব!' লোকটি কাকুতি-মিনতি করে বলল, 'আমি খুবই গরিব, আর আমার গোটা পরিবারটা আমার উপর নির্ভরশীল। আমি বড়ই অভাবগ্রস্ত।' অতএব, আমি তাকে ছেড়ে দিলাম। পরদিন সকালে আল্লাহর রসূল ﷺ বললেন, 'হে আবু হুরায়রা! গতরাতে তোমার বন্দী কী করল?' আমি বললাম, 'সে তার করুণ দারিদ্র্য এবং পরিবারের কথা বলল, তাই আমি তাকে ছেড়ে দিয়েছি।' নাবিজি বললেন, 'নিশ্চয়ই সে তোমাকে মিথ্যা বলেছে এবং সে আবার আসবে।' অতএব পরের রাতে আমি তার অপেক্ষায় থাকলাম। যখন সে আবার এসে অঞ্জলি ভর্তি করে খাদ্যসামগ্রী নিতে শুরু করল, আমি তাকে শক্ত করে ধরলাম এবং বললাম, 'এবার আমি অবশ্যই তোমাকে আল্লাহর রসূলের কাছে নিয়ে যাব।' সে আবার কাকুতি-মিনতি করে বলল, 'আমাকে ছেড়ে দাও! আমি সত্যিই খুব গরিব এবং আমার পরিবার আছে।' তাই আমি তার উপর দয়া করলাম এবং তাকে ছেড়ে দিলাম। পরদিন সকালে আল্লাহর রসূল ﷺ বললেন, 'হে আবু হুরায়রা! গতরাতে তোমার বন্দী কী করল?' আমি বললাম, 'সে তার কঠিন দারিদ্র্য এবং পরিবারের কথা বলল, তাই আমি তাকে ছেড়ে দিয়েছি।' নাবিজি বললেন, 'নিশ্চয়ই সে তোমাকে মিথ্যা বলেছে এবং সে আবার আসবে।' তাই আমি তার অপেক্ষায় থাকলাম এবং সে এসে যখন খাদ্যসামগ্রী চারপাশে ছড়াতে শুরু করল, আমি তাকে শক্ত করে ধরলাম। আমি বললাম, 'আল্লাহর কসম! আমি আজ তোমাকে আল্লাহর রসূলের কাছে

(৯) এই বিষয়ে প্রমাণের জন্য ভবিষ্যদ্বক্তাদের সম্পর্কিত পঞ্চম অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

www.QuranerAlo.net

নিয়ে যাবই। এইবার তৃতীয় বার। তুমি কসম করেছিলে, তুমি আর আসবে না। অথচ আবার তুমি এসেছ!' সে বলল, 'এসো, আমি তোমাকে এমন কিছু বাণী শেখাব যার মাধ্যমে আল্লাহ তোমার কল্যাণ করবেন।' আমি বললাম, 'সেগুলো কী?' সে বলল, 'সর্বদা ঘুমাতে যাওয়ার সময় আয়াতুল-কুরসি পাঠ করবে। তাহলে আল্লাহর পক্ষ থেকে একজন প্রহরী সব সময় তোমার সাথে থাকবে এবং সকাল পর্যন্ত শয়তান তোমার কাছে আসবে না।' তারপর আমি তাকে ছেড়ে দিলাম। পরদিন সকালে আল্লাহর রসূল ﷺ বললেন, 'গতরাতে তোমার বন্দী কী করল?' আমি বললাম যে, সে আমাকে এমন কিছু কথা শেখাতে চাইল যার মাধ্যমে আল্লাহ আমার কল্যাণ করবেন বলে সে দাবি করল। তাই আমি তাকে ছেড়ে দিয়েছি। যখন নাবি জানতে চাইলেন কথাগুলো কী, আমি বললাম, ঘুমাতে যাওয়ার পূর্বে আয়াতুল-কুরসি পাঠ করা। আমি তাকে আরও বললাম, সে বলেছে যে, সকালে ঘুম থেকে ওঠা পর্যন্ত আল্লাহর পক্ষ থেকে একজন প্রহরী আমার সাথে থাকবে এবং শয়তান আমার কাছে আসতে পারবে না। নাবিজি বললেন, 'নিশ্চয়ই সে সত্য কথা বলেছে যদিও সে একটা মিথ্যাবাদী। হে আবু হুরায়রা! তুমি কি জানো, গত তিন রাত তুমি কার সাথে কথা বলেছ?' আমি বললাম, 'না।' তিনি তখন বললেন, 'ওটা ছিল এক শয়তান।'"[১০]

জিনেরা মুহূর্তের মধ্যেই দীর্ঘ পথ অতিক্রম করতে এবং মানব শরীরে প্রবেশ করতে সক্ষম। তাদেরকে এসব বিশেষ ক্ষমতা প্রদান করাকে আল্লাহ যথার্থ হিসেবে দেখেছেন, ঠিক যেভাবে অন্যান্য সৃষ্টিদের তিনি এমন সব ক্ষমতা দিয়েছেন যা মানুষের নাগালের বাইরে। তথাপি মানুষকেই তিনি সকল সৃষ্টির উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন।

জিনদের এসব বিষয়গুলো মনে রাখলে সকল অতিপ্রাকৃত এবং জাদু সংশ্লিষ্ট ঘটনাবলি—যেগুলো ভেলকিবাজি নয়—সহজেই ব্যাখ্যা করা যায়। উদাহরণস্বরূপ, ভূতুড়ে বাড়িগুলোর ক্ষেত্রে আলো জ্বলে ও নিভে, দেওয়ালে টাঙানো ছবি খসে পড়ে, জিনিসপত্র বাতাসে ওড়ে, মেঝেতে ক্যাঁচ ক্যাঁচ শব্দ হয় ইত্যাদি। এসব ক্ষেত্রে মূলত জিনেরাই অদৃশ্য অবস্থায় থেকে জড়বস্তুর উপর সক্রিয় হয়। এই ব্যাপারটি প্রেতাত্মা হাজির করার বৈঠকের ক্ষেত্রেও সত্য, যেখানে মৃত ব্যক্তিদের আত্মা জীবিতদের সাথে যোগাযোগ

(১০) বুখারি, (আরবি-ইংরেজি), খণ্ড ৭, পৃ. ৩১৯-২০, হাদীস নং ৪৯৫।

www.QuranerAlo.net

Contents

করছে বলে মনে হয়। যারা মৃত আত্মীয়স্বজনদের কণ্ঠস্বরের সাথে পরিচিত, তারা মৃত ব্যক্তিকে তার অতীত জীবনের বিভিন্ন ঘটনা বলতে শোনেন। এ ধরনের আশ্চর্যজনক কাজ করা হয় সেই জিনকে হাজির করার মাধ্যম্ যাকে মৃত ব্যক্তিটির জীবদ্দশায় তার সাথে নিযুক্ত করা হয়েছিল। এই জিনটিই মৃত ব্যক্তির কণ্ঠস্বর নকল করে এবং তার অতীত জীবনের বিভিন্ন ঘটনার বিবরণ দেয়। অনুরূপভাবে, প্রেতাত্মা হাজির করার বৈঠকে ব্যবহৃত যেসব অক্ষর ও বিভিন্ন চিহ্নবিশিষ্ট কাষ্ঠফলক নানা প্রশ্নের উত্তর দেয় বলে মনে হয়, তার ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। জিনদের অদৃশ্য কারসাজিতে সহজেই বিস্ময়কর ঘটনা ঘটতে পারে যদি অনুকূল পরিবেশের ব্যবস্থা করা হয়। যাদেরকে শূন্যে ভাসতে কিংবা না ছুঁয়েই কোনো কিছুকে উপরে তুলতে দেখা যায়, তাদের মূলত জিনেরাই অদৃশ্য হাত দ্বারা শূন্যে তুলে ধরে। যারা বিশাল দূরত্ব অতিক্রম করতে পারে তাদেরকে মূলত তার জিনটিই বহন করে নিয়ে যায়। একই সময়ে দুটি ভিন্ন স্থানে উপস্থিত থাকার কারিশমাও আসলে জিনের কারসাজি। জিনটিই ওই ব্যক্তির রূপ ধারণ করে দৃশ্যমান হতে পারে। অনুরূপভাবে, যারা শূন্য থেকে খাদ্যসামগ্রী বা টাকা-পয়সা হাজির করতে সক্ষম, তারা অদৃশ্য ও দ্রুতগামী জিনদের সাহায্য গ্রহণ করে।[১১] এমনকি সবচেয়ে বিস্ময়কর ঘটনাগুলোর মধ্যে বাহ্যত পুনর্জন্মের ঘটনাও রয়েছে। যেমন, শান্তি দেবী নামে ভারতের সাত বছর বয়সী এক মেয়ে তার অতীত জীবনের বিভিন্ন ঘটনা নিখুঁত ও নির্ভুলভাবে বর্ণনা করেছে। মেয়েটি তখন যেখানে বাস করত সেখান থেকে অনেক দূরে অন্য একটি প্রদেশের মথুরা নামক শহরে অবস্থিত তার আগের জীবনের বাড়ির বর্ণনা দিয়েছিল। সত্যতা যাচাইয়ের জন্য লোকেরা সেখানে গেলে, মেয়েটির বর্ণনার অনুরূপ একটি বাড়ি এক সময় সেখানে ছিল বলে স্থানীয়রা নিশ্চিত করে। লোকজন তার আগের জীবনের আরও কিছু বিবরণও সত্য বলে নিশ্চিত করে।[১২] এটা সুস্পষ্ট যে, এসব তথ্য জিনেরাই তার অবচেতন মনে প্রবেশ করিয়েছিল। নাবি ﷺ এমন ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন যখন তিনি বলেছেন,

---

(১১) এমন আরও ঘটনার জন্য Ibn Taymeeah's Essay on the Jinn, পৃ. ৪৭-৫৯ — দ্রষ্টব্য।

(১২) Colin Wlson, The Occult, (New York: Random House, 1971, পৃ. ৫১৪-৫১৫)

www.QuranerAlo.net

"নিশ্চয়ই মানুষ তার ঘুমের মধ্যে যেসব স্বপ্ন দেখে, সেগুলো তিন ধরনের, আর-রহমান (আল্লাহ)-এর পক্ষ থেকে স্বপ্ন, শয়তানের পক্ষ থেকে বিষাদের স্বপ্ন এবং অবচেতন মনের স্বপ্ন।"[১৩]

জিনেরা যেভাবে মানুষের শরীরে প্রবেশ করতে পারে, সেইভাবে মনেও প্রবেশ করতে পারে। জিনগ্রস্ত হওয়া বা জিনে ধরার ঘটনা এত বেশি যে, গুণে শেষ করা যাবে না। এই জিনগ্রস্ত হওয়া সাময়িক সময়ের জন্য হতে পারে। যেমন, খ্রিষ্টান এবং পৌত্তলিক সম্প্রদায়ের অনেকেই স্বেচ্ছায় শারীরিক এবং আধ্যাত্মিক বিকারগ্রস্ত হন, চেতনা হারিয়ে ফেলেন এবং বিভিন্ন বিদেশী ভাষায় কথা বলতে শুরু করেন। এই দুর্বল ও নাজুক অবস্থায় জিনেরা সহজেই তার শরীরে ঢুকে পড়তে পারে এবং তাদের মুখ দিয়ে আবোল-তাবোল কথা বলতে পারে। সুফিদের[১৪] সমবেত যিক্‌রের[১৫] আসরেও এমন ঘটনা ঘটার প্রমাণ রয়েছে। আবার জিনগ্রস্ত হওয়াটা দীর্ঘ সময়ের জন্য হতে পারে। এসব ক্ষেত্রে আক্রান্ত ব্যক্তির ব্যক্তিত্বে বড় ধরনের পরিবর্তন ঘটে থাকে। জিনে ধরা ব্যক্তি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অযৌক্তিক আচরণ করে, অতিমানবিক শক্তি প্রদর্শন করে কিংবা ব্যক্তির মুখ দিয়ে নিয়মিত কথা বলতে পারে।

ঝাড়ফুঁক[১৬] মধ্যযুগের ইউরোপে একটি ব্যাপকভাবে প্রচলিত প্রথা হয়ে ওঠে। ঈসা ﷺ কীভাবে জিনগ্রস্তদের ঝাড়ফুঁক করেছেন তার বহু ঘটনা বাইবেলে বর্ণিত হয়েছে। এসব ঘটনাই খ্রিষ্টীয় রীতিতে ঝাড়ফুঁকের ভিত্তি। এক বর্ণনা অনুযায়ী, যিশুখ্রিষ্ট ও তাঁর সঙ্গীরা জেরাসিনেস-এ (Gerasenes) আসলেন এবং এক জিনগ্রস্তের দেখা পেলেন। ঈসা ﷺ প্রেতগুলোকে চলে যেতে আদেশ করলে তারা তাকে ছেড়ে চলে গেল এবং অদূরেই পাহাড়ের গায়ে চরতে থাকা একটি শূকরপালের মধ্যে প্রবেশ করল। শূকরপালটি দৌড়ে

---

(১৩) আবু হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত এবং সংকলন করেছেন আবু দাউদ, সুনান আবি দাউদ, (ইংরেজি অনুবাদ), খণ্ড ৩, পৃ. ১৩৯৫, হাদীস নং ৫০০১, সিলসিলাহ আল-আহাদীস আস-সহীহাহ, খণ্ড ৪, পৃ. ৪৮৭, হাদীস নং ১৮৭০।

(১৪) যে সুফিবাদ মুসলিমদের মধ্যে বিকাশ লাভ করেছিল।

(১৫) প্রায়শ শরীর দুলিয়ে, সুরে সুরে এমনকি নাচতে নাচতেও অনবরত আল্লাহর যিকির করা হয়।

(১৬) দুষ্ট আত্মা কিংবা পিশাচ দ্বারা আক্রান্ত ব্যক্তি বা স্থান থেকে এসব অপশক্তিকে বিতাড়িত করা।

www.QuranerAlo.net

হ্রদের খাড়া পাড় বেয়ে হ্রদে গিয়ে পড়ল এবং ডুবে মরল।[১৭] এই ঘটনাটি সত্তর ও আশির দশকের বেশ কয়েকটি চলচ্চিত্রের শিরোনাম হয়েছে (যেমন: 'The Exorcist', 'The Rosemary's Baby' ইত্যাদি)।

কোনো কিছু অতিপ্রাকৃতিক হলেই সেটাকে প্রত্যাখ্যান করা বস্তুবাদী পশ্চিমা দুনিয়ার একটা সাধারণ মনোভাব। এ কারণেই আধুনিক পশ্চিমাদের অধিকাংশের কাছে ঝাড়ফুঁকের কোনো যৌক্তিক ভিত্তি নেই। তারা একে কুসংস্কার হিসেবে দেখে থাকে। অন্ধকার ও মধ্যযুগের ইউরোপে খুঁজে খুঁজে ডাইনিদেরকে ব্যাপক হারে পুড়িয়ে মারার ঘটনা থেকে তাদের এমন মনোভাবের জন্ম হয়েছে। যা-ই হোক, সত্যিকার জিনের আসর এবং এ থেকে উদ্ভূত অন্যান্য অসুস্থতার জন্য ঝাড়ফুঁক একটি বৈধ চিকিৎসা পদ্ধতি হিসেবে ইসলামে স্বীকৃত। শর্ত হলো, এই ঝাড়ফুঁক হতে হবে কুর'আন এবং সুন্নাহ অনুযায়ী।

কোনো ব্যক্তিকে জিন আসর করলে তা তাড়ানোর জন্য মূলত তিন ধরনের পদ্ধতি আছেঃ

১. অন্য একটি জিন হাজির করার মাধ্যমে আক্রমণকারী জিনটিকে তাড়ানো যায়। এই পদ্ধতি ইসলামে নিষিদ্ধ। কারণ জিন হাজির করার প্রক্রিয়ার মধ্যে অনেক ঈমান বিধ্বংসী কাজ জড়িত। জিন হাজির করার মাধ্যমে ইসলামের মৌলিক বিশ্বাসসমূহ ধ্বংস হয়ে যাওয়াটা একেবারেই নিশ্চিত। একজন জাদুকর বা ডাইনি ঠিক এই কাজটিই করে যখন তারা অন্য একজন জাদুকর বা ডাইনির মন্ত্রের প্রভাব নষ্ট করতে চায়।

২. শির্কে লিপ্ত হয়ে নিজেকে পুরোপুরি মুশরিক প্রমাণ করার মাধ্যমে আক্রমণকারী জিনকে তাড়ানো যেতে পারে। জিনটি জিনতাড়ুয়া কবিরাজের কুফ্‌রিতে সন্তুষ্ট হয়ে ছেড়ে যেতে পারে। এভাবে ছেড়ে গিয়ে ওই জিন কবিরাজের কাছে প্রমাণ করে যে, তার বিশ্বাস ও জিন তাড়ানোর পদ্ধতিটি সঠিক। এই পদ্ধতিতেই খ্রিস্টান যাজকেরা যিশুখ্রিস্টকে আহ্বান করে এবং ক্রস ব্যবহার করে জিন তাড়িয়ে থাকে। পৌত্তলিক পুরোহিতরাও একই পদ্ধতিতে তাদের মিথ্যা দেবদেবীদের মাধ্যমে এসব করে।

---

(১৭) Matthew 8:28-34, Mark 5:1-20 এবং Luke 8:26-39 দ্রষ্টব্য।

www.QuranerAlo.net

৩. কুর'আন তিলাওয়াত এবং আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনার মাধ্যমেও জিন তাড়ানো যায়। কুর'আনের আয়াত এবং নির্ধারিত দুআসমূহ জিনগ্রস্ত ব্যক্তির পারিপার্শ্বিক আবহ একেবারে বদলে দেয়। এই পদ্ধতিতে জিনকে শুধু মুখে আদেশ দিয়ে এবং সম্ভাব্য ক্ষেত্রে ফুঁ দিয়ে বিতাড়িত করা যায়। তবে জিন তাড়ানোর কাজটি যিনি করবেন তার ঈমান যদি সুদৃঢ় না হয় এবং সৎকর্মশীলতার ভিত্তিতে আল্লাহর সাথে সুসম্পর্ক না থাকে তাহলে এই পদ্ধতিতে কোনো কাজ না হওয়ার সম্ভাবনাই প্রবল।

যদিও পাশ্চাত্যের বস্তুবাদী ধর্মনিরপেক্ষ আদর্শে প্রভাবিত হয়ে বর্তমানের কিছু মুসলিম জিনের আসর করার ব্যাপারটিকে প্রত্যাখ্যান করেন। এমনকি অনেকে জিনদের অস্তিত্বকেই অস্বীকার করে বসেন। অথচ কুর'আন ও সুন্নাহর বক্তব্য হলো সম্পূর্ণ ভিন্ন। একাধিক বিশুদ্ধ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, নাবি ﷺ জিনগ্রস্ত লোকদের ঝাড়ফুঁক করেছেন। তাঁর অনুমতিক্রমে সাহাবিরাও এমনটি করেছেন মর্মে হাদীস বর্ণিত হয়েছে। নিম্নোক্ত তিনটি হাদীসে তিন ধরনের পদ্ধতি বর্ণনা করা হয়েছেঃ

ইয়ালা ইব্ন মার্‌রাহ বলেন,

"আমি একবার নাবি ﷺ এর সাথে সফরে বের হলাম এবং আমরা এক মহিলাকে তার বাচ্চাসহ রাস্তায় বসে থাকতে দেখলাম। সে বলল, 'হে আল্লাহর রসূল! এই ছেলেটি পীড়াগ্রস্ত এবং আমাদেরকে অনেক বিপদের মুখে ফেলেছে। আমি বলতে পারব না, দিনে কতবার সে জাদুগ্রস্ত হয়!' নাবি বললেন, 'ওকে আমার কাছে দাও।' মহিলা তখন বাচ্চাটিকে তাঁর কাছে তুলে দিল এবং তিনি বাচ্চাটিকে তাঁর সামনে ঘোড়ার পিঠের মধ্যখানে রাখলেন। তারপর তিনি ছেলেটির মুখ ফাঁক করলেন, তিনবার মুখের মধ্যে ফুঁ[১৮] দিলেন এবং বললেন, 'বিসমিল্লাহ! আমি আল্লাহর একজন দাস, সুতরাং দূর হয়ে যাও, হে আল্লাহর শত্রু!' এরপর তিনি ছেলেটিকে তার মায়ের কাছে ফিরিয়ে দিলেন এবং বললেন, আমাদের ফিরতি পথে আমাদের সাথে দেখ কোরো এবং কী হয় তা আমাদের জানিও।' তারপর আমরা চলে গেলাম। ফিরে আসার সময়ও তাকে আমরা ওই স্থানেই পেলাম।

(১৮) এখানে ব্যবহৃত আরবি শব্দটি হলো 'নাফাসা', অর্থাৎ দুই ঠোঁটের মধ্যখানে জিহ্বার ডগা রেখে ফুঁ দেওয়া। এজন্য এটি হলো ফুঁ দেওয়া (নাফাখা) এবং হালকা থুথু নিক্ষেপের (তাফালা) সমন্বিত রূপ।

www.QuranerAlo.net

তার সাথে ছিল তিনটি ভেড়া। নাবি ﷺ জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমার ছেলের কী অবস্থা?' সে বলল, 'তাঁর কসম! যিনি আপনাকে সত্যসহ পাঠিয়েছেন, তারপর থেকে আমরা তার কোনো সমস্যাই দেখিনি, তাই আমি আপনার জন্য এই ভেড়াগুলো এনেছি।' নাবি ﷺ আমাকে বললেন, 'ঘোড়া থেকে নামো এবং একটা নাও। আর বাকিগুলো তাকে ফেরত দিয়ে দাও।'" [১৯]

উম্মু আবান বিনতু আল-ওয়াযি বর্ণনা করেন যে,

"তার দাদা যারি যখন তাদের গোত্রের একটি প্রতিনিধি দলের সাথে আল্লাহর রসূলের সঙ্গে দেখা করতে গেলেন, তিনি সাথে করে তার এক পাগল ছেলেকে নিয়ে গেলেন। আল্লাহর রসূলের কাছে পৌঁছে তিনি বললেন, 'আমার সাথে আমার এক পাগল ছেলে আছে। আমি তাকে আপনার কাছে নিয়ে এসেছি। আপনি তার জন্য একটু দুআ করেন।' নাবি ﷺ লোকটিকে তার ছেলেকে নিয়ে আসতে বললেন। লোকটি ছেলেটির সফরের কাপড় খুলে রেখে তাকে ভালো কিছু কাপড় পরালেন এবং নাবির কাছে নিয়ে গেলেন। তিনি বললেন, 'তাকে আমার কাছে দাও এবং তার পিঠ আমার দিকে ফিরিয়ে দাও।' এরপর নাবি ﷺ ছেলেটির কাপড় শক্ত করে ধরলেন এবং তার পিঠে সজোরে আঘাত করতে শুরু করলেন। আঘাত করার সময় তিনি বলছিলেন, 'দূর হয়ে যা, হে আল্লাহর শত্রু! হে আল্লাহর শত্রু! দূর হয়ে যা!' এরপর ছেলেটি এমনভাবে চারদিকে তাকাতে শুরু করল যেন সে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। নাবি ﷺ ছেলেটিকে তাঁর সামনে বসালেন এবং কিছু পানি নিয়ে আসার জন্য নির্দেশ দিলেন। এরপর তিনি ছেলেটির মুখ মুছে দিলেন এবং তার জন্য দুআ করলেন। তিনি দুআ করার পর ওই প্রতিনিধি দলের মধ্যে ছেলেটির চেয়ে অধিক সুস্থ আর কেউ ছিল না।" [২০]

খারিজাহ্ ইব্ন আস-সাল্ত বর্ণনা করেন যে, তার চাচা বলেছেন,

"একবার আমরা আল্লাহর রসূলের বৈঠক থেকে আসার সময় এক বেদুঈন গোত্রের দেখা পেলাম। তাদের কেউ কেউ বলল, 'আমাদেরকে বলা হয়েছে যে, ওই লোকটির (নাবি মুহাম্মাদ) কাছ থেকে তোমরা ভালো কিছু নিয়ে এসেছ।

(১৯) ইমাম আহ্মাদ কর্তৃক সংকলিত।
(২০) ইমাম আহ্মাদ এবং আবু দাউদ আত-তায়ালাসি বর্ণনাটি মাতার ইব্ন আব্দ আর-রাহমান (উসুল আল-গাবাহ্, খণ্ড ২, পৃ. ১৪৫) থেকে সংগ্রহ করেছেন। ইব্ন হাজার, উম্মু আবান'কে গ্রহণযোগ্য হাদীস্ বর্ণনাকারী হিসেবে মূল্যায়ন করেছেন।

www.QuranerAlo.net

তোমাদের কাছে কি জিনগ্রস্ত ব্যক্তির জন্য কোনো ঔষধ বা মন্ত্র আছে?' আমরা উত্তরে বললাম, 'হ্যাঁ আছে।' তাই তারা জাদুগ্রস্ত এক পাগল ব্যক্তিকে নিয়ে এলো। আমি প্রতিদিন সকাল এবং সন্ধ্যায় তিন দিন পর্যন্ত ওই ব্যক্তির উপর সূরা আল-ফাতিহাহ পড়ে দম করলাম। প্রতিবার আমার তিলাওয়াত সম্পন্ন করে আমি মুখে লালা জমিয়ে থুথু দিতাম। অবশেষে সে এমনভাবে সুস্থ হয়ে উঠল যেন সে শৃঙ্খল ভেঙে মুক্ত হলো। এরপর বেদুঈনরা উপহার হিসেবে আমার জন্য কিছু হাদিয়া নিয়ে এলে আমি বললাম, 'আল্লাহর রসূলকে জিজ্ঞেস না করা পর্যন্ত আমি এটি গ্রহণ করতে পারছি না।' আমি যখন নাবিকে জিজ্ঞেস করলাম, তিনি বললেন, 'ওটা নাও, কারণ, আমার জীবনের কসম, কেউ মিথ্যা মন্ত্র দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করলে তাকে তার পাপের বোঝা বহন করতে হবে। তবে তুমি সত্য কথার মাধ্যমে ওই পারিশ্রমিক অর্জন করেছ।'" (২১)

জাদুবিদ্যার ব্যাপারে ইসলামের বিধান

জাদুবিদ্যা চর্চা করা এবং শেখা উভয়ই যেহেতু ইসলামে কুফর হিসেবে গণ্য, তাই কেউ যদি জাদুবিদ্যা চর্চা করছে বলে প্রমাণিত হয়, তার জন্য শারীআহ আইনে কঠিন দণ্ডের বিধান রয়েছে। কেউ যদি জাদুবিদ্যা চর্চা করা অবস্থায় ধরা পড়ে এবং তাওবা করে তা ছেড়ে না দেয়, তাহলে তার শাস্তি মৃত্যুদণ্ড। জুনদুব ইব্ন কাব ﷺ থেকে বর্ণিত নিম্নোক্ত হাদীসের দ্বারা এই বিধান প্রতিষ্ঠিত। নাবি ﷺ বলেন,

"জাদুকরের জন্য নির্দেশিত শাস্তি হলো, তাকে তরবারি দিয়ে হত্যা করতে হবে।"(২২)

---

(২১) সুনান আবি দাউদ, (ইংরেজি অনুবাদ), খণ্ড ৩, পৃ. ১০৯২, হাদীস নং ৩৮৮৭।

(২২) তিরমিযি কর্তৃক সংকলিত। হাদীসটি বর্ণনা সূত্রের দিক থেকে দ'ঈফ (দুর্বল) হলেও, এর পক্ষে সমর্থনযোগ্য প্রমাণ থাকায় এটিকে হাসানের স্তরে উন্নীত করা হয়েছে। চারজন শীর্ষস্থানীয় ফাকীহগণের তিনজনই (ইমাম আবু হানীফা, মালিক এবং আহমাদ) এই বক্তব্য অনুযায়ী রায় দিয়েছেন। তবে তাদের চতুর্থজন, আশ শাফেঈ-র রায় হলো, জাদুকরের ক্রিয়া প্রদর্শনী কুফরির পর্যায়ে পৌঁছালেই কেবল তাকে হত্যা করা উচিত। (তাইসীর আল-আযীয আল-হামীদ, পৃ. ৩৯০-১ দ্রষ্টব্য)।

www.QuranerAlo.net

খুলাফা রাশিদীন অত্যন্ত কঠোরভাবে এই আইনের প্রয়োগ করেছিলেন। বাজালাহ্ ইব্ন আব্দাহ বর্ণনা করেন যে, খলিফা উমার ইবনুল-খাত্তাব ﷺ রোম এবং পারস্যের বিরুদ্ধে অভিযানরত মুসলিম সৈন্যবাহিনীর কাছে একটি চিঠি পাঠান। চিঠিতে জরাথুস্টবাদীদের জানিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দিয়ে বলা হয়, যারা নিজেদের মা, মেয়ে এবং বোনদের বিবাহ করেছিল এমন সকল বিবাহ ভেঙে দিতে হবে। মুসলিম সৈন্যদেরকে জরাথুস্টবাদীদের খাবার গ্রহণেরও নির্দেশ দেওয়া হয়, যাতে করে তাদেরকে আহলুল-কিতাবদের[২৩] শ্রেণিভুক্ত করা যায়। পরিশেষে, তারা যত গণক ও জাদুকর খুঁজে পাবে তাদের প্রত্যেককে হত্যা করার নির্দেশ দেওয়া হয়। বাজালাহ্ বলেন যে, এই নির্দেশের উপর ভিত্তি করে তিনি নিজেই তিনজন জাদুকরকে হত্যা করেন।[২৪]

মুহাম্মাদ ইব্ন আব্দুর-রহমান বর্ণনা করেন যে, নাবি ﷺ এর স্ত্রী হাফ্সা ﷺ তাঁর কাজের মেয়েকে হত্যা করিয়েছিলেন। কারণ সে তাঁর উপর জাদু প্রয়োগ করেছিল।[২৫]

আজকের তাওরাতেও এই শাস্তির বিধান লিপিবদ্ধ আছে যা ইহুদি এবং খ্রিষ্টানদের চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দেয় যে, জাদুবিদ্যা নিষিদ্ধ।

> "পুরুষ কিংবা স্ত্রীর মধ্যে যে কেউ ভূতড়িয়া কিংবা গুণী হয়, তার প্রাণদণ্ড হবে, লোকে তাদেরকে প্রস্তরাঘাতে বধ করবে; তাদের রক্ত তাদের প্রতি বর্তিবে।"[২৬]

খুলাফা রাশিদীনদের পরে এই আইনগুলোর প্রয়োগ আস্তে আস্তে শিথিল হয়ে পড়ে। উমাইয়া বাদশারা জাদুকর ও গণকদেরকে তাদের এইসব নিষিদ্ধ কাজের অনুমতি দিয়েই ক্ষান্ত হয়নি, বরং রাজদরবারে এসবের প্রচলনও ঘটিয়েছিল। রাষ্ট্র যখন এসব আইনের প্রয়োগ বন্ধ করে দিল, কিছু সহাবা নিজে থেকেই এই আইন প্রয়োগের দায়িত্ব নিজ হাতে তুলে নিয়েছিলেন।

---

(২৩) যারা ইহুদি এবং খ্রিষ্টানদের মতো কোনো আসমানি কিতাবের অনুসরণ করে। হাদীসের এই অংশটুকু বুখারি, আবু দাউদ এবং আল-বায়হাকি সংকলন করেছেন।

(২৪) আহমাদ, আবু দাউদ এবং আল-বায়হাকি কর্তৃক সংকলিত।

(২৫) মালিক কর্তৃক সংকলিত, মুওয়াত্তা ইমাম মালিক, (ইংরেজি অনুবাদ), পৃ. ৩৪৪-৫, হাদীস নং ১৫১১।

(২৬) Leviticus 20:27.

www.QuranerAlo.net

আবু উসমান আন-নাহদি বর্ণনা করেন যে, খলিফা আল-ওয়ালিদ ইবন আব্দিল-মালিকের (শাসনামলঃ ৭০৫-৭১৫) রাজসভায় এক লোক ছিল, যে জাদুর মাধ্যমে বিভিন্ন চমকপ্রদ ক্রিয়া-কসরত প্রদর্শন করত। একবার এই জাদুকর এক লোকের মাথা কেটে শরীর থেকে সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন করে দেয়। জাদুকরের এমন বিস্ময়কর কাজে দর্শক যখন হতবাক, ঠিক তখনই সে মাথাটিকে যথাস্থানে পুনঃস্থাপন করে দর্শকদের আরও তাক লাগিয়ে দেয়। মাথা কাটা লোকটিকে দেখে মনে হচ্ছিল যেন কখনোই তার মাথা কাটা হয়নি। শ্বাসরুদ্ধ দর্শক হাঁফ ছেড়ে বলে উঠল, "সুবহানাল্লাহ্ (সকল মহিমা আল্লাহর)। লোকটি মৃতকে জীবিত করতে সক্ষম!" আল-ওয়ালিদের রাজসভার শোরগোল শুনে সহাবি জুন্দুব আল-আযদি সেদিকে এগিয়ে গেলেন এবং জাদুকরের প্রদর্শনী দেখলেন। পরের দিন তিনি চামড়ার খাপে তরবারি ভরে পিঠে বেঁধে দরবারে এলেন। জাদুকর তার প্রদর্শনী শুরু করার জন্য মঞ্চে উঠলে, জুন্দুব ﷺ উন্মুক্ত তরবারি হাতে ভিড়ের মধ্য দিয়ে ছুটে যান এবং জাদুকরের মস্তক ছিন্ন করে দেন। তারপর হতভম্ব দর্শকদের দিকে ফিরে বলেন, "সে যদি সত্যিই মৃতকে জীবন দিতে পারে, তাহলে সে এবার নিজেই নিজেকে জীবিত করুক।" যদিও এরপর আল-ওয়ালিদ তাকে গ্রেফতার করিয়ে কারাগারে নিক্ষেপ করেন।[২৭]

এই আইনের এত কঠোরতার মূল কারণ সমাজের দুর্বল ঈমানের মানুষেরা, যারা শুধুমাত্র আল্লাহর জন্য প্রযোজ্য শাশ্বত গুণাবলিকে জাদুকরদের উপর আরোপ করে তাওহীদ আল-আসমা' ওয়াস-সিফাত সংশ্লিষ্ট শির্কে লিপ্ত হতে পারে। বলা বাহুল্য, যারা স্বপ্রণোদিত হয়ে ডাকিনীবিদ্যা চর্চা করে, তারা স্বাভাবিকভাবেই ঈমানবিধ্বংসী কর্মে লিপ্ত হয়। পাশাপাশি জাদুকররা ভক্ত জোগাড় এবং ভিত্তিহীন সুনাম কামানোর জন্য প্রায়ই নিজেদেরকে অলৌকিক ক্ষমতা এবং ঐশ্বরিক গুণাবলির অধিকারী বলে জাহির করে থাকে।

(২৭) বুখারির লিখা ইতিহাস বিষয়ক বইয়ে সংকলিত।

www.QuranerAlo.net

অষ্টম অধ্যায়

ঊর্ধ্বে থাকা

আল্লাহ ﷻ তাঁর প্রেরিত কিতাবসমূহে এবং নাবিগণের মাধ্যমে নিজের সম্পর্কে কিছু বর্ণনা দিয়েছেন, যাতে মানুষ তাঁর সম্পর্কে একটা উত্তম ধারণা লাভ করতে পারে। মানুষের পক্ষে তার সীমাবদ্ধ জ্ঞান দিয়ে অসীম কোনোকিছুকে সম্পূর্ণরূপে বুঝতে পারা অসম্ভব। মেহেরবানী করে আল্লাহ যে তাঁর কিছু গুণ-বৈশিষ্ট্য নিজ দায়িত্বে মানুষের কাছে প্রকাশ করেছেন—এটাই তাঁর এক অপার করুণা। এর উদ্দেশ্য হলো, মানুষ যেন সৃষ্টির গুণ-বৈশিষ্ট্যকে আল্লাহর গুণ-বৈশিষ্ট্যসমূহের সাথে গুলিয়ে না ফেলে। কারণ এর দ্বারা তারা সৃষ্টিকে স্রষ্টার মর্যাদা দিয়ে বসবে। আর এটাই হলো সকল প্রকার পৌত্তলিকতার মূল ভিত্তি। পৌত্তলিকতাবাদী প্রতিটি ধর্ম ও ধর্মীয় রীতিতে বিভিন্ন সৃষ্টিকে স্রষ্টার বৈশিষ্ট্য প্রদান করা হয় এবং পরিণতিতে, আল্লাহর পরিবর্তে অথবা তাঁর পাশাপাশি এসব সৃষ্টি উপাস্যে পরিণত হয়।

আল্লাহর অগণিত গুণ-বৈশিষ্ট্যের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যটি হলো, তিনিই 'ইবাদাতের যোগ্য একমাত্র সত্য ইলাহ; তাই কোনোক্রমেই তাঁর কোনো সৃষ্টির 'ইবাদাত করা যাবে না। গ্রিক দর্শন দ্বারা প্রভাবিত মুতাযিলা সম্প্রদায়ের উদ্ভব ঘটলে এই বৈশিষ্ট্যের ব্যাপারে মুসলিমদের মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয়। বর্তমানকালের অনেক মুসলিমদের মধ্যেও সেই বিভ্রান্তির ধারা রয়ে গেছে।[১] অতি স্পর্শকাতর এই বৈশিষ্ট্যটি হলো 'আল-উলূ' যার অর্থবাচক ইংরেজি highness বা transcendence, বাংলা অর্থ 'ঊর্ধ্বে থাকা'। আল্লাহর জন্য ব্যবহৃত হলে এ বৈশিষ্ট্যটির অর্থ হলো, আল্লাহ তাঁর সৃষ্টির ঊর্ধ্বে। তিনি তাঁর সৃষ্টির দ্বারা পরিবেষ্টিত নন, কিংবা সৃষ্টির কোনো অংশ কোনোভাবেই তাঁর ঊর্ধ্বে নয়। তিনি তাঁর সৃজিত বিশ্বজগতের কোনো

(১) Nasiruddeen al-Albani, Mukhtasar al-Uloo, (Beirut: al-Maktab al-Islami, 1st ed., 1981, পৃ. ২৩).

www.QuranerAlo.net

অংশ নন; বিশ্বজগতও তাঁর অংশ নয়। প্রকৃত সত্য হলো, তাঁর সত্তা সবদিক থেকে অনন্য এবং সৃষ্টি থেকে পৃথক। তিনি স্রষ্টা; আর মহাবিশ্ব এবং এর মধ্যস্থিত যা কিছু আছে সবকিছুই তাঁর সৃষ্টির একটা অংশ। তবে তাঁর বৈশিষ্ট্য এবং গুণাবলি স্থান-কাল-পাত্র-নির্বিশেষে সর্বত্র বলবৎ রয়েছে। তিনি সবকিছু দেখেন, শোনেন ও জানেন। সৃষ্টিজগতে যা কিছু ঘটে, সবকিছুরই মুখ্য ও প্রধান কারণ তিনি। তাঁর ইচ্ছা ব্যতীত কোনো কিছুই ঘটে না। ফলে বলা যায়, স্রষ্টার সাথে সৃষ্টির সম্পর্কের দিক থেকে, আল্লাহ সম্পর্কে ইসলামি ধারণা মূলত একটি দ্বিপাক্ষিক ধারণা। তবে শুধু আল্লাহ বা তাঁর সৃষ্টির দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে, আল্লাহ সম্পর্কে ইসলামি ধারণা কঠোরভাবে একত্ববাদী। এটি এই অর্থে দ্বিপাক্ষিক যে, আল্লাহ শুধুই আল্লাহ এবং তাঁর সৃষ্টি শুধুই সৃষ্টি। স্রষ্টা এবং সৃষ্টি পৃথক দুটো পক্ষ; একটি অসীম, অন্যটি সসীম। এদের একটি অন্যটি নয়, কিংবা উভয় কখনো এক নয়। একই সাথে, আল্লাহ সম্পর্কে ইসলামি ধারণা একটি আপোষহীন একত্বের ধারণা। কারণ পরম অর্থে, আল্লাহ এক ও একক; যিনি পিতা-মাতা, সন্তান-সন্ততি কিংবা অংশীদার থেকে সম্পূর্ণ পবিত্র। উপাস্যসুলভ গুণ-বৈশিষ্ট্যে তিনি অনন্য, অতুলনীয় এবং কোনো কিছুই তাঁর সদৃশ নয়। সমুদয় সৃষ্টিজগতে তিনিই ক্ষমতার একমাত্র উৎস এবং সকল কিছুই তাঁর মুখাপেক্ষী।

অনুরূপভাবে, সৃষ্টিকুলের দিক থেকেও আল্লাহ সম্পর্কে ইসলামি বিশ্বাস দৃঢ়ভাবে একত্ববাদী একটি বিশ্বাস। কারণ সমগ্র মহাবিশ্ব ও এর মধ্যস্থিত সবকিছুর একমাত্র সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ। সকল সৃষ্ট জীব ও জড়বস্তু একই স্রষ্টার সৃষ্টি এবং প্রকৃতপক্ষে একই ধরনের গঠন-উপাদান বা প্রকৃতি দ্বারা সৃষ্ট।

তাৎপর্য

আল্লাহর 'ইবাদাত করার জন্য মানুষের কাছে আল্লাহর ঊর্ধ্বত্বের বৈশিষ্ট্যটির বিশেষ তাৎপর্য রয়েছে। মুহাম্মাদ ﷺ এর আগমনের পূর্বে, মানুষ আল্লাহর এই সুমহান বৈশিষ্ট্যের শিক্ষা থেকে দূরে সরে গিয়েছিল। খ্রিষ্টানরা দাবি করেছিল, আল্লাহ রক্ত-গোশতের শরীর নিয়ে নাবি ঈসা ﷺ এর আকৃতিতে পৃথিবীতে আগমন করেছিলেন, যাকে ক্রুশবিদ্ধ করে হত্যা

www.QuranerAlo.net

করা হয়। খ্রিস্টানদের পূর্বে ইহুদিরাও দাবি করেছিল যে, আল্লাহ মানুষের আকৃতিতে পৃথিবীতে আগমন করেন এবং নাবি ইয়াকূব ﷺ এর সাথে মল্লযুদ্ধে হেরে যান।(২) পারস্যের লোকেরা তাদের রাজাদেরকে আল্লাহর সকল গুণ-বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন দেবতা মনে করত এবং প্রত্যক্ষভাবেই তাদের উপাসনা করত। হিন্দুরা বিশ্বাস করে যে, পরমাত্মা ব্রহ্মা সকল বস্তুতে এবং সর্বত্র বিরাজমান। এ কারণে তারা অসংখ্য মূর্তি, মানুষ, এমনকি জীবজন্তুকে ব্রহ্মার প্রতিমূর্তি ভেবে তাদের পূজা করে।(৩) এই অপবিশ্বাস হিন্দুদের এত নীচ চিন্তাধারায় নামিয়ে দিয়েছে যে, দেবতা শিবের পূজা করার জন্য তারা তাদের পবিত্র নগরী বানারাসে তীর্থযাত্রা করে। এখানে শিবের মূর্তি হিসেবে একটি সমুত্থিত পুরুষাঙ্গের মূর্তি স্থাপন করা আছে, যেটিকে তারা ভক্তিভরে 'লিঙ্গাম' বলে ডাকে।(৪)

ব্রহ্মা সর্বত্র বিরাজমান—হিন্দুদের এই বিশ্বাস পরবর্তীতে খ্রিস্টীয় বিশ্বাসের অংশ হয়ে যায় এবং নাবি ﷺ এর ইন্তেকালের অনেক প্রজন্ম পরে মুসলিমদের মধ্যেও এই বিশ্বাসের অনুপ্রবেশ ঘটে। 'আব্বাসীয় সাম্রাজ্যের স্বর্ণযুগে ভারতীয়, পারস্য এবং গ্রিক দর্শনের বিভিন্ন বই-পুস্তক অনুবাদ হলে, দার্শনিক মহলগুলোতে, 'আল্লাহ সর্বত্র এবং সবকিছুতে বিরাজমান'—এই ধারণার প্রবর্তন ঘটে এবং সুফিতন্ত্রের মৌলিক ভিত্তি হয়ে ওঠে। অবশেষে এই ধারণা মুতাযিলা ফিরকার উপর প্রভাব বিস্তার করে। এই গোষ্ঠীর অনেকেই 'আব্বাসীয় খলিফা, মামূনের (শাসনকাল : ৮১৩-৮৩২ সাল)

---

(২) Genesis, 32:24-30.

(৩) Jonh R. Hinnells, Dictionary of Religions, (England: Penguin Books, 1984, পৃ. ৬৭-৮).

(৪) Collier's Encyclopedia, vol. 12, পৃ. ১৩০. See Santha Rama Rau's article "Banarash: India's City of Light", National Geographic, February 1986, পৃ. ২৩৫. দ্বৈত ক্ষমতার অধিকারী প্রাকৃতিক দেবতা শিব শুধু ধ্বংসই করে না, সৃষ্টিও করে। সাধারণত, লিঙ্গাম হলো পাথর দিয়ে তৈরি করা সমুত্তেজিত পুরুষাঙ্গের মূর্তি যা শিবের প্রতিনিধিত্বমূলক ক্ষমতার প্রতীক। বিশালাকৃতির সমুত্তেজিত পুরুষাঙ্গের একটি মূর্তি থাকা মন্দিরগুলোর একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য। নিয়মানুযায়ী, লিঙ্গামটিকে একটি গোলাকার ভিত্তির উপর স্থাপন করা হয়ে থাকে যেটিকে যোনি (নারী যৌনাঙ্গ) বলা হয়। শক্তির প্রতীক এই যোনি হলো শিবের অর্ধাঙ্গিনী এবং ঐশ্বরিক ক্ষমতার একটি উৎস। ব্যাপক অর্থে, লিঙ্গাম হলো সমগ্র হিন্দু জাতিসত্তার প্রতীক...। হিন্দুদের প্রচলিত ধর্মানুষ্ঠানগুলোতে তাদের ঠাকুরেরা লিঙ্গামে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করে, তাতে ঘি মাখায় এবং দুধ পানি দিয়ে সেটিকে গোসল করায়!

www.QuranerAlo.net

বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক পদে অধিষ্ঠিত ছিল। তারা খলিফার মদদপুষ্ট হয়ে, এই মতবাদের সাথে নিজেদের বিকৃত দার্শনিক চেতনাকে মিশিয়ে ব্যাপকভাবে প্রচার চালাতে থাকে। গোটা সাম্রাজ্যেই অনুসন্ধান আদালত গঠন করা হয় এবং মুতাযিলা দর্শনের বিরোধিতা করার কারণে বহু 'আলিমকে জেলে পাঠানো হয়, নির্যাতন করা হয় এবং অনেককে হত্যাও করা হয়।

ইমাম আহ্‌মাদ ইব্‌ন হানবাল (৭৭৮-৮৫৫ সাল) তার আপোষহীন অবস্থান তুলে ধরে পূর্ববর্তী মুসলিম 'আলিম ও সহাবিদের বিশ্বাসকে সংরক্ষণের জন্য এগিয়ে আসার পরেই অবস্থার পরিবর্তন ঘটে। খলিফা আল-মুতাওয়াক্কিলের (৮৪৭-৮৬১) শাসনামলে মুতাযিলা দার্শনিকদের সরকারের গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক পদগুলো থেকে অপসারণ করা হয় এবং তাদের দর্শন প্রশাসনিকভাবে নিষিদ্ধ করা হয়। কালক্রমে তাদের অধিকাংশ মতবাদ বিলুপ্ত হয়ে গেলেও, 'আল্লাহ সর্বত্র বিরাজমান' হওয়ার ভ্রান্ত বিশ্বাসটি আশআরি গোষ্ঠীর(৫) অনুসারীদের মধ্যে আজও রয়ে গেছে। যদিও মুতাযিলা দর্শন ত্যাগকারী পন্ডিতরাই পরবর্তীতে দার্শনিক দৃষ্টিকোণ থেকে এ চিন্তাধারার বাড়াবাড়িকে ভুল প্রমাণের চেষ্টা করেছিলেন।

---

(৫) দার্শনিক ধর্মতত্ত্বের এই প্রতিষ্ঠানটির নামকরণ করা হয়েছে আবুল-হাসান আলি আল-আশআরি (৮৭৩-৯৩৫) এর নামানুসারে। বসরায় জন্মগ্রহণকারী এই ধর্মতত্ত্ববিদ তার চল্লিশ বছর বয়স পর্যন্ত মুতাযিলা মতাদর্শের ধর্মতত্ত্ববিদ, আল-জুব্বা'ইর ঐকান্তিক শিষ্য ছিলেন। হাদীসশাস্ত্র নিয়ে পড়াশোনার পর ইসলামি চেতনার সাথে মুতাযিলা মতাদর্শের সাংঘর্ষিক দিকগুলো তার কাছে স্পষ্ট হয়ে যায়। ফলে তিনি আহলুস সুন্নাহ্‌র মতাদর্শকে সমর্থন করতে শুরু করেন। তাকে সনাতন স্কল্যাসটিসিজমের (কালাম শাস্ত্রের) প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে বিবেচনা করা হয়। তার সবচেয়ে বিখ্যাত লেখনী কর্মগুলো হলো, আল-ইবানাহ আন উসূল আদ-দিয়ানাহ্‌ (অনুবাদ করেছেন, ডব্লিউ. সি. ক্লেইন, নিউ হেভেন, ১৯৪০) এবং মাকালাত আল-ইসলামিয়্যীন, (কায়রো, মাক্‌তাবা আন নাহদাহ্‌ আল-মিসরীয়্যাহ্‌, ২য় সংস্করণ, ১৯৬৯)। জীবনের শেষ প্রান্তে এসে আল-আশআরি পুরোপুরিভাবে কালামশাস্ত্র পরিত্যাগ করেন এবং শুধুমাত্র হাদীসশাস্ত্রের দিকে ঝুঁকে পড়েন। যাই হোক, অন্যান্য মাযহাবের এবং বিশেষভাবে শাফি'ঈ মাযহাবের ধর্মতত্ত্ববিদরা তার প্রথম দিকের মতামতগুলোকে গ্রহণ করেছিলেন এবং আশআরি মাযহাবটিও স্বয়ংসম্পূর্ণ একটি দার্শনিক প্রতিষ্ঠান হয়ে উঠেছিল। আল-আশআরি তার মাযহাবের পক্ষে যেসব যুক্তিপূর্ণ পাল্টা জবাব দিয়েছিলেন, আল-বাকিল্লানি (মৃত্যু ১০১৩ সাল) সেগুলোকে নিয়মতান্ত্রিক রূপদান করেন, বুদ্ধিবৃত্তি ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করেন এবং যুক্তিসমূহকে সুবিন্যস্ত করেন। আল-আশআরির মৃত্যু পরবর্তী এই মাযহাবের নেতৃস্থানীয় পন্ডিতরা হলেন, ইমাম আল-হারামাইন (আল-জুওয়াইনি, মৃত্যু ১০৮৬), আল-গাজ্জালি (মৃত্যু ১১১২) এবং আর-রাযি (মৃত্যু ১২১০), (Shorter Encyclopedia of Islam, পৃ. ৪৬-৭ and পৃ. ২১০-১৫).

www.QuranerAlo.net

সর্বব্যাপিতা মতবাদের বিপজ্জনক দিক

অনেকেই স্রষ্টার উপর সর্বব্যাপিতার, অর্থাৎ সর্বত্র বিরাজমান হওয়ার মিথ্যা বৈশিষ্ট্য আরোপ করেছে। এদের কেউ আবার দাবি করেছে যে, পশু-পাখি, গাছপালা, জড়বস্তু ইত্যাদির চেয়ে মানুষের মাঝেই স্রষ্টা অধিক বিরাজমান। এই তত্ত্বের উদ্ভবের পরপরই কিছু মানুষ এমনও দাবি করে বসে যে, অন্যান্য মানুষের থেকে তাদের মাঝেই স্রষ্টা অধিক পরিমাণে বিরাজমান। তা হুলূল (মানুষের অন্তরে আল্লাহর বসবাস) কিংবা ইত্তিহাদ (মানুষের আত্মার সাথে আল্লাহর আত্মার পুরোপুরিভাবে একীভূত হয়ে যাওয়া), যেভাবেই হোক না কেন। নবম শতকে আল-হাল্লাজ (৮৫৮-৯৯২) নামের এক উন্মাদ এবং নামধারী অলি প্রকাশ্যে ঘোষণা দেয় যে, আল্লাহ এবং সে একই সত্তা।[৬] দশম শতকের শিয়াদের থেকে বেরিয়ে আসা নুসাইরিয় গোষ্ঠী দাবি করেছিল যে, নাবি ﷺ এর জামাতা আলি ইব্ন আবি তালিব ﷺ হলেন আল্লাহর মানবীয় রূপ।[৭] একাদশ শতকে শিয়াদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া দ্রুয নামের অন্য একটি গোষ্ঠীর দাবি অনুযায়ী, ফাতেমীয় শিয়া খলিফা আল-হাকিম বিন আম্‌রিল্লাহ (৯৯৬-১০২১ সাল) ছিলেন মানুষের রূপে আল্লাহর সর্বশেষ আত্মপ্রকাশ।[৮] দ্বাদশ শতকের আরেক সুফি ইব্ন আরবি (১১৬৫-১২৪০ সাল) তার কবিতায় অন্য কারও কাছে প্রার্থনা না করে প্রত্যেককে তার নিজের কাছে প্রার্থনা করতে উদ্বুদ্ধ করেছেন। কারণ তার বিশ্বাস, মানুষের মাঝেই স্রষ্টা আছেন।[৯]

অ্যামেরিকার এলিজাহ মুহাম্মাদের দাবির মূল সূত্রই হলো এই বিশ্বাস। তার দাবি, কৃষ্ণাঙ্গরা সবাই 'আল্লাহ', এবং তার গুরু ফারদ মুহাম্মাদ হলেন

---

(৬) A. J. Arberry, Muslim Saints and Mystics, (London: Routledge and Kegan Paul, 1976, পৃ. ২৬৬-৭১).

(৭) Shorter Encyclopedia of Islam, পৃ. ৪৫৪-৫৫.

(৮) Shorter Encyclopedia of Islam, পৃ. ৯৪-৫.

(৯) ইব্ন আরবি আল্লাহর বর্ণনা দিয়েছেন এইভাবে, "মহিমা তাঁরই, যিনি সবকিছুকে অস্তিত্বে এনেছেন নিজেই সেগুলোর মধ্যে সত্তা হিসেবে উপস্থিত থেকে।" (See, Ibn Arabi, Al-Futoohat al-Makkaiyah, vol. 2, পৃ. ৬০৪), quoted in Hadhihee Heya as-Soofeyah by Abdur-Rahman al-Wakel, (Makkah: Dar al-Kutub al-Ilmeeyah, 3rd ed., 1979, পৃ. ৩৫).

www.QuranerAlo.net

Contents

সর্বময় ক্ষমতাবান আল্লাহ।[১০] নিজেকে আল্লাহ বলে দাবি করেছে এবং কিছু মানুষও তা গ্রহণ করেছে, এমন সর্বসাম্প্রতিক দৃষ্টান্তগুলোর একটি হলো যাজক জিম জোন্স। এই লোক ১৯৭৯ সালে গায়ানায় তার ৯০০ অনুসারীসহ নিজেকে হত্যা করে। সত্যি বলতে, জিম জোন্স শিখেছিলেন, সরলমনা মানুষদের কীভাবে নিজ স্বার্থে ব্যবহার করতে হয়। এই মনস্তাত্ত্বিক কৌশল তিনি শিখেছিলেন অন্য এক অ্যামেরিকানের কাছ থেকে; যার প্রকৃত নাম জর্জ বেকার হলেও, নিজেকে তিনি ফাদার ডিভাইন বা স্বর্গের পিতা বলে পরিচয় দিতেন। ১৯২০-এর দশকে, মন্দাবস্থার প্রথম দিকে তিনি গরিবদের জন্য খাবারের দোকান খুলে আলোচনায় আসেন। মানুষের পেট জয় করার পর, তাদের কাছে এবার নিজেকে তিনি মানুষের রূপ ধারণকারী স্রষ্টা বলে দাবি পেশ করেন। সময় বুঝে বিয়েও করেন তিনি এবং তার কানাডীয় স্ত্রীর নাম রাখেন, মাদার ডিভাইন বা স্বর্গের মাতা। তিরিশের দশকের মাঝামাঝি নাগাদ তার অনুসারীদের সংখ্যা দাঁড়ায় লাখের কোঠায়। ইউরোপ ও যুক্তরাষ্ট্রে এমন কোনো জায়গা ছিল না যেখানে তার অনুসারী ছিল না।[১১]

এসব ঘটনা থেকে দেখা যাচ্ছে, এই ধরনের ঐশ্বরিক ক্ষমতার দাবি করা বিশেষ কোনো স্থান বা ধর্মীয় দল বা গোষ্ঠীর মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। যেখানেই মূর্খতা প্রবল ছিল, সেখানেই এসব বিশ্বাস শিকড় গেঁড়েছে। সৃষ্টির মাঝে স্রষ্টা বিরাজমান হতে পারেন বলে বিশ্বাস করার মাধ্যমে মূলত মানুষকে দেবতা হিসেবে গ্রহণ করতে মানুষের মন নীতিগতভাবে প্রস্তুত হয়ে যায়। এ কারণেই স্রষ্টা বলে দাবিকারীরা খুব সহজেই তাদের অনুসারী খুঁজে পায়।

এসব পর্যালোচনা থেকে সিদ্ধান্তে আসা যায় যে, 'আল্লাহ সর্বত্র বিরাজমান'—এ বিশ্বাস অত্যন্ত বিপজ্জনক। কারণ আল্লাহর দৃষ্টিতে সবচেয়ে গুরুতর পাপ হলো শির্ক বা তাঁর সৃষ্টির উপাসনা করা। এই বিশ্বাস মানুষকে সেই পাপের দিকেই ঠেলে দেয়, এর পক্ষে কথা বলে এবং সৃষ্টির উপাসনাকে যৌক্তিক প্রমাণ করতে চায়। তাছাড়া, এই বিশ্বাস তাওহীদ আল-আসমা' ওয়াস-সিফাত সংশ্লিষ্ট একটি ভয়ানক শির্ক। কারণ তা আল্লাহর উপর এমন

(১০) Elijah Muhammad, Our Saviour Has Arrived (Chicago: Muhammad's Temple of Islam, no. 2, 1974, পৃ. ২৫, ৫৬-৫৭ ও ৩৯-৪৬).

(১১) E. U., Essien-Udom, Black Nationalism, (Chicago: University of Chicago Press, 1962, পৃ. ৩২).

www.QuranerAlo.net

এক বৈশিষ্ট্য আরোপ করে যা তাঁর বৈশিষ্ট্য নয়। আল্লাহর এমন বৈশিষ্ট্যের কোনো বর্ণনা কুর'আন কিংবা হাদীসের কোথাও খুঁজে পাওয়া যায় না; বরং কুর'আন ও সুন্নাহর বক্তব্য এই বিশ্বাসের সম্পূর্ণ বিপরীত বলে প্রমাণিত।

সুস্পষ্ট প্রমাণ

যেহেতু আল্লাহ ছাড়া বা তাঁর পাশাপাশি অন্য কিছুর 'ইবাদাত করাই হলো সর্বোচ্চ পাপ এবং যেহেতু তিনি ছাড়া অন্য সবকিছুই তাঁর সৃষ্টি, তাই ইসলামের সকল বিধিবিধান সৃষ্টির উপাসনা করার বিরোধী; হোক তা প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষভাবে। আকীদা-বিশ্বাসের মৌলিক ধারাগুলো স্রষ্টা এবং সৃষ্টির মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য নিরূপণ করে দেয়।

আল্লাহ তাঁর সৃষ্টির ঊর্ধ্বে এবং তিনি তাঁর সৃষ্টি থেকে সম্পূর্ণরূপে পৃথক। এই বিষয়টিকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য মূল ধারার মুসলিম 'আলিমগণ ইসলামি আকিদার মৌলিক উপাদানসমূহের ভিত্তিতে বহু প্রমাণাদি উপস্থাপন করেছেন। নীচে এই ধরনের সাতটি প্রমাণ তুলে ধরা হলোঃ

১. সৃষ্টিগত প্রমাণ

ইসলামি দর্শন অনুযায়ী, প্রতিটি মানুষ কিছু সহজাত প্রবণতা নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। সে কেবল তার পরিবেশ-পারিপার্শ্বিকতার ফসল নয়। এই সত্যটি কুর'আনের আয়াত দ্বারা প্রতিষ্ঠিত। সংশ্লিষ্ট আয়াতে আল্লাহ ব্যাখ্যা দিয়েছেন যে, আদামকে সৃষ্টি করার পর তিনি তার পৃষ্ঠদেশ থেকে তার সকল ভবিষ্যৎ বংশধরদের বের করে আনেন এবং প্রত্যেকের কাছ থেকে তাঁর এককত্বের স্বীকারোক্তি গ্রহণ করেন।[১২] নাবি ﷺ এর বক্তব্যের মাধ্যমেও বিষয়টি দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। কেননা তিনি বলেছেন,

(১২) সূরা আল-আরাফ, ৭:১৭২

www.QuranerAlo.net

"প্রতিটি নবজাত শিশু আল্লাহর আনুগত্য করার সহজাত প্রবণতা নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। কিন্তু তার পিতামাতাই তাকে ইহুদি, অগ্নিপূজক অথবা খ্রিস্টান বানায়।"(১৩)

তাছাড়া আল্লাহর সর্বত্র বিরাজমান হওয়ার এ তত্ত্বের প্রতি মানুষের স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমেই প্রমাণ করা যায় যে, এটা কতোখানি অযৌক্তিক। আল্লাহ যদি সর্বত্র বিরাজমান এবং সবকিছুতে উপস্থিত থাকেন; তাহলে একথার অর্থ দাঁড়ায়—নোংরা, অপবিত্র বস্তু ও অপবিত্র স্থানেও আল্লাহ রয়েছেন। এই তত্ত্বের মধ্যে নিহিত এই বিষয়টি বুঝতে পারলে অধিকাংশ মানুষ এমনিতেই এমন কথা ভাবতেও ঘৃণা বোধ করবেন। স্বভাবজাত কারণেই মানুষ এমন কোনো বক্তব্য মেনে নিতে পারে না, যার মধ্যে মহাবিশ্বের স্রষ্টা মহান আল্লাহকে মানুষের মলমূত্র কিংবা নোংরা বস্তু বা স্থানে ভাবতে হয়। কে না বুঝে যে, এটা তাঁর সুমহান মর্যাদার সাথে সাংঘর্ষিক। অতএব, নিশ্চিতভাবে এই সিদ্ধান্তে আসা যায় যে, আল্লাহ মানুষের মধ্যে যে সহজাত প্রবণতা দান করেছেন তার সাথেই এ তত্ত্ব সাংঘর্ষিক। আর মানুষের স্বভাব-প্রকৃতিই যদি আল্লাহর সর্বত্র বিরাজমান থাকার দাবিকে প্রত্যাখ্যান করে, তাহলে এই দাবি সঠিক হওয়ার সম্ভাবনা একেবারেই ক্ষীণ।

যারা 'স্রষ্টা সর্বত্র বিরাজমান'—এই বিশ্বাস ত্যাগ করতে নারাজ, তারা হয়তো যুক্তি দেখাবেন যে, স্রষ্টা সম্পর্কে এমন ধারণা করতে ঘৃণা করাটা তাদের শৈশবের নিয়ন্ত্রিত শিক্ষাদীক্ষার ফল; এটা কোনো সহজাত প্রতিক্রিয়া নয়। অথচ বিপুল সংখ্যক ছোট ছোট বাচ্চাও চিন্তাভাবনা না করেই, নির্দ্বিধায় এই ধারণাকে প্রত্যাখ্যান করে। যদিও তাদের অনেকের মনেই ইতিপূর্বে সর্বব্যাপিতার বিশ্বাস ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছিল।

২. 'ইবাদাতের মাধ্যমে প্রমাণ

'ইবাদাতের ক্ষেত্রে ইসলামি বিধান হলো, 'ইবাদাতের স্থানটি অবশ্যই সকল প্রকার মূর্তি ও প্রতিকৃতি থেকে মুক্ত রাখতে হবে—হোক তা স্রষ্টার কিংবা সৃষ্টির। সলাতের মধ্যে রুকূ, সিজদা ইত্যাদি যেসব কাজ করা হয়,

(১৩) আবু হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত। বুখারি, (আরবি-ইংরেজি), খণ্ড ৪, পৃ. ৩৬৯-৯০, হাদীস নং ৫৯৭ এবং মুসলিম, (ইংরেজি অনুবাদ), খণ্ড ৪, পৃ. ১৩৯৯, হাদীস নং ৬৪২৯।

www.QuranerAlo.net

সেগুলো আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনো ব্যক্তি বা বস্তুর উদ্দেশ্যে নিবেদন করাও ইসলামে নিষিদ্ধ। স্রষ্টা যদি সর্বত্র বিরাজ করতেন, তিনি যদি সকল ব্যক্তি ও বস্তুর মধ্যে উপস্থিত থাকতেন, তাহলে মানুষ পরস্পরের উপাসনা করলে তা সম্পূর্ণরূপে গ্রহণযোগ্য হতো। এমনকি নিজে নিজের পূজা করলেও তা গ্রহণযোগ্য হতো যেমনটি ইব্ন আরবি তার বিভিন্ন লেখনীতে ইঙ্গিত করেছেন। কোনো মূর্তি, বৃক্ষ বা প্রাণীপূজারীকে যৌক্তিকভাবে বুঝানোও সম্ভব হতো না যে, তার উপাসনার পদ্ধতি ভুল এবং তার উচিত কেবল অদৃশ্য স্রষ্টা আল্লাহর উপাসনা করা, যিনি এক এবং যাঁর কোনো শরিক নেই। মূর্তিপূজারী তাহলে বলত যে, সে কোনো বস্তুর পূজা করছে না; বরং এইসব বস্তুর মধ্যে উপস্থিত স্রষ্টার অংশ কিংবা মানুষ বা প্রাণীর রূপ ধারণকারী স্রষ্টার পূজা করছে। যদিও এসব করার পেছনে যে যুক্তিই দেওয়া হোক না কেন, যে কেউ এমনটি করবে, ইসলামের দৃষ্টিতে সে কাফির। কেননা, যে ব্যক্তি এসবে লিপ্ত হয়, সে আল্লাহর সৃষ্টির কাছে মাথা নত করে। ইসলাম এসেছে মানুষকে সৃষ্টির উপাসনা থেকে ফিরিয়ে এক স্রষ্টার আনুগত্যের পথ দেখাতে। অতএব, 'ইবাদাতের ক্ষেত্রে ইসলামের বিধান সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করে যে, সৃষ্টির মাঝে আল্লাহকে খুঁজে পাওয়া যাবে না। এসব থেকে তিনি সম্পূর্ণরূপে পৃথক। স্রষ্টা কিংবা যেকোনো প্রাণীর চিত্রাঙ্কনের ব্যাপারে ইসলামের সার্বিক নিষেধাজ্ঞার মাধ্যমে এই মত আরও সুদৃঢ় হয়েছে।

৩. মিরাজের মাধ্যমে প্রমাণ

মাদীনায় হিজরাতের দু'বছর আগে, নাবি ﷺ মাক্কা থেকে জেরুযালেমে এক অলৌকিক রাত্রিকালীন সফর করেন, যাকে আরবিতে বলা হয় 'ইসরা'। এখান থেকে তিনি সপ্ত আকাশ পাড়ি দিয়ে সৃষ্টির সর্বোচ্চ শিখরে গমন করেন, যেটি 'মিরাজ' হিসেবে সমধিক পরিচিত[১৪]। তাঁকে এই অলৌকিক ভ্রমণ করানো হয়েছিল, যেন তিনি আল্লাহর সান্নিধ্যে আসতে পারেন। সেই সপ্তম আকাশের উপরেই দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত সলাত ফরজ করা হয়েছিল, সেখানেই আল্লাহ নাবি ﷺ এর সাথে সরাসরি কথা বলেছিলেন এবং সেখানেই

(১৪) মিরাজ (আক্ষ. সিঁড়ি বা মই) বিশেষ্যটি দ্বারা মূলত সেই বাহনটিকে বুঝায় যা নাবি ﷺ কে বহন করে ঊর্ধ্বাকাশে নিয়ে গিয়েছিল। তবে এই ঊর্ধ্বগমনকেই সচরাচর 'মিরাজ' নামে উল্লেখ করা হয়ে থাকে। (দেখুন: Lane's Arabic-English Lexicon, vol. 2, পৃ. ১৯৬৬-১৯৬৭).

www.QuranerAlo.net

তাঁকে সূরা আল-বাক্বারাহ্র[১৫] শেষের আয়াতগুলো দেওয়া হয়েছিল। আল্লাহ যদি সর্বত্র বিরাজমান হতেন, তাহলে নাবি ﷺ এর আকাশের উপর যাওয়ার কোনো প্রয়োজন হতো না। পৃথিবীতে নিজের ঘরে বসেই তিনি আল্লাহর সান্নিধ্য পেতে পারতেন। অতএব, সপ্ত আকাশ পাড়ি দিয়ে নাবি ﷺ এর মিরাজের ঘটনার মধ্যে যে সূক্ষ্ম ইঙ্গিত রয়েছে তা হলো, আল্লাহ তাঁর সৃষ্টির উর্ধ্বে এবং তিনি তাঁর সৃষ্টির অংশ নন।

৪. কুর'আন থেকে প্রমাণ

মহান আল্লাহ যে তাঁর সৃষ্টির উর্ধ্বে এ সম্পর্কে কুর'আনে এত আয়াত রয়েছে যেগুলো গণনা করা কঠিন। কুর'আনের প্রায় প্রতিটি সূরাতেই এমন কোনো না কোনো আয়াত রয়েছে যেগুলোতে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে এ বিষয়ে কথা বলা হয়েছে। পরোক্ষ বলা যেতে পারে সেই আয়াতগুলোকে যেগুলোতে কোনো কিছু আল্লাহর দিকে উর্ধ্বগমন করছে বা তাঁর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ হচ্ছে এমন বিষয়ের উল্লেখ আছে। উদাহরণস্বরূপ, সূরা আল-ইখলাসে আল্লাহ নিজের নাম দিয়েছেন, 'আস্-স্বামাদ'[১৬] যার অর্থ: যার পানে কোনো কিছু উর্ধ্বগামী হয়। অনেক সময় এ ধরনের ইঙ্গিতপূর্ণ আয়াতগুলো আক্ষরিক অর্থই বহন করে। যেমন, ফেরেশতাদের সম্পর্কে আল্লাহ ﷻ বলেছেন,

تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ ﴿٤﴾

"মালাইকাগণ ও রূহ এমন একদিনে আল্লাহর পানে উর্ধ্বগামী হবে, যার পরিমাণ পঞ্চাশ হাজার বছর।" (আল-মাআরিজ, ৭০:৪)

(১৫) এই ঘটনা সম্পর্কে নাবি ﷺ এর দেওয়া বর্ণনার জন্য দেখুন : বুখারি, (আরবি-ইংরেজি), খণ্ড ৯, পৃ. ৩৪৯-৫০, হাদীস্ নং ৪০৬ এবং মুসলিম, (ইংরেজি অনুবাদ), খণ্ড ১, পৃ. ১০৩-৪, হাদীস্ নং ৩১৩।

(১৬) সূরা আল-ইখলাস; ১১২:২

www.QuranerAlo.net

আবার অনেক সময় এ ধরনের ইঙ্গিতপূর্ণ আয়াতগুলো আধ্যাত্মিক অর্থ বহন করে। যেমন, দুআ এবং যিক্‌র সম্পর্কে আল্লাহ ﷻ বলেন,

... إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ.....

"...তাঁরই পানে উত্থিত হয় ভালো কথা..." (আল-ফাতির, ৩৫:১০)

নিম্নোক্ত আয়াতেও অনুরূপ ইঙ্গিত রয়েছেঃ

وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا هَامَانُ ابْنِ لِي صَرْحًا لَّعَلِّي أَبْلُغُ الْأَسْبَابَ ﴿٣٦﴾ أَسْبَابَ السَّمَاوَاتِ فَأَطَّلِعَ إِلَىٰ إِلَٰهِ مُوسَىٰ وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ كَاذِبًا.....

"ফিরআউন আরও বলল, হে হামান, আমার জন্য একটি উঁচু ইমারত বানাও যাতে আমি অবলম্বন পাই। আসমানে আরোহণের অবলম্বন, যাতে আমি মূসার ইলাহ্‌কে দেখতে পাই। কারণ নিশ্চয়ই আমি তাঁকে মিথ্যাবাদী মনে করি।..." (আল-গাফির, ৪০:৩৬-৩৭)

নিম্নোক্ত আয়াতে আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ হওয়ার উদাহরণ পাওয়া যায়ঃ

قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِن رَّبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا وَهُدًى وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ ﴿١٠٢﴾

"বলুন, রূহুল-কুদ্‌স (জিবরীল) একে তোমার রবের পক্ষ থেকে যথাযথভাবে নাযিল করেছেন। যারা ঈমান এনেছে তাদেরকে সুদৃঢ় করার জন্য এবং মুসলিমদের জন্য হিদায়াত ও সুসংবাদস্বরূপ।" (আন-নাহ্‌ল, ১৬:১০২)

আল্লাহর অবস্থান সৃষ্টির ঊর্ধ্বে হওয়া সম্পর্কে প্রত্যক্ষ বর্ণনা খুঁজে পাওয়া যায় তাঁর গুণবাচক নামসমূহে এবং তাঁর প্রত্যক্ষ বক্তব্যসমূহে। উদাহরণস্বরূপ, আল্লাহ নিজেকে 'আল-আলি' এবং 'আল-আলা' নামে ব্যক্ত করেছেন যার উভয়টির অর্থ সর্বোচ্চ, যার উপরে আর কিছু নেই। আরও উদাহরণ

www.QuranerAlo.net

হলো, 'আল-আলী আল-আযীম,'[১৭] 'রব্বিকাল-আলা'[১৮]। আল্লাহ নিজেকে পরিষ্কারভাবে তাঁর বান্দাদের উর্ধ্বে উল্লেখ করে বলেছেন,

وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ

"তিনি তাঁর বান্দাদের উপর একচ্ছত্র নিয়ন্ত্রণকারী এবং তিনি প্রজ্ঞাময় ও সম্যক অবগত।" (আল-আন আম; ০৬:১৮)

এছাড়াও তিনি তাঁর আনুগত্যকারীদের সম্পর্কে বলেছেন,

يَخَافُونَ رَبَّهُم مِّن فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ.....

"যারা তাদের উর্ধ্বে থাকা রবকে ভয় করে..."

(আন-নাহ্‌ল, ১৬:৫০)

অতএব, যারা কুর'আনের অর্থ নিয়ে চিন্তাভাবনা করে, তাদের জন্য কুর'আন নিজেই স্পষ্ট করে দেয় যে, আল্লাহ তাঁর সৃষ্টি থেকে অনেক উপরে এবং তিনি কোনোভাবেই তাঁর সৃষ্টির মধ্যে কিংবা তাঁর সৃষ্টি দ্বারা পরিবেষ্টিত নন।[১৯]

৫. হাদীস থেকে প্রমাণ

নাবি ﷺ এর হাদীসেও এমন অসংখ্য প্রমাণ রয়েছে যেগুলোর দ্বারা সুস্পষ্টভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় যে, আল্লাহ পৃথিবীতে বা তাঁর সৃষ্টির মাঝে বিরাজমান নন। কুর'আনের আয়াতের মতো হাদীসেও কিছু পরোক্ষ এবং কিছু প্রত্যক্ষ বর্ণনা রয়েছে। পরোক্ষ হাদীসগুলো হলো যেগুলোতে আল্লাহর পানে উর্ধ্বগামী ফেরেশতাদের কথা বলা হয়েছে। যেমন, আবু হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত হাদীসে আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন,

(১৭) সূরা আল-বাক্বারাহ, ২:২২৫
(১৮) সূরা আল-আলা; ৮৭:১
(১৯) আল-আক্বীদাহ্ আত্-ত্বাহাউইয়াহ্, পৃ. ২৮৫-৬।

www.QuranerAlo.net

"তোমাদের সাথে রাতে এক দল এবং দিনে আরেক দল ফেরেশতা থাকেন এবং উভয় দল আসর (সন্ধ্যায়) এবং ফাজরে (ভোরে) একত্রিত হন। তারপর যে ফেরেশতাগণ তোমাদের সাথে সারারাত ছিলেন, তাঁরা (আকাশ পানে) ঊর্ধ্বগামী হন এবং আল্লাহ তাদেরকে (তোমাদের সম্পর্কে) জিজ্ঞেস করেন—যদিও তিনি তোমাদের সম্পর্কে সবই জানেন..."(২০)

যেসব হাদীসে আল্লাহকে তাঁর আরশের উপর অধিষ্ঠিত এবং তাঁর আরশ সমস্ত কিছুর ঊর্ধ্বে অবস্থিত বলে উল্লেখ করা হয়েছে, সেগুলোও পরোক্ষ হাদীসের অন্তর্ভুক্ত। এর দৃষ্টান্ত হলো আবু হুরায়রা থেকে বর্ণিত একটি হাদীস, যাতে নাবি ﷺ বলেছেন,

"আল্লাহ সৃষ্টি কাজ সম্পন্ন করার পর, আরশের উপর (তাঁর কাছে রক্ষিত) একটি কিতাবে লিখে রাখলেন, নিশ্চয়ই আমার দয়া আমার ক্রোধের উপর বিজয়ী হবে।" (২১)

এ সম্পর্কিত প্রত্যক্ষ হাদীসের একটি উদাহরণ হলো নাবি ﷺ এর স্ত্রী যায়নাব বিনতে জাহ্‌শ (রা.) সম্পর্কিত একটি হাদীস। তিনি নাবি ﷺ এর অন্য স্ত্রীদের কাছে গর্ব করে বলতেন যে, নাবিজীর সাথে অন্য সকলের বিবাহ সম্পাদিত হয়েছিল তাদের পারিবারিক ব্যবস্থাপনায়; আর তার বিয়ের ব্যবস্থা হয়েছিল সপ্ত আকাশের উপরে।(২২)

এমন আরও একটি উদাহরণ রয়েছে সেই দুআর মধ্যে যা নাবি ﷺ পাঠের জন্য অসুস্থদের শিখিয়েছিলেন। আর সে দুআটি হলো,

رَبُّنَا اللهُ الَّذِي فِي السَّمَاءِ تَقَدَّسَ اسْمُكَ ...

(২০) বুখারি, (আরবি-ইংরেজি), খণ্ড ৯, পৃ. ৩৮৬-৭, হাদীস নং ৫২৫ এবং মুসলিম, (ইংরেজি অনুবাদ), খণ্ড ১, পৃ. ৩০৬-৭, হাদীস নং ১৩০৭ এবং নাসাঈ।

(২১) বুখারি, (আরবি-ইংরেজি), খণ্ড ৯, পৃ. ৩৮২-৩, হাদীস নং ৫১৮ এবং মুসলিম, (ইংরেজি অনুবাদ), খণ্ড ৪, পৃ. ১৪৩৭, হাদীস নং ৬৬২৮।

(২২) আনাস ﷺ থেকে বর্ণিত। বুখারি, (আরবি-ইংরেজি), খণ্ড ৯, পৃ. ৩৮২, হাদীস নং ৫১৭।

www.QuranerAlo.net

"আকাশের উপর অধিষ্ঠিত, হে আমাদের প্রতিপালক! মহান পবিত্র আপনার নাম..."(২৩)

এ সম্পর্কিত যতগুলো হাদীস্ আছে, সেগুলোর মধ্যে নিম্নোক্ত হাদীসটির বক্তব্য সম্ভবত সবচেয়ে স্পষ্ট। মুআবিয়া ইবনুল-হাকাম ﷺ বলেন,

"আমার একটি দাসী ছিল। উহুদ পাহাড় এলাকায়, আল-জাওয়ারিয়্যাহ্ নামক স্থানে সে আমার ভেড়া চরাত। একদিন আসতেই দেখলাম, তার পাল থেকে এক নেকড়ে একটা ভেড়া নিয়ে পালিয়েছে। সকল আদাম সন্তানের মতো আমারও যেহেতু রাগ-গোস্সার প্রবণতা ছিল, তাই আমি তার চেহারায় প্রচণ্ড একটা চড় মারলাম। আমি যখন এই ঘটনা আল্লাহর রসূলকে বললাম, তিনি এটাকে গুরুতর অন্যায় সাব্যস্ত করলেন। আমি বললাম, 'হে আল্লাহর রসূল! আমি কি তাকে মুক্ত করে দিতে পারি না?'(২৪) জবাবে তিনি বললেন, 'তাকে আমার কাছে নিয়ে এসো', তাই আমি তাকে তাঁর কাছে নিয়ে গেলাম। তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'আল্লাহ কোথায় আছেন?' সে উত্তর দিল, 'আকাশসমূহের উপরে।' তারপর তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'আমি কে?' সে উত্তর দিল, 'আপনি আল্লাহর রসূল।' তারপর রসূল ﷺ বললেন, 'তাকে মুক্ত করে দাও, কারণ নিশ্চয়ই সে (বিশ্বাসী) মু'মিনাহ্।'(২৫)

মানুষের ঈমান পরীক্ষা করার জন্য যে প্রশ্নটি করা স্বাভাবিক মনে হতে পারে তা হলো, "তুমি কি আল্লাহকে বিশ্বাস করো?" কিন্তু নাবি ﷺ সেই প্রশ্ন করেননি। কারণ সে সমাজের অধিকাংশ মানুষই আল্লাহকে বিশ্বাস করত, যা কুর'আনে বারবার উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন,

---

(২৩) সুনান আবি দাউদ, (ইংরেজি অনুবাদ), খণ্ড ৩, পৃ. ১০৯, হাদীস্ নং ৩৮৮৩।

(২৪) বুখারি, মুসলিম এবং আবু দাউদ, আবু হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত একটি হাদীস্ সংকলন করেছেন যাতে তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, "কাউকে আঘাত করতেই যদি হয়, মুখমণ্ডল বাদ দিয়ে করবে।" দেখুন : মুসলিম, (ইংরেজি অনুবাদ), খণ্ড ৪, পৃ. ১৩৭৮, হাদীস্ নং ৬৩২১-৬ এবং সুনান আবি দাউদ, (ইংরেজি অনুবাদ), খণ্ড ৩, পৃ. ১২৫৬, হাদীস্ নং ৪৪৭৮। আবু হুরায়রা ﷺ আরও বর্ণনা করেছেন যে, "কোনো গোলামকে চড় মারা কিংবা তাকে প্রহার করার কাফ্ফারা হলো তাকে মুক্ত করে দেওয়া।" সহীহ্ মুসলিম, (ইংরেজি অনুবাদ), খণ্ড ৩, পৃ. ৮৮২-৩, হাদীস্ নং ৪০৭৮।

(২৫) সহীহ্ মুসলিম. (ইংরেজি অনুবাদ), খণ্ড ১, পৃ. ২৭১-২, হাদীস্ নং ১০৯৪।

www.QuranerAlo.net

وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ

"যদি আপনি তাদেরকে প্রশ্ন করেন, কে মহাবিশ্ব ও পৃথিবীর সৃষ্টি করেছেন এবং চাঁদ ও সূর্যকে নিয়োজিত করেছেন? তারা অবশ্যই বলবে, আল্লাহ।"

(আল-আনকাবূত, ২৯:৬১)

মাক্কার মুশরিকরা বিশ্বাস করত যে, আল্লাহ কোনো না কোনোভাবে তাদের মূর্তিগুলোর মধ্যে উপস্থিত এবং সেই অর্থে, তিনি তাঁর সৃষ্টির অংশ। তাই নাবি ﷺ যাচাই করতে চেয়েছিলেন, মেয়েটির বিশ্বাস মাক্কার অন্যান্য মুশরিকদের ভ্রান্ত মতবাদে বিশ্বাসী নাকি বিশুদ্ধ তাওহীদে বিশ্বাসী। মূলত আল্লাহ তাঁর সৃষ্টির অংশ নন এবং সৃষ্টির উপাসনা করার মাধ্যমে তাঁর উপাসনা করা যায় না, একথা মেয়েটি বিশ্বাস করে কি না, তা যাচাই করার জন্যই নাবি ﷺ মেয়েটিকে ওই প্রশ্ন করেছিলেন। "আল্লাহ কোথায়?" প্রশ্নের উত্তরে মেয়েটি বলেছিল, "আল্লাহ আকাশসমূহের উপরে।" অতএব, সত্যিকার মুসলিমরা প্রশ্নটির এই উত্তরকেই একমাত্র সঠিক উত্তর হিসেবে গ্রহণ করতে বাধ্য। কারণ এই উত্তরের উপর ভিত্তি করেই নাবি ﷺ মেয়েটিকে মু'মিনাহ্ (বিশ্বাসী) হিসেবে রায় দিয়েছেন।

বর্তমানের কিছু মুসলিম আল্লাহর সর্বত্র বিরাজমান থাকার পক্ষে তর্ক করেন। আল্লাহ যদি তাদের দাবি অনুযায়ী সর্বত্র বিরাজমান থাকেন, তাহলে নাবি ﷺ মেয়েটির, "আকাশসমূহের উপরে" এই উত্তরটিকে শুধরে দিতেন। কারণ নাবি ﷺ এর উপস্থিতিতে যা কিছুই বলা হতো, তিনি যদি তা প্রত্যাখ্যান না করতেন, তবে সেটাই সুন্নাহ (তাক্‌রীরীয়্যাহ্) ইসলামি বিধানের অংশ বলে বিবেচিত। যাই হোক, নাবি ﷺ মেয়েটির বক্তব্যকে শুধু গ্রহণই করেননি; বরং তার উত্তরকে তার মু'মিনাহ্ হওয়ার ভিত্তি সাব্যস্ত করেছেন।

৬. যৌক্তিক প্রমাণ

যৌক্তিক বিশ্লেষণের মাধ্যমেও বিষয়টি সুস্পষ্ট। ধরা যাক, দুটি বস্তু ছাড়া আর কোনো কিছুর অস্তিত্ব নেই। এখন বস্তু দুটির ক্ষেত্রে দুই ধরনের ঘটনা ঘটতে পারেঃ

www.QuranerAlo.net

১. দুটির একটি হয় অপরটির অংশ এবং তার গুণ-বৈশিষ্ট্যের মতো তার উপর নির্ভরশীল হবে।

২. অথবা প্রথম বস্তুটি দ্বিতীয়টি থেকে সম্পূর্ণভাবে স্বতন্ত্র ও স্বাধীনভাবে অস্তিত্বশীল হবে।

একইভাবে, স্রষ্টা যখন মহাবিশ্ব সৃষ্টি করেছেন, তখন দুই ধরনের ঘটনা ঘটে থাকতে পারে। হয় তিনি এই মহাবিশ্বকে নিজের ভেতরে সৃষ্টি করেছেন, অথবা নিজের থেকে সম্পূর্ণ পৃথকভাবে সৃষ্টি করেছেন। প্রথম সম্ভাবনাটি অগ্রহণযোগ্য। কারণ এই সম্ভাবনার অর্থ দাঁড়ায়, অসীম সর্বোচ্চ সত্তা আল্লাহ নিজের মধ্যে অক্ষমতা এবং দুর্বলতা ধারণ করেন।

অতএব, আল্লাহ অবশ্যই মহাবিশ্বকে তাঁর বাইরে, স্বতন্ত্র কিন্তু বৈশিষ্ট্য দিয়ে সৃষ্টি করেছেন যা আবার তাঁর উপরই নির্ভরশীল। মহাবিশ্বকে নিজের থেকে পৃথক এবং স্বতন্ত্র সত্তা হিসেবে সৃষ্টি করার পর, তিনি তাকে হয় নিজের উর্ধ্বে নয়তো নীচে স্থান দিয়েছেন। যেহেতু অধঃস্থিত স্রষ্টার 'ইবাদাত করাকে মানব প্রকৃতি কখনো সমর্থন করে না এবং স্রষ্টার জন্য নীচে অবস্থান করাটা তাঁর মর্যাদা এবং সার্বভৌমত্বের সাথে সাংঘর্ষিক, তাই স্রষ্টা অবশ্যই তাঁর সৃষ্টির উর্ধ্বে এবং সৃষ্টি থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র।

স্রষ্টা এই মহাবিশ্বের সাথে সংযুক্তও নন, এর থেকে পৃথকও নন; কিংবা তিনি এই মহাবিশ্বের ভিতরেও নন, আবার এর বাইরেও নন[২৬]—এই ধরনের পরস্পর বিরোধী বক্তব্যের ব্যাপারে বলা যায়, এসব কথাবার্তা শুধু অযৌক্তিকই নয়; বরং এগুলো বলার মাধ্যমে স্রষ্টার সত্যিকার অস্তিত্বকেই অস্বীকার করা হয়।[২৭] এসব দাবি স্রষ্টাকে মানবীয় চিন্তার এমন এক পরাবাস্তব জগতে ঠেলে দেয়, যেখানে সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী দুই সত্তা পাশাপাশি থাকতে (co-exist) পারে এবং যেখানে অসম্ভবও সম্ভব। যেমন, স্রষ্টা তিনজন। তবে তাঁরা আসলে তিনজন নন; বরং একজন! ইত্যাদি।

---

(২৬) দেখুন : হাশিয়াহ্ আল-বিজুরি আলা আল-জাওহারাহ্, পৃ. ৫৮।

(২৭) আল-আক্বীদাহ্ আত-তাহাউইয়াহ্, পৃ. ২৯০-১। আরও দেখুন, আহ্মাদ ইব্ন হানবালের আর-রাদ্দ আলা আল-জাহমিয়্যাহ্।

www.QuranerAlo.net

৭. পূর্ববর্তী 'আলিমদের ঐকমত্য

পূর্ববর্তী বিশেষজ্ঞ 'আলিমগণ, স্রষ্টার ঊর্ধ্বে থাকাকে প্রমাণ করার লক্ষ্যে এত অধিক সংখ্যক বক্তব্য দিয়ে গেছেন যে, এই সংক্ষিপ্ত পরিসরে তার সবগুলোকে তুলে ধরা অসম্ভব। পঞ্চদশ শতকের হাদীস্ বিশেষজ্ঞ, ইমাম আয-যাহাবি 'আল-উলূ লিল-আলি আল-আযীম' শিরোনামে একটি বইও লিখেছিলেন। এই বইয়ে তিনি আল্লাহর ঊর্ধ্বে থাকাকে সুনিশ্চিতভাবে প্রমাণকারী অতীতের ২০০ জনেরও অধিক শীর্ষস্থানীয় 'আলিমের বক্তব্য সংকলন করেছিলেন।[২৯]

মুতী আল-বালাখি'র এক বর্ণনায় এই ধরনের বক্তব্যের একটি চমৎকার দৃষ্টান্ত খুঁজে পাওয়া যায়। তিনি ইমাম আবু হানীফা রহ. এর কাছে এমন ব্যক্তি সম্পর্কে তার রায় জানতে চেয়েছিলেন যে বলে, তার প্রতিপালক আকাশে না পৃথিবীতে— তা সে জানে না। উত্তরে তিনি বলেন, সে কুফ্‌রি করেছে, কারণ মহান আল্লাহ বলেছেন, "পরম করুণাময় আর্‌শের উপর আছেন" (ত্ব-হা, ২০:৫) এবং তাঁর আর্‌শ সপ্ত আকাশের ঊর্ধ্বে। তারপর আল-বালাখি জানতে চান, সে যদি বলে, স্রষ্টা আর্‌শে অধিষ্ঠিত; তবে সে জানে না, আর্‌শ আকাশে নাকি মাটিতে—তার বিধান কী? ইমাম আবু হানীফা রহ. উত্তরে বলেন, সে কুফ্‌রি করল, কারণ আল্লাহর আকাশসমূহের উপরে থাকার বিষয়টি সে অস্বীকার করেছে। আর একথা যে অস্বীকার করল, সে কুফ্‌রি করল।[৩০]

হানাফি মাযহাবের অনেক অনুসারীরা আজকাল আল্লাহ সর্বত্র বিরাজমান হওয়ার মতবাদে বিশ্বাস করলেও, তাদের জ্ঞানী-গুণী পূর্বসূরিরা কেউই এমন মত পোষণ করতেন না। বিশ্‌র আল-মুরাইসী[৩০] আল্লাহর আর্‌শে সমাসীন হওয়ার বিষয়টি অস্বীকার করলে ইমাম আবু হানীফা ﷺ-এর প্রধান ছাত্র ইমাম

---

(২৮) মুখতাসার আল-উলূ, পৃ. ৫।

(২৯) ঘটনাটি আবু ইসমাঈল আল-আনসারি তার আল-ফারূক বইয়ে উল্লেখ করেছেন যা আল আক্বীদাহ্ আত তাহাওয়িয়্যাহ্, পৃ. ২৮৮ –এ উদ্ধৃত করা হয়েছে।

(৩০) বাগদাদের অধিবাসী, বিশ্‌র (মৃত্যু ৮৩৩ সাল) একজন মুতাযিলা মতাদর্শের বিশিষ্ট ফাক্বীহ এবং দার্শনিক ছিলেন। (দেখুন : Al-Alam, Beirut: al-llm lil-Malayeen, 7th ed., 1984, vol. 2, পৃ. ৫৫ by Khairuddeen az-Zirikli).

www.QuranerAlo.net

আবু ইউসুফ তাকে তাওবা করতে বলেছিলেন। এই ঘটনার কথা ওই সময়ে লেখা এবং ওই সময় সম্পর্কে পরবর্তীতে লেখা বহু গ্রন্থে উল্লেখ আছে।[৩১]

সারসংক্ষেপ

অতএব, একথা নিশ্চিতভাবেই বলা যায় যে, ইসলামের মৌলিক ভিত্তি, আল্লাহর এককত্বের বিশুদ্ধ দর্শন অনুযায়ী,

১. আল্লাহ তাঁর সৃষ্টি থেকে সম্পূর্ণরূপে পৃথক।

২. তিনি কোনো প্রকারেই তাঁর সৃষ্টি দ্বারা পরিবেষ্টিত নন এবং কোনোভাবেই তাঁর সৃষ্টি তাঁর ঊর্ধ্বে নয়।

৩. তিনিই আল্লাহ, সমস্ত কিছুর ঊর্ধ্বে।

কুর'আন এবং সুন্নাহ অনুযায়ী এটিই হলো মহান আল্লাহ সম্পর্কে বিশুদ্ধ বিশ্বাস। এই বিশ্বাস খুবই সরল এবং সুদৃঢ়। এতে এমন কোনো ভুল বুঝাবুঝির সুযোগ নেই যা মানুষকে সৃষ্টির উপাসনার দিকে ঠেলে দেয়।

তবে এই অভিমতের দ্বারা এটা অস্বীকার করা হয় না যে, আল্লাহর ক্ষমতা ও গুণাবলি তাঁর সমগ্র সৃষ্টির মাঝে বিরাজমান। কেননা কোনো কিছুই তাঁর দৃষ্টি, জ্ঞান এবং ক্ষমতার বাইরে নয়। প্রযুক্তির উন্নতির কারণে আজ আমরা নিজ বাড়িতে আরাম কেদারায় বসে পৃথিবীর অন্য প্রান্তে কী ঘটছে তা দেখতে পাই। সৃষ্টির মধ্যে অবস্থান না করেও, আল্লাহ এই মহাবিশ্বের কোথায় কী ঘটছে তার সবকিছু পুঙ্খানুপুঙ্খ তাঁর মতো করে দেখেন, শোনেন এবং জানেন। ইব্ন 'আব্বাস ﷺ থেকে বর্ণিত রয়েছে যে, তিনি বলেন,

> "আল্লাহর হাতে সপ্ত আকাশ, সপ্ত পৃথিবী, এতে এবং এর মধ্যে যা কিছু রয়েছে তার উপমা তেমনই, তোমাদের হাতে একটি সরষে দানা যেমন।"[৩২]

---

(৩১) আব্দুর-রহমান ইব্ন আবি হাতিমসহ অন্যান্যদের থেকে বর্ণিত। দেখুন : আল-আক্বীদাহ আত্-ত্বাহাউইয়াহ, পৃ. ২৮৮।

(৩২) আল-আক্বীদাহ আত্-ত্বাহাউইয়াহ, পৃ. ২৮১।

www.QuranerAlo.net

হাত দিয়ে সুইচ টিপে চালানো টিভির চেয়ে রিমোট নিয়ন্ত্রিত প্রযুক্তিকে বিরাট অগ্রগতি বিবেচনা করা হয়; অথচ আল্লাহর ক্ষেত্রে এ ব্যাপারটি অনেকে বুঝতে পারে না। কোনো রকম বাধা-বিপত্তি ছাড়া আল্লাহর ক্ষমতা তাঁর সৃষ্টির ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কণিকার মধ্যেও প্রবলভাবে কার্যকর। এজন্য তাঁকে প্রতিটি কণিকার মধ্যে উপস্থিত থাকার প্রয়োজন নেই। সত্যি বলতে, সৃষ্টির মধ্যে আল্লাহর বিরাজমান থাকার ধারণা প্রকৃত অর্থেই তাওহীদ আল-আসমা' ওয়াস-সিফাত সংশ্লিষ্ট এক প্রকার শির্ক। এর মাধ্যমে মানবীয় দুর্বলতাকে মহান আল্লাহর উপর আরোপ করা হয়। পৃথিবীতে কী ঘটছে তা দেখা, শোনা, জানা এবং সেগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য পৃথিবীতে উপস্থিত থাকাটা নিতান্তই মানবীয় বৈশিষ্ট্য।

তাছাড়া আল্লাহর জ্ঞান ও ক্ষমতার কোনো সীমা পরিসীমা নেই। মানুষের মনের মধ্যে যা কিছু রয়েছে তা আল্লাহর কাছে একেবারেই স্পষ্ট। এমনকি তার হৃদয়ের আবেগ অনুভূতিগুলোও আল্লাহর নিয়ন্ত্রণাধীন। এ কথার আলোকেই কুর'আনের ওইসব আয়াতের অর্থ বুঝতে হবে যেগুলোতে আল্লাহর নৈকট্য বা সান্নিধ্য সম্পর্কে ইঙ্গিত করা হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, আল্লাহ ﷻ বলেছেন,

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ ۖ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ ﴿١٦﴾

"আর আমিই মানুষকে সৃষ্টি করেছি এবং তার প্রবৃত্তি তাকে যে কুমন্ত্রণা দেয় তাও জানি। আমি তার গলার ধমনী হতেও অধিক নিকটবর্তী।" (কুফ, ৫০:১৬)

আল্লাহ ﷻ আরও বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ ۖ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿٢٤﴾

www.QuranerAlo.net

"হে মু'মিনগণ! তোমরা আল্লাহ ও রসূলের ডাকে সাড়া দাও, যখন তিনি তোমাদের আহ্বান করেন এমন কিছুর প্রতি, যা তোমাদের জীবন দান করে। জেনে রেখো, নিশ্চয়ই আল্লাহ মানুষ ও তার হৃদয়ের মাঝে অন্তরায় হন। আর নিশ্চয় তাঁর নিকট তোমাদের সমবেত করা হবে।" (আল-আনফাল, ৮:২৪)

উল্লিখিত আয়াতগুলোর এই অর্থ গ্রহণ করা যাবে না যে, আল্লাহ মানুষের শরীরের মধ্যে মানুষের গলার ধমনীর চেয়েও কাছে অবস্থান করেন; কিংবা মানুষের হৃদযন্ত্রের মধ্যে অবস্থান করে তিনি মানুষের মনের অবস্থা পরিবর্তন করে থাকেন। আয়াতগুলোর সরল অর্থ হলো, কোনো কিছুই আল্লাহর জ্ঞানের বাইরে যেতে পারে না; এমনকি অন্তরের অন্তঃস্থলে মানুষ যা কল্পনা করে আল্লাহ সে সম্পর্কেও সম্যক অবহিত। কোনো কিছুই তাঁর ক্ষমতা ও নিয়ন্ত্রণের বাইরে নয়; এমনকি মানুষের হৃদয়ের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অনুভূতিগুলোও নয়। যেমনটি আল্লাহ ﷻ বলেছেন,

أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴿٧٧﴾

"তারা কি জানে না যে, তারা যা গোপন করে এবং যা প্রকাশ করে, তা আল্লাহ জানেন?" (আল-বাক্বারাহ, ২:৭৭)

... وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا....

"(স্মরণ করো) যখন তোমরা পরস্পরের শত্রু ছিলে। তারপর আল্লাহ তোমাদের অন্তরে ভালোবাসার সঞ্চার করেছেন। অতঃপর তাঁর অনুগ্রহে তোমরা ভাই-ভাই হয়ে গেলে..." (আলি ইমরান ৩:১০৩)

অধিকন্তু, নাবি ﷺ নিম্নোক্ত কথাগুলো বলে দুআ করতেন,

يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ ثَبِّتْ قَلْبِي عَلَى دِينِكَ

www.QuranerAlo.net

"হে হৃদয়সমূহের পরিবর্তনকারী! আমার হৃদয় আপনার দীনের উপর সুদৃঢ় রাখুন।"(৩৩)

অনুরূপ একটি আয়াত হলোঃ

...مَا يَكُونُ مِن نَّجْوَىٰ ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنَىٰ مِن ذَٰلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا...

"...তিনজনের কোনো গোপন পরামর্শ হয় না, যাতে চতুর্থজন হিসেবে আল্লাহ থাকেন না; আর পাঁচজনেরও হয় না, যাতে ষষ্ঠজন হিসেবে তিনি থাকেন না। এর চেয়ে কম হোক কিংবা বেশি হোক, তিনি তো তাদের সঙ্গেই আছেন।..." (আল-মুজাদালা, ৫৮:৭)

এই আয়াতের অর্থও প্রসঙ্গ অনুযায়ী বুঝতে হবে। এক্ষেত্রে আয়াতটির পূর্বের অংশের বক্তব্য হলোঃ

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ...

"তুমি কি লক্ষ্য করোনি যে, আকাশসমূহ ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে নিশ্চয়ই আল্লাহ তা জানেন...।" (আল-মুজাদালা, ৫৮:৭)

এবং আয়াতটির শেষাংশের বক্তব্য হলো,

...ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٧﴾

"... তারপর কিয়ামাতের দিন তিনি তাদেরকে তাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে জানিয়ে দেবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ সকল বিষয়ে জ্ঞান রাখেন।" (আল-মুজাদালা, ৫৮:৭)

---

(৩৩) তিরমিযি কর্তৃক সংকলিত এবং শাইখ আল-আলবানি কর্তৃক সহীহ সাব্যস্ত করেছেন। সহীহ সুনান তিরমিযি, খণ্ড ৩, পৃ. ১৭১, হাদীস নং ২৭৯২।

www.QuranerAlo.net

Contents

এখন সুস্পষ্ট যে, উল্লিখিত আয়াতে আল্লাহ তাঁর জ্ঞানের কথা উল্লেখ করেছেন এবং তিনি বোঝাননি যে, তাঁর সুমহান সর্বোচ্চ সত্তা মানুষের মাঝে উপস্থিত। কারণ তিনি তাঁর সৃষ্টির উর্ধ্বে এবং বাইরে।(৩৪)

নিম্নোক্ত কথাগুলো নাবি ﷺ এর হাদীস্ বলে বর্ণনা করা হয়,

"এত বিশাল আকাশ-পৃথিবী আল্লাহকে ধারণ করতে পারে না। তবে সত্যিকার মু'মিনের হৃদয় তাঁকে ধারণ করে।"

হাদীস্ হিসেবে একথাগুলো একেবারেই প্রমাণিত নয়। যদি বাহ্যিক অর্থেও গ্রহণ করা হয়, তারপরও কথাগুলো থেকে বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন কোনো মানুষ এই সিদ্ধান্তে আসতে পারে না যে, মানুষের মধ্যে আল্লাহ আছেন। মু'মিনের হৃদয় যদি আক্ষরিক অর্থেই আল্লাহকে ধারণ করে এবং আকাশ ও পৃথিবী সেই মু'মিনকে ধারণ করে, তাহলে আকাশ ও পৃথিবীই তো মূলত আল্লাহকেই ধারণ করল। কারণ 'ক' যদি 'খ' এর মধ্যে থাকে এবং 'খ' থাকে 'গ' এর মধ্যে, তাহলে 'ক' অনিবার্যভাবেই 'গ' এর মধ্যে আছে।

অতএব, কুর'আন ও নাবি ﷺ এর সহীহ্ সুন্নাহর ভিত্তিতে, ইসলামের বিশুদ্ধ দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী, আল্লাহ ﷻ মহাবিশ্ব এবং এর মধ্যস্থিত যা কিছু আছে তার সবকিছুর উর্ধ্বে। তাঁর এই বৈশিষ্ট্য শুধুমাত্র তাঁর সুমহান মর্যাদার সাথেই সামঞ্জস্যশীল। তিনি কোনোভাবেই তাঁর সৃষ্টির মধ্যে নন এবং তাঁর সৃষ্টিও তাঁর মধ্যে নয়। তবে তাঁর অসীম জ্ঞান, দয়া এবং ক্ষমতা কোনোরূপ বিঘ্ন ছাড়াই তাঁর সৃষ্টির প্রতিটি অণু-পরমাণুতে কার্যকর।(৩৫)

---

(৩৪) Ahmad ibn-Husain al-Bayhaqi, Kitab al-Asma' was-Sifat, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmeeyah, 1st ed., 1984, পৃ. ৫৪১-২).

(৩৫) Umar al-Ashqar, al-Aqidah fi Allah, (Kuwait: Maktabah al-Falah, 2nd ed., 1979, পৃ. ১৭১).

www.QuranerAlo.net

নবম অধ্যায়

আল্লাহর দর্শন লাভ

আল্লাহর প্রতিচ্ছবি

সৃষ্টিগতভাবেই মানুষের চিন্তাশক্তির একটা সীমারেখা রয়েছে, সে কখনো এর বাইরে যেতে পারে না। অন্য দিকে মহান আল্লাহ হলেন অসীম। সুতরাং আল্লাহ তাঁর যেসব বৈশিষ্ট্য এবং গুণাবলি মানুষের কাছে প্রকাশ করেছেন, সেগুলো ছাড়া মানুষ আল্লাহ সম্পর্কে নিজে থেকে অন্যকিছু জানার বা বুঝার আশা করতে পারে না। মানুষ যদি মনের মধ্যে আল্লাহর ছবি কল্পনা করার চেষ্টা করে, তাহলে অনিবার্যভাবে সে ভুল করবে। কারণ মানুষ কল্পনা করতে পারে এমন সবকিছু থেকেই মহান আল্লাহ স্বতন্ত্র। স্রষ্টার যে প্রতিচ্ছবিই মানুষ কল্পনা করুক, তা হবে সৃষ্টির কোনো অংশ অথবা সে দেখেছে এমন বিভিন্ন সৃষ্টির কোনো সমন্বিত রূপ। তাই আল্লাহর প্রতিচ্ছবি কল্পনা করতে গেলে মানুষ অনিবার্যভাবেই আল্লাহর উপর তাঁর সৃষ্টির বৈশিষ্ট্য আরোপ করে বসবে।

তবে নিজের বুদ্ধিমত্তা ও আবেগ অনুভূতির মাধ্যমে আল্লাহর কিছু বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলিকে অনুধাবন করা মানুষের পক্ষে সম্ভব। এ কারণেই আল্লাহ তাঁর কিছু গুণ-বৈশিষ্ট্য মানুষের কাছে প্রকাশ করেছেন। উদাহরণস্বরূপ, 'আল-কাদির' বা সর্বশক্তিমান। এই গুণবাচক নামটির তাৎপর্য হলো, এমন কোনোকিছু নেই যা আল্লাহ করতে সক্ষম নন। অনুরূপভাবে, 'আর-রহমান' বা পরম করুণাময়। অর্থাৎ, কেউ আল্লাহর করুণা লাভের যোগ্য হোক আর না-ই হোক, সৃষ্টিতে এমন কিছু নেই যা তাঁর করুণা পেয়ে ধন্য হয়নি। এ ধরনের উপলব্ধি করার সময় মনের মধ্যে কোনো ছবি ভেসে ওঠে না। এ সীমারেখার ভেতরে থেকেই মানুষের মন আল্লাহকে সঠিকভাবে বুঝতে

www.QuranerAlo.net

পারে। এ সম্পর্কে বিভ্রান্ত উপলব্ধিই ছিল নাবি ঈসা ﷺ এর শিক্ষা থেকে বিচ্যুত হওয়ার অন্যতম কারণ। ইউরোপীয়দের যারা খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করেছিল, তারা তাদের গির্জা এবং মাজারগুলোতে মানুষের আকৃতি বিশিষ্ট স্রষ্টার ছবি এবং প্রতিকৃতি স্থাপন করেছিল। এই মূর্তি দেখতে লম্বা সাদা দাড়িওয়ালা একজন বৃদ্ধ ইউরোপীয় যাজকের মতো। ফিলিস্তিনের প্রথম যুগের খ্রিস্টানরা ছিল ইহুদি আদর্শের অনুসারী। সেখানে চিত্রের মাধ্যমে স্রষ্টাকে তুলে ধরা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ ছিল। কিন্তু দেবতাদেরকে মানবীয় আকৃতিতে তুলে ধরার সুদীর্ঘ কালের ঐতিহ্য এবং বিকৃত ইহুদি ধর্মগ্রন্থের উপর নির্ভরতার কারণে ইউরোপীয়রা এক্ষেত্রে বিপথগামী হয়ে যায়। তাওরাতের প্রথম অধ্যায়, 'জেনেসিস' এর মধ্যে মানুষ সৃষ্টির ব্যাপারে ইহুদিরা নীচের কথাগুলো লিখে রেখেছে।

"পরে ঈশ্বর বললেন, আমরা আমাদের প্রতিমূর্তিতে, আমাদের সাদৃশ্যে মানুষ সৃষ্টি করি; তাই ঈশ্বর আপনার প্রতিমূর্তিতে তাকে সৃষ্টি করলেন, ঈশ্বরের প্রতিমূর্তিতেই তাকে সৃষ্টি করলেন।" (১:২৬-২৭)

এ ধরনের বিভিন্ন বক্তব্য থেকেই প্রথম যুগের ইউরোপীয় খ্রিস্টানরা সিদ্ধান্তে এসেছিল যে, ধর্মগ্রন্থের শিক্ষা অনুযায়ীই স্রষ্টা দেখতে মানুষের মতো, ঠিক যে অলীক কল্পনার ভিত্তিতে তারা ইতিপূর্বে তাদের বিভিন্ন দেবতাদের চিত্রিত করেছে। ফলে তারা মূর্তি এবং চিত্রের মাধ্যমে স্রষ্টাকে চিত্রিত করার জন্য বহু সময়, শ্রম এবং সম্পদ ব্যয় করেছে।

স্রষ্টাকে মানুষের আকৃতিতে উপস্থাপন করার প্রচলন আগে থেকেই বেশ ব্যাপক। অথচ তাঁর বিধান মানুষকে শেখায় যে, তিনি কখনোই তাঁর সৃষ্টির মতো নন। কিন্তু যখনই মানুষ আল্লাহর দীন থেকে বিচ্যুত হয়েছে, তখনই সে সৃষ্টির উপাসনায় লিপ্ত হয়েছে। আর সৃষ্টির উপাসনা করতে গিয়ে সে স্রষ্টাকে মানবীয় আকৃতিতে উপস্থাপন করেছে। অন্য সব প্রাণী রেখে মানুষের আকৃতি বেছে নেওয়ার কারণ হলো, পৃথিবীতে বসবাসকারী প্রাণীদের মধ্যে মানুষই সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বোত্তম। উদাহরণস্বরূপ, চৌ বংশের শাসনামল (১০২৭ খ্রিস্টপূর্ব – ৪০২ সাল) থেকে চীনে রাষ্ট্রীয়ভাবে বিমূর্ত দেবতা 'T'ien' (তি'য়েন)-কে উপাসনার কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত করা হয়। অথচ তার মূর্তি নির্মাণ করা হয় জেড সম্রাট, 'Yu Huang' (ইউ হুয়াং)

www.QuranerAlo.net

এর আকৃতি দিয়ে। চীনা লোকগাথা অনুযায়ী এই সম্রাট স্বর্গের অধিপতি, সর্বোচ্চ প্রভু।(১)

কুর'আনে আল্লাহ খুব স্পষ্ট করে বলে দিয়েছেন যে, আমরা কল্পনা করতে পারি এমন কোনোকিছুর মতোই তিনি নন। আল্লাহ ﷻ বলেছেন,

...لَيْسَ كَمِثْلِهِۦ شَىْءٌ ۖ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ﴿١١﴾

"তাঁর মতো কিছুই নেই, আর তিনি সবকিছু শোনেন ও দেখেন।"

(আশ-শূরা, ৪২:১১)

এবং

وَلَمْ يَكُن لَّهُۥ كُفُوًا أَحَدٌۢ ﴿٤﴾

"আর তাঁর কোনো সমকক্ষও নেই।" (আল-ইখলাস, ১১২:৪)

নাবি মূসা ﷺ আল্লাহকে দেখতে চেয়েছিলেন।

তিনি তাঁর সৃষ্টির মতো নন সে কথা স্পষ্ট করার পর আল্লাহ আমাদের আরও জানিয়ে দিয়েছেন যে, আমাদের দৃষ্টিশক্তি তাঁকে দেখতে সক্ষম নয়। আল্লাহ ﷻ বলেছেন,

لَّا تُدْرِكُهُ ٱلْأَبْصَٰرُ وَهُوَ يُدْرِكُ ٱلْأَبْصَٰرَ ۖ ...

"চক্ষুসমূহ তাঁকে আয়ত্ত করতে পারে না। তবে তিনি সকল চক্ষুসমূহকে ঠিকই আয়ত্ত করেন।..." (আল-আনআম, ৬:১০৩)

এই আয়াত স্পষ্ট করে দেয় যে, মানুষ মহান আল্লাহকে দেখতে অক্ষম।

বিষয়টিকে আরও সুস্পষ্ট করার জন্য, মহান আল্লাহ কুর'আনে নাবি মূসা ﷺ এর জীবন থেকে একটি প্রাসঙ্গিক ঘটনার বর্ণনা করেছেনঃ

---

(১) Dictionary of Religions, পৃ. ৮৫.

www.QuranerAlo.net

وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ ۚ قَالَ لَن تَرَانِي وَلَٰكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي ۚ فَلَمَّا تَجَلَّىٰ رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا ۚ فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٤٣﴾

"যখন আমার নির্ধারিত সময়ে মূসা এসে গেল এবং তার রব তার সাথে কথা বললেন। সে বলল, হে আমার রব! আপনি আমাকে দর্শন দিন, আমি আপনাকে দেখব। তিনি বললেন, তুমি (এই পৃথিবীতে) কখনো আমাকে দেখতে পারবে না। বরং তুমি পাহাড়ের দিকে তাকাও, অতঃপর তা যদি নিজ স্থানে স্থির থাকে, তবে তুমি আমাকে দেখতে সক্ষম হবে। অতঃপর যখন তার রব পাহাড়ের উপর নূর প্রকাশ করলেন, তখন তা তাকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিল এবং মূসা বেহুঁশ হয়ে পড়ে গেল। অতঃপর যখন তার হুঁশ এলো, তখন সে বলল, আপনি মহান পবিত্র, আমি আপনার নিকট তাওবা করলাম এবং আমি মু'মিনদের মধ্যে প্রথম।" (আল আরফ; ৭:১৪৩)

নাবি মূসা ﷺ হয়তো ভেবেছিলেন, আল্লাহ যেহেতু সকল মানুষের মধ্য থেকে তাকে নাবি হিসেবে নির্বাচিত করেছেন, তাই তিনি আল্লাহকে দেখতে পাবেন।[২] কিন্তু আল্লাহ সুস্পষ্টভাবে জানিয়ে দেন যে, কারও পক্ষেই আল্লাহকে দেখা সম্ভব নয়। আল্লাহর জ্যোতির তীব্রতা সহ্য করাই কোনো মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। অথচ তাঁর জ্যোতি তাঁর অসীম সত্তার চেয়ে অনেক কম।[৩] যখন পাহাড় ফেটে চৌচির হয়ে গেল, নাবি মূসা ﷺ তার ভুল বুঝতে পারলেন এবং যা চাওয়ার অনুমতি নেই, তা চাওয়ার জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করলেন।

(২) সূরা আল-আরাফ, ৭:১৪৪
(৩) আল-আক্বীদাহ্ আত-তাহায়িয়্যাহ্, পৃ. ১৯১।

www.QuranerAlo.net

নাবি মুহাম্মাদ ﷺ কি আল্লাহকে দেখেছিলেন?

মুসলিমদের অনেকেরই ধারণা হলো, শেষ নাবি মুহাম্মাদ ﷺ এর ক্ষেত্রে উল্লিখিত নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটেছিল। কেননা তাঁকে আল্লাহ সপ্ত আকাশ ভেদ করে এমন এক সীমানা পর্যন্ত ভ্রমণ করিয়েছিলেন যেখানে ফেরেশতাদেরও যাওয়ার অনুমতি নেই। অথচ নাবি ﷺ এর স্ত্রী, আইশাহ ﵂ এর কাছে মাসরুক ﵀ যখন জানতে চেয়েছিলেন, নাবি ﷺ তাঁর রবকে দেখেছেন কি না, তখন তিনি উত্তরে বলেন,

> "তুমি যা জানতে চেয়েছ তার কারণে আমার শরীরে কাঁটা দিয়ে উঠছে! যে বলবে মুহাম্মাদ ﷺ তাঁর প্রতিপালককে দেখেছেন, সে অবশ্যই মিথ্যা বলল!"(৪)

তাছাড়া নাবি ﷺ আল্লাহকে দেখেছেন কিনা এ ব্যাপারে আবু যার ﵁ নাবি ﷺ এর কাছে জানতে চাইলে তিনি উত্তরে বলেছিলেন,

> "সেখানে ছিল শুধুই জ্যোতি, আমি কীভাবে তাঁকে দেখতে পারতাম!"(৫)

অন্য এক ঘটনায় নাবি ﷺ এই জ্যোতির তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে বলেছেন, ওই জ্যোতিই স্বয়ং আল্লাহ নন। তিনি বলেন,

> "নিশ্চয়ই আল্লাহ নিদ্রা যান না, আর নিদ্রা তাঁর জন্য শোভনীয়ও নয়। তিনিই কিস্ত বা ইনসাফের মানদণ্ড হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটান। তাঁর নিকট রাতের পূর্বেই দিনের সকল আমল উত্থিত হয় এবং দিনের পূর্বেই রাতের আমল উত্থিত হয়। জ্যোতি হলো তাঁর আচ্ছাদন।"(৬)

অতএব এটা নিশ্চিত করেই বলা যায় যে, পূর্ববর্তী নাবিগণের মতো নাবি মুহাম্মাদ ﷺ নিজেও তাঁর জীবদ্দশায়, জাগ্রত অবস্থায় আল্লাহ ﷻকে দেখেননি। তাই যারা এই জীবনে আল্লাহকে চাক্ষুষ দেখেছে বলে দাবি করে তাদের সকলের দাবিই মিথ্যা। সমগ্র মানবজাতির মধ্য থেকে আল্লাহ যাদেরকে তাঁর নাবি হিসেবে মনোনীত করেছিলেন, সেই নাবিগণই যদি

(৪) সহীহ্ মুসলিম, (ইংরেজি অনুবাদ), খণ্ড ১, পৃ. ১১১-২৩, হাদীস্ নং ৩৩৭ এবং ৩৩৯।
(৫) সহীহ্ মুসলিম, (ইংরেজি অনুবাদ), খণ্ড ১, পৃ. ১১৩, হাদীস্ নং ৩৪১।
(৬) আবু মুসা আল-আশআরি ﵁ থেকে বর্ণিত। সহীহ্ মুসলিম, (ইংরেজি অনুবাদ), খণ্ড ১, পৃ. ১১৩, হাদীস্ নং ৩৩৪।

www.QuranerAlo.net

আল্লাহকে দেখতে সক্ষম না হন, তাহলে অন্য কোনো মানুষ, সে যতই সৎকর্মশীল হোক না কেন, কীভাবে আল্লাহকে দেখতে পারে? আল্লাহকে দেখতে পাওয়ার দাবি করা মূলত একটা ঈমান বিধ্বংসী এবং কুফ্‌রি বক্তব্য। কারণ এ দাবি ইঙ্গিত করে যে, সে নাবিদের চেয়েও শ্রেষ্ঠ।

শয়তান নিজেকে আল্লাহ বলে দাবি করে

সুফি সাধকদের মধ্য থেকে যারা আল্লাহকে দেখেছে বলে দাবি করে, তারা কিছু একটা নিশ্চয়ই দেখেছে। আল্লাহকে দেখার অভিজ্ঞতা বর্ণনা করতে গিয়ে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তারা চোখ ধাঁধানো আলোর জ্যোতি এবং অনেক ক্ষেত্রে অতীন্দ্রিয় সত্তার বর্ণনা দিয়ে থাকে। তবে এসব অভিজ্ঞতা লাভের পর এদের অনেকে 'ইবাদাত করা ছেড়ে দেয়। এতে স্পষ্টভাবে বুঝা যায় যে, তারা শয়তানের ফাঁদে পড়ে গেছে। তাদের দাবি, সাধারণ মানুষের মতো তাদের শারঈ বিধিবিধান পালনের প্রয়োজন নেই। কারণ আধ্যাত্মিক দিক থেকে তারা সাধারণ মানুষের থেকে অনেক উপরে উঠে গেছে। শাইখ আব্দুল-কাদির আল-জিলানী (১০৭৭-১১৬৬ সাল)—যার নামানুসারে কাদিরি সুফি তরিকার নামকরণ করা হয়েছে—তাঁর নিজ জীবনের এমনই এক ঘটনার বর্ণনা দিয়েছেন। যারা আল্লাহকে দেখেছে বলে দাবি করেছে তার এই ঘটনা তাদের জন্য এক চমৎকার উদাহরণ। আল্লাহকে দেখার পর তারা কী কারণে ইসলামি বিধিবিধান পরিত্যাগ করে, তার ব্যাখ্যাও রয়েছে এই ঘটনায়। তিনি বলেন,

"আমি একদিন গভীরভাবে 'ইবাদাতে নিমগ্ন ছিলাম। হঠাৎ করেই আমি আমার সামনে এক প্রকাণ্ড সিংহাসন দেখতে পেলাম যার চারপাশে ছিল অত্যুজ্জ্বল আলোর বিচ্ছুরণ। তারপর এক বজ্রকণ্ঠ আমার কর্ণকুহর বিদীর্ণ করল—'হে আব্দুল-কাদির, আমি তোমার রব! সবার জন্য আমি যা নিষিদ্ধ করেছি, তোমার জন্য তা বৈধ করে দিলাম।' আব্দুল-কাদির জানতে চাইলেন, 'তুমি কি সেই আল্লাহ, যিনি ব্যতীত সত্য কোনো উপাস্য নেই?' যখন কোনো উত্তর এলো না, তখন তিনি বললেন, 'দূর হয়ে যাও, আল্লাহর শত্রু!' মুহূর্তেই সেই আলোর আভা অদৃশ্য হয়ে গেল এবং অন্ধকার তাকে

www.QuranerAlo.net

ছেয়ে ফেলল। তারপর সেই কণ্ঠ বলল, 'আবদুল-কাদির, তোমার দীনের জ্ঞানের কারণে তুমি আমার কৌশলকে পরাজিত করতে সক্ষম হয়েছ। এই কৌশলে সত্তরেরও অধিক সুফি সাধককে আমি বিপথগামী করতে পেরেছি।' পরবর্তীতে লোকেরা আবদুল-কাদিরের কাছে জানতে চাইল যে তিনি কীভাবে বুঝলেন, সে শয়তান ছিল। তিনি উত্তরে বলেন, 'আমি তার দাবি থেকেই বুঝতে পেরেছিলাম যে, সে শয়তান। কারণ আমি জানতাম, নাবি ﷺ এর উপর অবতীর্ণ প্রত্যাদেশ কখনো বাতিল বা পরিবর্তিত হতে পারে না। সে যে শয়তান আমি তা আরও ভালোমতো উপলব্ধি করলাম, যখন বলল, সে আমার রব অথচ স্বীকার করতে পারল না যে, সে ওই আল্লাহ যার কোনো শরিক নেই।"[৭]

একইভাবে অনেক লোক বলেছে, তারা কাবা কিংবা কাবার চারপাশে নিজেদেরকে প্রদক্ষিণ করতে দেখেছে। অনেকে বলেছে, তাদের সামনে বিশালাকৃতির সিংহাসন পেতে রাখা হয়েছে যার উপর এক জ্যোতির্ময় সত্তা উপবিষ্ট এবং অসংখ্য মানুষ তার চারপাশে প্রদক্ষিণ করছে। তারা এই মানুষগুলোকে ফেরেশতা এবং সেই জ্যোতির্ময় সত্তাকে আল্লাহ মনে করেছে। তবে প্রকৃত সত্য হলো, সেটা ছিল শয়তান ও তার অনুসারীরা।[৮]

ফলে নিশ্চিতভাবেই এ সিদ্ধান্তে আসা যায় যে, স্বপ্নেই হোক কিংবা বাস্তবেই হোক, আল্লাহকে নির্দিষ্ট কোনো সূরতে দেখার দাবিসমূহের ভিত্তি হলো শয়তান তাড়িত এক আবেগ প্রবণ মানসিক অবস্থা। এই ধরনের অবস্থায়, শয়তান জ্যোতির্ময় আলোর রূপ ধারণ করে এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির কাছে নিজেকে প্রভু বলে দাবি করে। তাওহীদের বিশুদ্ধ জ্ঞান না থাকায় তারা শয়তানের দাবিকে সত্য মনে করে এবং পথভ্রষ্ট হয়।

---

(৭) Ibn Taymeeyah, at-Tawassul wal-Wasilah, (Riyadh: Dar al-Ifta, 1984, পৃ. ২৮).

(৮) Ibn Taymeeyah, at-Tawassul wal-Wasilah, (Riyadh: Dar al-Ifta, 1984, পৃ. ২৮).

www.QuranerAlo.net

সূরা আন-নাজ্‌ম এর তাৎপর্য

কিছু লোক[৯] তাদের দাবির সমর্থনে সূরা আন-নাজ্‌মের নিম্নোক্ত আয়াতগুলো ব্যবহার করে বলেন যে, নাবি মুহাম্মাদ ﷺ আল্লাহকে দেখেছেন।

وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ ﴿٧﴾ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ ﴿٨﴾ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ
أَدْنَىٰ ﴿٩﴾ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ ﴿١٠﴾ مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ
﴿١١﴾ أَفَتُمَارُونَهُ عَلَىٰ مَا يَرَىٰ ﴿١٢﴾ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ ﴿١٣﴾ عِندَ
سِدْرَةِ الْمُنتَهَىٰ ﴿١٤﴾

"তখন তিনি সর্বোচ্চ দিগন্তে। তারপর তিনি নিকটবর্তী হলেন, অতঃপর আরও কাছে এলেন। তখন সে নৈকট্য ছিল দু'ধনুকের পরিমাণ, অথবা তারও কম। অপঃপর তিনি তাঁর বান্দার প্রতি যা ওয়াহ্‌য়ি করার তা ওয়াহ্‌য়ি করলেন। তিনি যা দেখেছেন, অন্তঃকরণ সে সম্পর্কে মিথ্যা বলেনি। তিনি যা দেখেছেন, সে সম্পর্কে তোমরা কি তাঁর সাথে বিতর্ক করবে? আর তিনি তো তাঁকে আরেকবার দেখেছিলেন। সিদ্‌রাতুল মুন্‌তাহার নিকট।" (আন-নাজ্‌ম, ৫৩:৭-১৪)

লোকেরা বলে, উল্লিখিত আয়াতগুলোতে আল্লাহর সাথে নাবি মুহাম্মাদ ﷺ এর দেখা হওয়ার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। অথচ মাসরুক যখন উম্মুল মু'মিনীন আইশাহ ﵂ কে আয়াতগুলো সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন, তখন তিনি উত্তর দিয়েছিলেন,

> "আমিই এই উম্মাহর প্রথম ব্যক্তি যে আল্লাহর রসূলকে এই বিষয়ে প্রশ্ন করেছিল এবং তিনি উত্তরে বলেছিলেন, 'নিশ্চয়ই তিনি ছিলেন জিব্‌রীল ﵇। তাঁকে যে আকৃতিতে সৃষ্টি করা হয়েছে সেই আকৃতিতে আমি তাঁকে এই দুইবার ছাড়া

(৯) এই মত পোষণকারীদের মধ্যে রয়েছেন ইমাম আন-নাওয়াউই (রহিমাহুল্লাহ) যিনি সহীহ্‌ মুসলিমের ধারাভাষ্যে (খণ্ড ৩, পৃ. ১২) এমন মত ব্যক্ত করেছেন। [দেখুন : Sharh Kitab at-Tawhid min Sahih Bukhari, (Madinah: Maktabah ad-Dar, 1985), পৃ. ১১৫-৬, by Abdullah Al-Ghunaiman.]

www.QuranerAlo.net

আর কখনোও দেখিনি। আমি তাঁকে আকাশ হতে অবতরণ করতে দেখেছি এবং তাঁর আকৃতির বিশালতা আকাশ ও পৃথিবীর সবকিছুকে ছেয়ে ফেলেছিল।"

অতঃপর আইশাহ ﵂ মাসরুককে বলেন, "তুমি কি শোননি যে, আল্লাহ ﷻ বলেছেন,

"চক্ষুসমূহ তাঁকে আয়ত্ত করতে পারে না; তবে তিনি চক্ষুসমূহকে আয়ত্ত করেন। তিনি সূক্ষ্মদর্শী, সম্যক অবহিত?"(১০)

এছাড়াও তুমি কি শোননি যে, আল্লাহ ﷻ বলেছেন,

"কোনো মানুষের এ মর্যাদা নেই যে, আল্লাহ তার সাথে সরাসরি কথা বলবেন; ওয়াহ্‌য়ির মাধ্যম, পর্দার আড়াল অথবা কোনো দূত (ফেরেশতা) পাঠানো ছাড়া।"(১১) (১২)

সুতরাং, নাবি ﷺ এর নিজের ব্যাখ্যা অনুযায়ী সূরা আন-নাজ্‌মের উল্লিখিত আয়াতগুলো যখন ব্যাখ্যা করা হয়, তখন সেগুলো কোনোভাবেই এই ভ্রান্ত বিশ্বাসকে সমর্থন করে না যে, নাবি মুহাম্মাদ ﷺ আল্লাহকে দেখেছেন।(১৩)

আল্লাহকে দেখতে না পাওয়ার পেছনে প্রজ্ঞা

মহান স্রষ্টাকে যদি এই জীবনে দেখা যেত, তাহলে এই জীবনের পরীক্ষাগুলোর কোনো অর্থই থাকত না। যে বিষয়টি এই জীবনকে সত্যিকার একটি পরীক্ষায় পরিণত করেছে, তা হলো আমাদেরকে না দেখেই আল্লাহকে বিশ্বাস করতে হয়। আল্লাহ যদি দৃশ্যমান হতেন, তাহলে তো প্রত্যেকেই তাঁর প্রতি ঈমান আনত এবং নাবিদের শিক্ষা মেনে চলত। সত্যি বলতে, মানুষ তখন আল্লাহর আনুগত্য করার ক্ষেত্রে ফেরেশতাদের মতোই বাধ্য

(১০) সূরা আল-আনআম, ৬:১০৩।
(১১) সূরা আশ্‌-শূরা; ৪২:৫১।
(১২) সহীহ্‌ মুসলিম, (ইংরেজি অনুবাদ), খণ্ড ১, পৃ. ১১১-১২, হাদীস্‌ নং ৩৩৭।
(১৩) নাবি তাঁর নিজ চোখে আল্লাহকে দেখেছেন মর্মে ইব্‌ন 'আব্বাসের সূত্রে বর্ণিত এবং ইব্‌ন খুযাইমাহ্‌ কর্তৃক সংকলিত যে হাদীস্‌টি কিতাব আত-তাওহীদে উল্লেখ করা হয়েছে তা দ্‌'ঈফ (দুর্বল)। দেখুন : আল আকীদাহ্‌ আত তাহায়িয়্যাহ্‌, পৃ. ১৯৭, পাদটীকা নং ১৬৯।

www.QuranerAlo.net

হয়ে যেত। কারণ তাদের আল্লাহকে অবিশ্বাস করার কোনো সুযোগ থাকত না। আল্লাহ যেহেতু মানুষকে ফেরেশতাদের উপরে স্থান দিয়েছেন, তাই মানুষের আল্লাহকে বিশ্বাস কিংবা অবিশ্বাস করার পছন্দকে এমন এক পরীক্ষার মধ্যে রাখা হয়েছে, যেখানে আল্লাহর অস্তিত্ব সম্পর্কে মনে প্রশ্ন জাগে। এ কারণেই আল্লাহ নিজেকে মানুষের দৃষ্টির অন্তরালে রেখেছেন এবং মহাবিশ্বের শেষদিন পর্যন্ত তিনি এভাবেই থাকবেন।

পরকালে আল্লাহকে দেখতে পাওয়া[১৪]

কুর'আনে এমন বহু দৃষ্টান্ত রয়েছে যেগুলোতে আল্লাহ স্পষ্টতই বলে দিয়েছেন যে, পরকালে মানুষ আল্লাহকে দেখবে। কিয়ামাতের দিন ঘটবে এমন কিছু ঘটনার কথা বর্ণনা করে আল্লাহ ﷻ বলেছেন,

وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ ﴿٢٢﴾ إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ﴿٢٣﴾

"সেদিন কতক মুখমণ্ডল হবে হাস্যোজ্জ্বল। তাদের রবের দিকে তাকিয়ে থাকবে।"

(আল-কিয়ামাহ, ৭৫:২২-২৩)

এই মহান ঘটনা সম্পর্কে নাবি ﷺ আরও বিস্তারিত জানিয়েছেন। কিছু সহাবি যখন বললেন, "কিয়ামাতের দিন আমরা কি আমাদের রবকে দেখব?" তিনি উত্তরে বললেন,

> "পূর্ণিমার চাঁদ দেখতে তোমাদের কি কোনো অসুবিধা হয়?" তারা উত্তর দিলেন, "না।" অতঃপর তিনি বললেন, "তোমরা তাঁকে ঠিক সেভাবেই দেখবে।"[১৫]

---

(১৪) অতীতে মুসলিমদের মধ্যকার যেসব বিপথগামী গোষ্ঠী পরকালে আল্লাহকে দেখা যাবে একথা অস্বীকার করেছে তারা হলো, জাহেমিয়া, মুতাযিলা এবং এদের যেসব অনুসারীরা খারেজীদের মধ্যে রয়েছে তারা। বর্তমানে কেবল শিয়াদের মধ্যকার বারোটি দলই অস্বীকার করে যে, পরকালে মানুষ আল্লাহকে দেখতে পাবে। (দেখুন : আল-আকীদাহ্ আত-তাহাওয়িয়্যাহ্, পৃ. ১৮৯)।

(১৫) আবু হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত। বুখারি, (আরবি-ইংরেজি), খণ্ড ৯, পৃ. ৩৯০-১, হাদীস্ নং ৫৩২ এবং মুসলিম, (ইংরেজি অনুবাদ), খণ্ড ১, পৃ. ১১৫, হাদীস্ নং ৩৪৯।

www.QuranerAlo.net

অন্য এক ঘটনায় তিনি বলেন,

"নিশ্চয়ই তোমরা যেদিন আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করবে সেদিন তোমাদের প্রত্যেকেই আল্লাহকে দেখবে; এবং তাঁর ও তোমাদের মধ্যে কোনো অন্তরায় বা দোভাষী থাকবে না।"(১৬)

এছাড়াও ইব্ন উমার ﷺ বর্ণনা করেছেন যে, নাবি ﷺ বলেন,

"কিয়ামাতের দিনই হলো প্রথম দিন যখন কোনো চোখ আল্লাহকে দেখবে।"(১৭)

আল্লাহ ﷻকে দেখতে পাওয়া জান্নাতের অধিবাসীদের জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি বিশেষ ও বাড়তি অনুগ্রহ। জান্নাতিদের জন্য আল্লাহ যত আনন্দের ব্যবস্থা রেখেছেন, তার সবকিছুর চেয়ে আল্লাহকে দেখতে পাওয়ার আনন্দই হলো সর্বোচ্চ এবং সর্বশ্রেষ্ঠ। এই বাড়তি আনন্দের কথা ইঙ্গিত করে আল্লাহ বলেছেন,

لَهُم مَّا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ ﴿٣٥﴾

"তারা যা চাইবে, সেখানে তাদের জন্য তা-ই থাকবে এবং আমার কাছে রয়েছে আরও অধিক।" (ক্বফ, ৫০:৩৫)

বিশিষ্ট দুজন সহাবি, আলি ইব্ন আবি তালিব এবং আনাস ﷺ উল্লিখিত আয়াতে আরও অধিক বলতে আল্লাহকে দেখতে পাওয়ার(১৮) বিষয়টি বুঝানো হয়েছে বলে ব্যাখ্যা করেছেন। আর সুহাইব ﷺ বর্ণনা করেন যে, আল্লাহর রসূল ﷺ একদিন তিলাওয়াত করেন, "যারা ভালো কাজ করে তাদের জন্য রয়েছে শুভ পরিণাম (জান্নাত) এবং আরও বেশি(১৯)।" (ইউনূস; ১০:২৬) এবং বলেন,

---

(১৬) আদি ইব্ন আবি হাতিম ﷺ থেকে বর্ণিত। বুখারি, (আরবি-ইংরেজি), খণ্ড ৯, পৃ. ৪০৩, হাদীস নং ৫৩৫।

(১৭) হাদীসটি সহীহ যা আদ-দারাকুত্‌নি এবং আদ-দারিমি তার বই, আর-রাদ্দ আলা আল-জাহমিয়্যাহ্ (জাহেমিয়াদের যুক্তি খণ্ডন), পৃ. ৫৭-এ সংকলন করেছেন, (Beirut: al-Maktab al-Islami, n.d.).

(১৮) আত-তাবারি কর্তৃক সংকলিত। দেখুন : আল-আক্বীদাহ আত্-তাহাউইয়াহ, পৃ. ১৯০।

(১৯) সূরা ইউনূস; ১০:২৬।

www.QuranerAlo.net

"যখন জান্নাতীরা জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং জাহান্নামীরা জাহান্নামে প্রবেশ করবে, তখন একজন ঘোষক ডাক দিয়ে বলবেন, 'হে জান্নাতের লোকেরা, তোমাদের জন্য আল্লাহর যে প্রতিশ্রুতি রয়েছে, তিনি তা পূর্ণ করতে চান।' তারা জানতে চাইবে, 'কী সেটা? তিনি কি আমাদের সৎকর্মের ওজনকে ভারী করেননি, আমাদের মুখগুলোকে আলোকিত করেননি, আমাদের জান্নাতে প্রবেশ করাননি এবং আমাদের (কাউকে কাউকে) জাহান্নাম থেকে বের করে আনেননি?' অতঃপর পর্দা সরানো হবে এবং তারা পলকহীন দৃষ্টিতে আল্লাহর দিকে তাকিয়ে থাকবে। আল্লাহ তাদেরকে যা কিছু দিয়েছেন তার কোনো কিছুই তাদের কাছে আল্লাহর এই দর্শন লাভের চেয়ে প্রিয় হবে না। আর এটিই হলো সেই 'আরও বেশি কিছু'।"(২০)

ইতোপূর্বে উল্লিখিত, "চক্ষুসমূহ তাঁকে আয়ত্ত করতে পারে না। আর তিনি চক্ষুসমূহকে আয়ত্ত করেন"—এই আয়াতটি দুনিয়ার জীবনে আল্লাহকে দেখার সকল সম্ভাবনাকে বাতিল করে দেয়। একইসাথে পরকালে আল্লাহকে তাঁর পূর্ণ রূপে দেখার সম্ভাবনাও বাতিল হয়ে যায়। কেননা কেবল সৎকর্মশীলগণই তাঁকে দেখতে পাবেন এবং তাও আংশিকভাবে। কারণ জান্নাতে তাদের দৃষ্টি সীমাবদ্ধই থাকবে এবং চিরঞ্জীব আল্লাহ সর্বদাই অসীম, অনাদি প্রতিপালক; যাঁকে কারও দৃষ্টি, জ্ঞান বা ক্ষমতা দ্বারা পূর্ণরূপে পরিবেষ্টন করা অসম্ভব।(২১) কাফিরদের ক্ষেত্রে যা ঘটবে তা হলো, পরকালে তারা আল্লাহকে দেখতে পাবে না। এটা হবে তাদের জন্য চরম হতাশা ও বঞ্চনার বিষয়। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ ﷻ বলেন,

كَلَّا إِنَّهُمْ عَن رَّبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّمَحْجُوبُونَ ﴿١٥﴾

"কখনো নয়, নিশ্চয়ই সেদিন তারা তাদের রব থেকে পর্দার আড়ালে থাকবে।"

(আল-মুতাফ্‌ফিফীন; ৮৩:১৫)

---

(২০) তিরমিযি, ইব্‌ন মাজাহ্ এবং আহ্‌মাদ কর্তৃক সংকলিত।

(২১) আল-আকীদাহ আত্-তাহাউইয়াহ্, পৃ. ১৮৮, ১৯৩, ১৯৮। আরও দেখুন : সূরা তা-হা, ২০:১১০ যেখানে আল্লাহ ﷻ বলেছেন, "তারা (মানুষ) জ্ঞান দিয়ে তাঁকে বেষ্টন করতে পারবে না।"

www.QuranerAlo.net

নাবি মুহাম্মাদ ﷺ এর দর্শন লাভ

এটিও এমন একটি বিষয় যা কিছুটা হলেও মুসলিমদের জন্য বিভ্রান্তি এবং ফিতনার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। অনেক লোকের দাবি, তারা নাবি ﷺ কে দেখেছে এবং তাঁর থেকে বিশেষ নির্দেশনা লাভ করেছে। কারও দাবি, তাদের দর্শন হয়েছে স্বপ্নে, আবার কেউ দাবি করেন তারা জাগ্রত অবস্থায়ই তাঁর দর্শন লাভ করেছেন। যারা এইসব দাবি করে, সাধারণ মানুষ তাদেরকে শ্রদ্ধা করে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তারা ইসলামের মধ্যে নতুন নতুন 'ইবাদাতের প্রবর্তন করে এবং নাবি ﷺ সেগুলো করতেন বলে দাবি করে। এসব দাবিগুলোর ভিত্তি হলো আবু হুরায়রা, আবু কাতাদা এবং জাবির ইব্ন আব্দুল্লাহ থেকে বর্ণিত একটি হাদীস্, যাতে নাবি ﷺ বলেছেন,

> "যে আমাকে স্বপ্নে দেখল, সে আমাকেই দেখল; কারণ শয়তান আমার রূপ ধারণ করতে পারে না।"(২২)

কোনো সন্দেহ নেই যে, হাদীসটি সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ ও নির্ভরযোগ্য। অতএব হাদীসটিকে অস্বীকার বা অবিশ্বাস করার কোনো সুযোগ নেই। তবে কিছু বিষয় রয়েছে যেগুলো হাদীসটি ব্যাখ্যা করার ক্ষেত্রে বিবেচনায় রাখতে হবে।

ক. হাদীসটি নিশ্চিত করে যে, শয়তান বিভিন্ন রূপে স্বপ্নে আসতে পারে এবং মানুষকে বিপথগামী করতে পারে।

খ. হাদীসের বক্তব্য অনুযায়ী, নাবির ﷺ প্রকৃত চেহারা বা রূপ ধারণ করতে শয়তান সক্ষম নয়।

গ. হাদীসটি আরও নিশ্চিত করে যে, স্বপ্নে নাবির চেহারা দেখা যেতে পারে।

লক্ষণীয় যে, নাবি ﷺ স্বপ্ন সম্পর্কে এই কথাটি তাঁর সাহাবিদেরকে বলেছিলেন যারা তাঁর চেহারার সাথে পরিচিত ছিল। তাই নাবি ﷺ এর চেহারার সাথে ভালোভাবে পরিচিত কোনো ব্যক্তি যদি তাঁকে স্বপ্নে দেখেন, কেবল তখনই তিনি নিশ্চিত হতে পারেন যে, নাবি ﷺ কে স্বপ্নের মাধ্যমে

---

(২২) বুখারি, (আরবি-ইংরেজি), খণ্ড ৯, পৃ. ১০৪, হাদীস্ নং ১২৩ এবং মুসলিম, (ইংরেজি অনুবাদ), খণ্ড ৪, পৃ. ১২২৫, হাদীস্ নং ৫৬৩৫ এবং পৃ. ১২২৬, হাদীস্ নং ৫৬৩৯।

www.QuranerAlo.net

দেখিয়ে আল্লাহ তাকে ধন্য করেছেন। এর কারণ হলো, নাবি ﷺ এর সত্যিকার রূপ ধারণ করার ক্ষমতা আল্লাহ শয়তানকে দেননি। তবে যারা নাবির চেহারার সাথে পরিচিত নয়, শয়তান তাদের স্বপ্নের মধ্যে এসে নিজেকে আল্লাহর রসূল বলে দাবি করতে পারে। তারপর সে স্বপ্নদ্রষ্টার কাছে নতুন নতুন 'ইবাদাত করার নির্দেশ দিতে পারে অথবা বলতে পারে যে, সে ইমাম আল-মাহদি বা নাবি ঈসা ﷺ যিনি পৃথিবী ধ্বংসের পূর্বে ফিরে আসবেন। এ ধরনের স্বপ্নের উপর ভিত্তি করে যারা নতুন নতুন 'ইবাদাত চালু করেছে বা এমন দাবি করেছে তারা সংখ্যায় অনেক। উল্লিখিত হাদীসের সঠিক তাৎপর্য না বুঝার কারণে এই ধরনের দাবিকে গ্রহণ করার প্রবণতাই মানুষের মধ্যে বেশি। শারীআহ যেহেতু সম্পূর্ণ, তাই নাবি ﷺ স্বপ্নের মাধ্যমে নতুন কোনো সংযোজন নিয়ে আসার দাবি অবশ্যই মিথ্যা। এসব দাবির অর্থ নীচের দুটোর যেকোনো একটিঃ

১. নাবি ﷺ তাঁর জীবদ্দশায় দীন প্রচারের কাজ পুরোপুরিভাবে সম্পন্ন করে যাননি।

২. মুসলিম উম্মাহর ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আল্লাহ অবগত ছিলেন না। যার কারণে তিনি নাবি ﷺ এর জীবদ্দশায় প্রয়োজনীয় সকল দিকনির্দেশনা দিতে পারেননি।

আর এ উভয়টিই ইসলামের মৌলিক বিধানসমূহের সাথে সাংঘর্ষিক।

জাগ্রত অবস্থায় নাবি ﷺ এর দর্শন লাভের দাবির ব্যাপারে বলা যায়, এই ধরনের দাবি উল্লিখিত হাদীসের গণ্ডি পেরিয়ে অসম্ভাব্যতার পর্যায়ে পড়ে। আদৌ যদি এমন কোনো ঘটনা ঘটে, তবে নিঃসন্দেহে তা শয়তানের ভেল্কিবাজী। মাক্কা থেকে জেরুযালেম এবং সেখান থেকে ঊর্ধ্বাকাশে নাবি ﷺ এর মিরাজের সময়, আল্লাহই তাঁকে অলৌকিকভাবে বেশ কিছু সংখ্যক পূর্ববর্তী নাবির সাথে সাক্ষাৎ করিয়েছিলেন এবং তিনি তাঁদের সাথে কথা বলেছিলেন। সত্যি বলতে, যারা জাগ্রত অবস্থায় নাবি মুহাম্মাদ ﷺ কে দেখেছে বলে দাবি করে, তারা মূলত নিজেদেরকে নাবির পর্যায়ে উন্নীত করার অপচেষ্টা চালায়। নাবি ﷺ এর দর্শন লাভের নামেই হোক কিংবা অন্য কোনোভাবেই হোক, দীন ইসলামে নতুন কোনো 'ইবাদাত বা রীতিনীতি

www.QuranerAlo.net

চালু করা সম্পূর্ণরূপে অগ্রহণযোগ্য। কারণ এমনটি করা নাবি ﷺ এর অসংখ্য হাদীস্ দ্বারা নিষিদ্ধ বলে প্রমাণিত। উদাহরণস্বরূপ, আইশাহ ﵂ বর্ণনা করেন যে, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন,

"যে কেউ আমাদের এই বিষয়ে (অর্থাৎ, দীন ইসলামে) নতুন কিছু চালু করল যা এর অন্তর্ভুক্ত নয়, তা প্রত্যাখ্যাত।"(২৩)

(২৩) বুখারি, (আরবি-ইংরেজি), খণ্ড ৩, পৃ. ৫৩৫, হাদীস্ নং ৮৬১, মুসলিম, (ইংরেজি অনুবাদ), খণ্ড ৩, পৃ. ৯৩১, হাদীস্ নং ৪২৬৬ এবং সুনান আবি দাউদ, খণ্ড ৩, পৃ. ১২৯৫, হাদীস্ নং ৪৫৮৯।

www.QuranerAlo.net

দশম অধ্যায়

পির-আউলিয়া পূজা

আল্লাহ প্রদত্ত শ্রেষ্ঠত্ব

মানুষের সৃষ্টিগত বৈশিষ্ট্যই হলো, সে কিছু মানুষকে অন্য মানুষের উপর প্রাধান্য দেবে। নিজেই নিজের সিদ্ধান্ত নেওয়ার চেয়ে অন্যকে সম্মানের আসনে বসিয়ে তার অনুসরণ করাই মানুষের কাছে বেশি পছন্দের। এর একটি প্রত্যক্ষ কারণ হলো, আল্লাহ বিভিন্নভাবে কিছু মানুষকে অন্য সকল মানুষের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। এভাবেই সামাজিক ও পারিবারিক অঙ্গনে নারীর উপর পুরুষকে দায়িত্বশীল ও তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে স্থান দেওয়া হয়েছেঃ

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ...

"পুরুষরা নারীদের তত্ত্বাবধায়ক; এ কারণে যে, আল্লাহ তাদের একের উপর অন্যকে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন..." (আন-নিসা', ৪:৩৪)

...وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ...

"...আর পুরুষদের জন্য রয়েছে নারীদের উপর মর্যাদা..."

(আল-বাক্বারাহ, ২:২২৮)

আবার অর্থনৈতিকভাবে কিছু মানুষকে অন্যদের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করা হয়েছে।

www.QuranerAlo.net

وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ ...

"আর আল্লাহ রিয্ক দিয়ে তোমাদের কতককে অন্যদের উপর প্রাধান্য দিয়েছেন..." (আন-নাহ্ল, ১৬:৭১)

ওয়াহ্য়ির মাধ্যমে সঠিক পথ প্রদর্শন করে বানী ইসরাঈলকে সমগ্র মানবজাতির উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করা হয়েছিলঃ

يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ ﴿٤٧﴾

"হে বনী ইসরাঈল! তোমরা আমার অনুগ্রহের কথা স্মরণ করো, যে অনুগ্রহ আমি তোমাদেরকে দিয়েছি এবং নিশ্চয়ই আমি তোমাদেরকে বিশ্ববাসীর উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি।" (আল-বাক্বারাহ, ২:৪৭)

ওয়াহ্য়ি অবতীর্ণের দ্বারা নাবিদেরকে সকল মানুষের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করা হয়েছে এবং কোনো কোনো নাবিকে আল্লাহ ﷻ অন্য নাবিদের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেনঃ

تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ...

"ওই রসূলগণ, আমি তাদের কাউকে কারও উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি..." (আল-বাক্বারাহ, ২:২৫৩)

এরপর, আল্লাহ ﷻ বলেছেন, আমরা যেন সেইসব অনুগ্রহ লাভের আকাঙ্ক্ষা না করি, যেগুলোর দ্বারা তিনি কিছু মানুষকে অন্য মানুষের উপর প্রাধান্য দান করেছেনঃ

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ...

"আর তোমরা আকাঙ্ক্ষা করো না সেসব অনুগ্রহের, যার মাধ্যমে আল্লাহ তোমাদের একজনকে অন্য জনের উপর প্রাধান্য দিয়েছেন।..." (আন-নিসা', ৪:৩২)

www.QuranerAlo.net

কারণ এসব অনুগ্রহ তাদের জন্য এমনই পরীক্ষা, যা লাভ করার সাথে সাথে তাদের উপর বিরাট দায়িত্ব এসে বর্তায়। এসব অনুগ্রহ মানুষের কোনো প্রচেষ্টার ফল নয়। আর তাই এগুলো কখনো কারও অহংকারের কারণ হওয়া উচিত নয়। এসব অনুগ্রহ লাভের জন্য আল্লাহ তাদেরকে পুরস্কৃত করবেন না; বরং সেগুলোকে তারা কীভাবে কাজে লাগিয়েছে সে সম্পর্কে তাদের জবাবদিহি করতে হবে। এজন্যই আল্লাহর রসূল ﷺ আমাদেরকে উপদেশ দিয়েছেন,

> "যারা তোমাদের নীচে, তাদের দিকে তাকাও; যারা তোমাদের উপরে তাদের দিকে নয়। এটা তোমাদের জন্য অধিক কল্যাণকর, যেন তোমরা নিজেদের উপর আল্লাহর অনুগ্রহকে অস্বীকার না করে বসো।"(২৪)

প্রতিটি মানুষকেই কোনো না কোনোভাবে কারও না কারও উপর শ্রেষ্ঠত্ব দেওয়া হয়েছে এবং প্রত্যেকেরই কিছু নির্দিষ্ট দায়িত্ব ও কর্তব্য রয়েছে যেগুলোর ব্যাপারে তাদেরকে হিসাব দিতে হবে। নাবি ﷺ বলেছেন,

> "তোমাদের প্রত্যেকেই একেক জন দায়িত্বশীল এবং প্রত্যেকেই তার অধীনস্থদের ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত হবে।"(২৫)

এই দায়িত্বগুলোই হলো পার্থিব জীবনে সকল পরীক্ষার মৌলিক উপাদান। আমরা যদি এসব অনুগ্রহের জন্য আল্লাহর প্রশংসা করি এবং সেগুলোকে সঠিকভাবে কাজে লাগাই, তবে আমরা সফলকাম হবো; অন্যথায় ব্যর্থ হবো। দায়িত্বের সবচেয়ে বড় পরীক্ষা হয়ে দাঁড়ায় যখন আল্লাহ মানুষকে সমগ্র সৃষ্টি জগতের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেন। আদামকে সিজদা করার জন্য ফেরেশতাদের প্রতি আল্লাহর আদেশের মধ্য দিয়ে মানুষের এই শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং সাথে সাথে মানুষের উপর দুই ধরনের দায়িত্ব বর্তেছেঃ

---

(২৪) বুখারি এবং মুসলিম উভয়েই সংকলন করেছেন। দেখুন : বুখারি (আরবি-ইংরেজি), খণ্ড ৮, পৃ. ৩২৮, হাদীস নং ৪৯৭ এবং মুসলিম, (ইংরেজি অনুবাদ), খণ্ড ৪, পৃ. ১৫৩০, হাদীস নং ৭০৭০।

(২৫) বুখারি এবং মুসলিম উভয়েই সংকলন করেছেন। দেখুন : বুখারি (আরবি-ইংরেজি), খণ্ড ৩, পৃ. ৪৩৮, হাদীস নং ৭৩০ এবং মুসলিম, (ইংরেজি অনুবাদ), খণ্ড ৩, পৃ. ১০১৭, হাদীস নং ৪৪৯৬।

www.QuranerAlo.net

১. ব্যক্তি জীবনে ইসলামকে গ্রহণ করা। অর্থাৎ, স্বেচ্ছায় এবং সর্বান্তকরণে আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করা।

২. সমগ্র পৃথিবীতে আল্লাহর বিধানকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য সমষ্টিগতভাবে অঙ্গীকারাবদ্ধ থেকে চেষ্টা করা।

এভাবে নিজেদের দায়িত্বসমূহ পালনের কারণে আল্লাহর দৃষ্টিতে মু'মিনরা কাফিরদের চেয়ে অনেক বেশি উত্তম। আল্লাহ ﷻ বলেন,

كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ...

"তোমরা হলে সর্বোত্তম উম্মাহ, যাদের আবির্ভাব ঘটানো হয়েছে গোটা মানবজাতির জন্য। তোমরা ভালো কাজের আদেশ দেবে এবং মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখবে, আর আল্লাহর প্রতি ঈমান আনয়ন করবে।..." (আলি ইমরান ৩:১১০)

তাকওয়া

মু'মিনদের মাঝেও সবাই এক শ্রেণির নয়। অনেকে আছেন যিনি অন্যদের চেয়ে উঁচু মর্যাদার অধিকারী। আর তাদের এই শ্রেষ্ঠত্ব নিজেকে কঠোর পরিশ্রমের প্রত্যক্ষ ফল। এই শ্রেষ্ঠত্বের সম্পর্ক ঈমানের সাথে, বিশ্বাসের দৃঢ়তা ও গভীরতার সাথে। মজবুত ঈমান আল্লাহর অসন্তুষ্টিমূলক সকল কিছু থেকে একজন বিশ্বাসীকে ঢালের মতো রক্ষা করে। আরবিতে এই ঢালকে বলা হয় তাকওয়া। একে বিভিন্নভাবে অনুবাদ করা হয়েছে যেমন, 'আল্লাহভীতি', 'আল্লাহর ভালোবাসা', 'ধার্মিকতা' এবং 'স্রষ্টা সম্পর্কে সচেতনতা'। এছাড়াও শব্দটি আরও অনেক অর্থ বহন করে। আল্লাহ ﷻ সুস্পষ্টভাবে তাকওয়ার শ্রেষ্ঠত্ব তুলে ধরেছেন এভাবেঃ

... إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ...

www.QuranerAlo.net

"তোমাদের মধ্যে আল্লাহর কাছে সেই অধিক মর্যাদাসম্পন্ন যে তোমাদের মধ্যে অধিক তাক্‌ওয়া সম্পন্ন।" (আল-হুজুরাত: ৪৯:১৩)

উল্লিখিত আয়াতে আল্লাহ বলেছেন, একমাত্র যে বৈশিষ্ট্য কোনো মু'মিন নারী বা পুরুষকে সত্যিকার অর্থেই অন্যদের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করে, তা হলো তাক্‌ওয়া।

এটি হলো সেই ধার্মিকতা বা স্রষ্টা-সচেতনতা যা মানুষকে 'চিন্তাশীল প্রাণী' থেকে এই গ্রহে আল্লাহর প্রেরিত খলিফা বা প্রতিনিধির মর্যাদায় উন্নীত করে। একজন মুসলিমের জীবনে আল্লাহ-সচেতনতার গুরুত্ব বলে বুঝানো সম্ভব নয়। কুর'আনে আল্লাহ তাক্‌ওয়া এবং এ থেকে উৎপন্ন শব্দগুলো অনেকবার উল্লেখ করেছেন এবং প্রতিবারই গুরুত্বারোপ করে বলেছেন যে, ঈমানের চালিকাশক্তিই হলো তাক্‌ওয়া। তাক্‌ওয়া ছাড়া ঈমান একেবারেই অর্থহীন। তাক্‌ওয়া না থাকলে নিছক মুখের কথা আর লোক দেখানো ভালো কাজ কেবলই কপটতা আর ভণ্ডামির অন্তঃসারশূন্য খোলস। এজন্যই জীবনে প্রতিটি কাজের ক্ষেত্রে বিবেচ্য সকল বিষয়ের উপর তাক্‌ওয়াকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়। তাই তো আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন,

> "চারটি কারণে একজন নারীকে বিবাহ করা হয়—তার সম্পদ, তার বংশ মর্যাদা, তার সৌন্দর্য এবং তার তাক্‌ওয়া। তবে যে মুত্তাকী তাকেই পছন্দ করো এবং সফল হও।"(২৬)

কোনো নারী যত সুন্দরী, সম্পদশালী কিংবা উচ্চ বংশের হোক না কেন, সে যদি মুত্তাকী না হয় তাহলে তার মধ্যে আসলে কোনো কল্যাণ নেই। তার চেয়ে সাধারণ পরিবারের একজন অসুন্দর, গরিব ধার্মিক নারী অনেক উত্তম। একই কথা পুরুষদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। যেমনটি নাবি ﷺ বলেছেন,

> "যে পুরুষের দীনদারী তোমাদেরকে সন্তুষ্ট করে, সে যদি তোমার কন্যাকে বিয়ের প্রস্তাব দেয়, তাহলে তোমার উচিত তাদের বিয়ে দিয়ে দেওয়া; অন্যথায় পৃথিবীতে বিপর্যয় ঘটবে।"(২৭)

---

(২৬) আবু হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত। বুখারি (আরবি-ইংরেজি), খণ্ড ৭, পৃ. ১৮-৯, হাদীস নং ২৭ এবং মুসলিম, (ইংরেজি অনুবাদ), খণ্ড ২, পৃ. ৭৪৯, হাদীস নং ৩৪৫৭।

(২৭) আবু হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত এবং তিরমিযি কর্তৃক সংকলিত।

www.QuranerAlo.net

একবার বিলাল ﷺ কে উপহাস করে 'কালো মহিলার ছেলে' বলে ডাকার কারণে নাবি ﷺ আবু যার ﷺ কে কঠোরভাবে ভর্ৎসনা করেন। এমনকি তিনি আরও বলেন,

> "দেখো! কিছুতেই একজন বাদামি কিংবা কালো মানুষের চেয়ে তুমি উত্তম নও, যদি না তুমি তাদের চেয়ে আল্লাহকে বেশি ভয় করো।"[২৮]

আল্লাহর রসূল ﷺ এই ব্যাপারটিকে বারবার বলে মানুষের মনে গেঁথে দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। এমনকি মৃত্যুর কিছুদিন আগে, বিদায় হাজ্জে তিনি গোত্র-বর্ণ ও জাতিগত পার্থক্যের অগ্রহণযোগ্যতা এবং তাকওয়ার উপর সর্বোচ্চ গুরুত্বের ব্যাপারে মানুষদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিয়েছিলেন।

আল্লাহকে কে বেশি ভয় করে, কে বেশি ভালোবাসে তা কেবল তিনিই জানেন। কারণ তাকওয়ার ধারক হলো অন্তর। মানুষের পরস্পরকে বিচার করার একমাত্র উপায় হলো বাহ্যিক কাজকর্ম। যদিও বাহ্যিক দিক থেকে দেখতে ভালো হলেও অনেক সময় তার অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য মন্দ হতে পারে। বিষয়টি আল্লাহ ﷻ নিম্নোক্ত আয়াতে সুস্পষ্ট করে দিয়েছেনঃ

وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَىٰ مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ ﴿٢٠٤﴾

"কিছু মানুষ আছে, এই জীবনে যার কথা আপনাকে অবাক করে দেবে আর তার অন্তরে কী আছে তার উপর সে আল্লাহকে সাক্ষী বানাবে। আসলে সে হলো কঠিন ঝগড়াকারীদের অন্তর্ভুক্ত।" (আল-বাক্বারাহ, ২:২০৪)

অতএব, কাউকে বিশেষ অনুগ্রহপ্রাপ্ত হিসেবে উপাধি দেওয়া, কিংবা কাউকে জান্নাতি হিসেবে সার্টিফিকেট দেওয়ার অনুমতি মানুষের নেই। নাবি ﷺ তাঁর সহাবিদের মধ্য থেকে সরাসরি নাম উল্লেখ করে কয়েকজনকে জান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছিলেন।[২৯] তবে সেই ঘোষণাগুলো ছিল ওয়াহয়ির উপর ভিত্তি

---

(২৮) আব্দুল্লাহ ইব্ন আমর ﷺ থেকে বর্ণিত এবং আহমাদ কর্তৃক সংকলিত।

(২৯) তাদের মধ্যে সুপরিচিত দশজন হলেন আবু বাক্‌র, উমার, উসমান, আলি, তালহাহ, আয-যুবায়ের, সাদ ইব্ন আবি ওয়াক্কাস, সাঈদ ইব্ন যায়েদ, আবদুর-রহমান ইব্ন আওফ, আবু

www.QuranerAlo.net

করে, নিজস্ব কোনো ক্ষমতার উপর ভিত্তি করে নয়। উদাহরণস্বরূপ, যারা বাইআহ্ আর-রিদ্ওয়ান গ্রহণ করেছিলেন, তাদের সম্পর্কে যখন নাবি ﷺ বলেছিলেন,

"যারা এই গাছের নীচে বাইআত গ্রহণ করেছে, তাদের কেউ জাহান্নামে প্রবেশ করবে না।"(৩০)

তখন তিনি এই মর্মে অবতীর্ণ নিম্নোক্ত আয়াতের সমর্থনেই সে ঘোষণা দিয়েছিলেনঃ

لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ...

"অবশ্যই আল্লাহ মু'মিনদের উপর সন্তুষ্ট হয়েছেন, যখন তারা গাছের নীচে আপনার হাতে বাইআহ গ্রহণ করেছিল..." (আল-ফাত্হ; ৪৮:১৮)

অনুরূপভাবে, নাবি ﷺ থেকে এমন কিছু ঘটনাও বর্ণিত রয়েছে যেখানে তিনি হয়তো এমন কাউকে জাহান্নামী ঘোষণা করেছেন যার ব্যাপারে লোকেরা মনে করত যে, সে নিশ্চয়ই জান্নাতের অধিবাসী হবে। এ ধরনের সব ঘোষণাগুলোই ছিল ওয়াহ্য়িভিত্তিক। ইব্ন 'আব্বাস ﷺ বলেন যে, উমর ইবনুল-খাত্তাব ﷺ তাঁকে বলেন,

"খাইবারের (যুদ্ধের) দিন নাবির কয়েকজন সহাবি এসে বললেন, অমুক অমুক শহীদ। এভাবেই তারা একজনের কাছে এসে যখন বলল, অমুক শহীদ, তখন আল্লাহর রসূল ﷺ বললেন, কখনোই না! আমি তাকে সেই জুব্বা পরা অবস্থায় জাহান্নামে দেখেছি যে জুব্বা সে (যুদ্ধলব্ধ মাল থেকে) অন্যায়ভাবে নিয়েছিল।' তারপর আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, হে ইবনুল-খাত্তাব, যাও এবং লোকদের মাঝে তিনবার ঘোষণা করে দাও যে, শুধুমাত্র মু'মিনরাই জান্নাতে প্রবেশ করবে।" (৩১)

উবায়দা ইব্ন আল-জাররাহ্ ﷺ প্রমুখ। দেখুন: আল-আক্বীদাহ আত্-তাহাউইয়াহ, পৃ. ৪৮৫-৭।

(৩০) জাবির থেকে বর্ণিত। মুসলিম, (ইংরেজি অনুবাদ), খণ্ড ৩, পৃ. ১০৩৪, হাদীস্ নং ৪৫৭৬।

(৩১) মুসলিম, (ইংরেজি অনুবাদ), খণ্ড ১, পৃ. ৬৫, হাদীস্ নং ২০৯।

www.QuranerAlo.net

Contents

খ্রিস্টান ধর্মে কিছু ব্যক্তিকে কথিত সিদ্ধি লাভের কারণে অতিমাত্রায় ভক্তি ও প্রশংসা করার ঐতিহ্য যুগ যুগ ধরেই চলে আসছে। তারা বিশ্বাস করে যে, এসব লোকেরা অলৌকিক ঘটনা ঘটানোর ক্ষমতা রাখে। তাদেরকে সাধকের (saint) মর্যাদা দেওয়া হয়। খ্রিস্টান ধর্মের পূর্বে হিন্দু এবং বৌদ্ধ রীতিতে যেসব আধ্যাত্মিক গুরুদেরকে উৎকর্ষের সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে গেছেন বলে ভাবা হতো এবং অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী মনে করা হতো, তাদেরকেও তাদের আধ্যাত্মিক শ্রেষ্ঠত্বের প্রতীক হিসেবে বিভিন্ন উপাধি দেওয়া হয়েছে, যেমন, গুরু, সাধু ও অবতার ইত্যাদি। এসব উপাধি সাধারণ মানুষকে এমন পর্যায়ে নিয়ে গেছে যে, তারা এসব গুরু, সাধকদেরকে স্রষ্টা ও মানুষের মাঝে সুপারিশকারী বানিয়ে নিয়েছে; এমনকি অনেক ক্ষেত্রে দেবতা হিসেবে তাদের পূজা করার দিকে ঠেলে দিয়েছে। এ কারণে এসব ধর্মে সাধুসন্তদের কাছে সাধারণ মানুষ ভক্তিভরে প্রার্থনা করে থাকে। পক্ষান্তরে, ইসলাম স্বয়ং নাবি মুহাম্মাদ ﷺ-এরও মাত্রাতিরিক্ত প্রশংসা করার বিরোধিতা করে। এ ব্যাপারে তিনি নিজেই বলে গেছেন,

> "আমার মাত্রাতিরিক্ত প্রশংসা করো না, যেভাবে খ্রিস্টানরা ঈসা ইব্ন মারইয়ামের ক্ষেত্রে করেছে। নিশ্চয়ই আমি কেবলই একজন বান্দা, তাই আমাকে বরং আল্লাহর বান্দা এবং রসূল বলেই ডেকো।"(৩২)

অলিঃ 'সাধক'

সাধক শব্দটি আরবি 'ওয়ালি' (বহুবচনে আউলিয়া) শব্দের সমার্থক হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। আল্লাহ তাঁর প্রিয় বান্দাদের বুঝানোর জন্য শব্দটি ব্যবহার করেছেন । তবে শব্দটির সঠিক অনুবাদ হলো 'ঘনিষ্ঠ বন্ধু।' কারণ ওয়ালি'শব্দের আক্ষরিক অর্থ 'বন্ধু' বা 'মিত্র।' আল্লাহ ﷻ নিজের জন্যেই নিম্নোক্ত আয়াতসমূহে শব্দটি ব্যবহার করেছেনঃ

اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ ...

(৩২) উমার ইবনুল-খাত্তাব ﷺ থেকে বর্ণিত এবং বুখারি ও মুসলিম কর্তৃক সংকলিত। দেখুন : বুখারি, (আরবি-ইংরেজি), খণ্ড ৪, পৃ. ৪৩৫, হাদীস নং ৬৫৪।

www.QuranerAlo.net

"যারা ঈমান এনেছে আল্লাহ তাদের ওয়ালি, তিনি তাদেরকে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে বের করে আনেন..." (আল-বাক্বারাহ, ২:২৫৭)

...وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٦٨﴾

"...আর আল্লাহ মু'মিনদের ওয়ালি।" (আলি ইমরান ৩:৬৮)

...فَاللَّهُ هُوَ الْوَلِيُّ...

"...কিন্তু আল্লাহ—তিনিই হলেন প্রকৃত ওয়ালি।..." (আশ-শূ'আরা', ৪২:৯)

...وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ ﴿١٩﴾

"...এবং আল্লাহ মুত্তাকীদের ওয়ালি।" (আল-জাসিয়া; ৪৫:১৯)

আল্লাহ 'ওয়ালি' শব্দটিকে নিম্নোক্ত আয়াতগুলোতে শয়তানের জন্যও ব্যবহার করেছেনঃ

...وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا ﴿١١٩﴾

"...আর যারা আল্লাহর পরিবর্তে শয়তানকে ওয়ালি হিসেবে গ্রহণ করে, তারা তো স্পষ্টই ক্ষতিগ্রস্ত হলো।" (আন-নিসা', ৪:১১৯)

...إِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ...

"...নিশ্চয়ই আমি শয়তানদেরকে তাদের জন্য আউলিয়া বানিয়েছি..."

(আল-আরাফ, ৭:২৭)

...إِنَّهُمُ اتَّخَذُوا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ...

www.QuranerAlo.net

"...নিশ্চয়ই তারা শয়তানকে তাদের আউলিয়ারূপে গ্রহণ করেছে।..."

(আল-আরাফ, ৭:৩০)

নিম্নোক্ত আয়াতগুলোতে শব্দটি দ্বারা 'নিকটাত্মীয়' বুঝানো হয়েছে:

...فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِف فِّي الْقَتْلِ ...

"...যে অন্যায়ভাবে নিহত হয় আমি অবশ্যই তার ওয়ালিকে ক্ষমতা দিয়েছি। সুতরাং হত্যার ব্যাপারে সে সীমালঙ্ঘন করবে না;..." (আল-ইস্‌রা, ১৭:৩৩)

মানুষের মধ্যে পারস্পরিক ঘনিষ্ঠতা বুঝানোর জন্যও শব্দটি কুর'আনে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমনঃ

لَّا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ...

"মু'মিনরা যেন মু'মিনদের ছাড়া কাফিরদেরকে আউলিয়া হিসেবে গ্রহণ না করে।..." (আলি ইমরান ৩:২৮)

الَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ...

"যারা মু'মিনদের পরিবর্তে কাফিরদেরকে আউলিয়া হিসেবে গ্রহণ করে..."

(আন-নিসা', ৪:১৩৯)

...لَا تَتَّخِذُوا الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ...

"...তোমরা কাফিরদেরকে আউলিয়ারূপে গ্রহণ করো না।..."

(আন-নিসা', ৪:১৪৪)

*يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ....

www.QuranerAlo.net

"হে মু'মিনগণ! ইহুদি এবং খ্রিস্টানদেরকে তোমরা আউলিয়ারূপে গ্রহণ করো না। তারা একে অপরের আউলিয়া।..." (আল-মা'ইদাহ, ৫:৫১)

তবে যে অর্থে 'ওয়ালি' শব্দটির প্রয়োগ আমাদের আলোচনায় সবচেয়ে প্রাসঙ্গিক তা হলো 'আওলিয়া-আল্লাহ' বা আল্লাহর ঘনিষ্ঠ বন্ধু। কুর'আনে আল্লাহ মানবজাতির মধ্য থেকে তাদেরকেই এই উপাধি দিয়েছেন যাদেরকে তিনি বিশেষভাবে তাঁর নৈকট্য লাভকারী বলে গণ্য করেছেন। সূরা আল-আনফালের মধ্যে আল্লাহর ওয়ালিদের বর্ণনা প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন,

...إِنْ أَوْلِيَاؤُهُ إِلَّا الْمُتَّقُونَ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٤﴾

"...তাঁর (আল্লাহর) আউলিয়া তো কেবল মুত্তাকীগণ; কিন্তু তাদের অধিকাংশ জানে না।" (আল-আনফাল, ৮:৩৪)

এছাড়াও সূরা ইউনূসের মধ্যে রয়েছে,

أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٦٢﴾ الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ ﴿٦٣﴾

"শুনে রেখো, নিশ্চয়ই আল্লাহর আউলিয়াদের কোনো ভয় নেই, আর তারা পেরেশানও হবে না, (আর আউলিয়া হলো তারা) যারা ঈমান এনেছে এবং তাক্ওয়া অবলম্বন করত।" (ইউনূস: ১০:৬২-৬৩)

আল্লাহ নিজে আমাদের জন্য ব্যাখ্যা করে দিয়েছেন যে, 'ওয়ালাইয়্যাহ্' বা স্রষ্টার সাথে বন্ধুত্বের মানদণ্ড হলো বিশুদ্ধ ও দৃঢ় ঈমান এবং একনিষ্ঠ তাক্ওয়া; আর সকল সত্যিকার মু'মিনদের মাঝেই এই বৈশিষ্ট্যগুলো উপস্থিত।(৩৩)

অন্যদিকে অজ্ঞ মানুষদের কাছে, ওয়ালাইয়্যাহ্ বা স্রষ্টার সাথে বন্ধুত্বের প্রধান মানদণ্ড হলো অলৌকিক কাজকর্ম সম্পাদন করা। এ কাজগুলোকে

(৩৩) আল-আক্বীদাহ আত্-ত্বাহাউইয়াহ, পৃ. ৩৫৮।

www.QuranerAlo.net

নাবিদের মুজিযা থেকে আলাদা করার জন্য সাধারণত 'কারামত' বলা হয়। এসব অজ্ঞ লোকদের কাছে অলৌকিক কার্য সম্পাদনকারীদের ঈমান এবং আমাল কোনো বিবেচ্য বিষয়ই নয়। তাই দেখা যায়, 'ওয়ালি' খেতাবপ্রাপ্ত অনেকেই ঈমানবিধ্বংসী বিশ্বাস এবং কার্যকলাপে লিপ্ত। তাদের কাউকে কাউকে শারঈ বিধিবিধান ছেড়ে দিতে দেখা যায়; এমনকি এদের অনেককেই চারিত্রিক লাম্পট্য এবং কুরুচিপূর্ণ কাজে লিপ্ত হতে দেখা যায়। অথচ আল্লাহ কোথাও তাঁর ওয়ালি হওয়ার জন্য অলৌকিক কার্য সম্পাদন করাকে কোনো শর্ত হিসেবে উল্লেখ করেননি। তাই পূর্বে যেমনটি বলা হয়েছে, ঈমান এবং তাক্ওয়াসম্পন্ন প্রত্যেক মু'মিন ব্যক্তিই আল্লাহর ওয়ালি এবং তিনিও তাদের ওয়ালি। আল্লাহ নিজেই বলেছেন,

اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا...

"যারা ঈমান এনেছে আল্লাহ তাদের ওয়ালি..." (আল-বাক্বারাহ, ২:২৫৭)

কাজেই মু'মিনদের মধ্য থেকে কিছু সংখ্যককে আলাদা করে আল্লাহর আউলিয়া বলে উপাধি দেওয়া মোটেই বৈধ নয়। ইসলামের এমন সুস্পষ্ট বক্তব্য সত্ত্বেও, সুফি মহলগুলোতে ওয়ালিদের তথাকথিত শ্রেণিবিন্যাস একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হয়ে গেছে। মর্যাদার উর্ধ্বক্রম অনুসারে তাদের ওয়ালিরা হলেন—আখিয়্যার (মনোনীত) যারা সংখ্যায় ৩০০; আব্দাল (বিকল্প) যাদের সংখ্যা ৪০ পর্যন্ত; ৭ জন আব্রার (ধর্মপরায়ণ); ৪ জন আওতাদ (পেরেক বা কীলক); ৩ জন নুকাবা (প্রহরী), একজন কুত্ব (খুঁটি) যাকে তার সমসাময়িক ওয়ালিদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ বিবেচনা করা হয়। এরপর এদের সবার উপরে রয়েছেন গাউস (ত্রাণকর্তা বা উদ্ধারকারী)। এদের অনুসারীরা বিশ্বাস করে যে, তাদের পাপের একটা অংশের দায়ভার এই গাউস বহন করবেন। সুফিদের বিশ্বাস অনুযায়ী, সর্বোচ্চ তিন পদমর্যাদার ওয়ালিরা প্রতি ওয়াক্ত সলাতে অদৃশ্যভাবে মাক্কায় উপস্থিত হন। গাউস মারা গেলে কুত্ব তার স্থলাভিষিক্ত হন এবং এমনি করে প্রতিটি শ্রেণি থেকে পবিত্রতম আত্মাসম্পন্ন ওয়ালি তার উর্ধ্বতন স্তরে উন্নীত হন।[৩৪] বাস্তব সত্য হলো,

(৩৪) Encyclopedia of Islam, পৃ. ৬২৯. See also Ali ibn Uthman al-Hajweeri, Kashf al-Mahjoob, trans. by Nicholson, (London: Luzak, 1976), পৃ. ২১৪.

www.QuranerAlo.net

এই রূপকথা খ্রিস্টধর্ম থেকে নেওয়া হয়েছে, ঠিক যেভাবে তাসবীহ্ দানা খ্রিস্টানদের জপমালা থেকে এবং মাওলিদ খ্রিস্টানদের ক্রিসমাস অনুষ্ঠান থেকে ধার করা হয়েছে।

ফানাঃ স্রষ্টার সাথে মানুষের একীভূত হওয়া

ভ্রান্ত সুফিবাদী এসব ওয়ালিদের তালিকার দিকে ভালোভাবে তাকালে আল-হাল্লাজের মতো ওয়ালি'র নামও দেখা যায়। অথচ মুরতাদ হিসেবে এই ব্যক্তির প্রকাশ্যে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়েছিল। কারণ সে তার কুখ্যাত উক্তি, "আনাল হাক্" বা আমিই পরম সত্য বলে নিজেকে একরকম প্রভু দাবি করারই স্পর্ধা দেখিয়েছিল। অথচ আল্লাহ ﷻ কুর'আনে বলেছেন,

ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَىٰ...

"এটি এজন্য যে, আল্লাহই পরম সত্য এবং তিনিই মৃতকে জীবন দান করেন...।"
(আল-হাজ্জ: ২২:৬)

যে বিশ্বাসের কারণে মস্তিষ্ক-বিকৃত আল-হাল্লাজ ওই ধরনের বক্তব্য দিতে প্ররোচিত হয়েছিল তা বৌদ্ধধর্মের চূড়ান্ত দশা 'নির্বাণ'-এর সাথে খুবই সাদৃশ্যপূর্ণ।[৩৫] বৌদ্ধ ধর্মের একটি শাখা অনুযায়ী, মানুষ এই পর্যায়ে উন্নীত হলে অহংবোধের অবসান ঘটে এবং মানবাত্মা ও আমিত্ব নির্বাপিত হয়ে যায়।[৩৬]

---

(৩৫) শব্দটি সংস্কৃত যার অর্থ 'নিভে যাওয়া' যা দ্বারা সকল জাগতিক কামনা-বাসনার নিবৃত্তি বা পাপের ফল থেকে পরিত্রাণ লাভের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। শব্দটির উৎপত্তি মূল বেদশাস্ত্র ভিত্তিক (ভগবত গীতা এবং দেব) হলেও, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শব্দটিকে বৌদ্ধধর্মের সাথে সংশ্লিষ্ট করা হয়। বৌদ্ধধর্মের হিনাইয়ানা শাখায় শব্দটিকে নির্বাপণ শব্দের সমার্থক হিসেবে গণ্য করা হয়; যদিও এই ধর্মের মাহাইয়ানা শাখায় শব্দটি পরম সুখময় অবস্থা জ্ঞাপক হিসেবে গণ্য হয়ে থাকে। (W. L. Resse, Dicitonary of Philosophy and Religion, New Jersy: Humanities Press, 1980, পৃ. ৩৯৩).

(৩৬) Dictionary of Philosophy and Religion, পৃ. ৭২.

www.QuranerAlo.net

এই ধারণা ভ্রান্ত 'সুফিবাদী' দর্শনেরও মূল ভিত্তি। সংজ্ঞানুযায়ী, এ সুফিবাদের মূল কথা (Mysticism)[৩৭] হলো স্রষ্টার সাথে একীভূত হওয়া বা স্রষ্টার মধ্যে বিলীন হওয়ার অভিজ্ঞতা এবং বিশ্বাস করা যে, এর মাঝেই মানুষের জীবনের মূল লক্ষ্য নিহিত। প্রাচীন গ্রিক দার্শনিকদের সাহিত্য-সংস্কৃতিতেও সুফিবাদের উৎপত্তি খুঁজে পাওয়া যায়। যেমন : Plato's Symposium-এ বিভিন্ন উর্ধ্বগামী সিঁড়ির কথা উল্লেখ করা হয়েছে। কষ্টকর এসব পর্যায়গুলো অতিক্রমের মাধ্যমে স্রষ্টার সাথে মানবাত্মা মিলন লাভ করে।[৩৮] হিন্দু ধর্মেও অনুরূপ ধারণা খুঁজে পাওয়া যায়, যাতে মানবাত্মাকে ব্রহ্মার সাথে একীভূত করা হয়। এখানে ব্রহ্মার সাথে মানবাত্মার মিলনের অভিজ্ঞতা লাভ করাই হলো চূড়ান্ত লক্ষ্য বা পার্থিব জীবন থেকে মুক্তি এবং পুনর্জন্ম লাভ।[৩৯]

গ্রিক সুফিবাদী চিন্তাধারার বিকাশ ঘটেছিল খ্রিষ্টানদের রহস্যবাদী আন্দোলনগুলোর (Gnostic Christian Movements) মধ্য দিয়ে যা ভ্যালেন্টিনাস আন্দোলনের (আনুমানিক ১৪০ সাল) মতো দ্বিতীয় শতাব্দীতে চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে। তৃতীয় শতাব্দীতে মিশরীয়-রোমান দার্শনিক, প্লোটাইনাস (২০৫-২৭০ সাল) এসব চিন্তাধারাকে প্লেটোর দর্শনতত্ত্বের (Platonism) সাথে সমন্বয় করে প্লেটোর নতুন দর্শনতত্ত্ব (Neoplatonism) নামে একটি ধর্মীয় দর্শনের সূচনা ঘটান। তৃতীয় শতাব্দীর যেসব খ্রিষ্টান সাধক খ্রিষ্টানদের মধ্যে সন্ন্যাস প্রথার প্রচলন করেছিল, তারা সেই সময়ের প্লেটোর নতুন দর্শনতত্ত্বের আলোকে স্রষ্টার সাথে মিলিত হওয়াকে তাদের জীবনের মূল লক্ষ্য হিসেবে গ্রহণ করেছিল। ধ্যান এবং আত্মত্যাগের মতো কঠোর সাধনার লক্ষ্যে তারা মরুভূমিতে গিয়ে আবাস গেঁড়েছিল। খ্রিষ্টীয় সন্ন্যাসবাদের প্রথম পর্বের নিয়ম-কানুনগুলো সর্বপ্রথম "St." Pachomius (সেন্ট পাকৌমিয়াস, ২৯০-৩৪৬ সাল) প্রণয়ন করেন এবং মিশরের মরুভূমিতে নয়টি আশ্রম

(৩৭) গ্রিক শব্দ 'মিস্‌টেস' থেকে শব্দটির উৎপত্তি যার অর্থ, "এমন কেউ যে রহস্যের দীক্ষা লাভ করেছে।" মূল শব্দটি এসেছে গ্রিক রহস্যবাদী ধর্মগুলো থেকে এবং এসব ধর্মের দীক্ষা লাভকারী ব্যক্তিদেরকে "মিস্‌টেস" বলা হতো। (Dictionary of Philosophy and Religion, পৃ. ৩৭৪).

(৩৮) Colliers Encyclopedia, vol. 17, পৃ. ১১৪.

(৩৯) Dictionary of Religions, পৃ. ৬৮.

www.QuranerAlo.net

প্রতিষ্ঠা করেন। অন্যদিকে ইতালির মোন্ট ক্যাসিনোতে সন্ন্যাসব্রতের বেনেডিক্টাইন নিয়ম-কানুন তৈরির কারণে "St." Benedict of Nursia (নারসিয়ার সেন্ট বেনেডিক্ট, ৪৮০-৫৪৭ সাল) পশ্চিমা সন্ন্যাসবাদের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে বিবেচিত হয়ে এসেছে।[৪০] মুসলিম সাম্রাজ্য বিস্তৃত হয়ে মিশর ও সিরিয়ার প্রধান সন্ন্যাসবাদ চর্চার কেন্দ্রগুলোকে নিজের মধ্যে অঙ্গীভূত করে নেওয়ার ১০০ বছর পর, অষ্টম শতাব্দী থেকে খ্রিস্টধর্মে সুফিবাদী ধারা ক্রমেই মুসলিমদের মাঝে ছড়িয়ে পড়তে শুরু করে।[৪১]

ইসলামি জীবনধারা নিয়ে সন্তুষ্ট নয় এমন একদল মুসলিম একটি সমান্তরাল তন্ত্র বা ব্যবস্থা গড়ে তোলে, যার নাম দেওয়া হয় 'তরিকাহ্' (পথ)। ঠিক যেভাবে হিন্দু এবং সুফিবাদী খ্রিস্টানদের পরম লক্ষ্য ছিল স্রষ্টার সাথে একীভূত হওয়া, তেমনি মুসলিমদের এই তৎপরতারও চূড়ান্ত লক্ষ্য একই হয়ে দাঁড়ায়, যার নাম তারা দেয় 'ফানা ফিল্লাহ'। অর্থাৎ সকল আমিত্ব ও অহংবোধের অবসান এবং পার্থিব জীবনেই আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ লাভ এবং তাঁর সাথে একীভূত হয়ে যাওয়া। এই চূড়ান্ত পর্যায়ে উন্নীত হওয়ার জন্য 'মাকামাত' (বিভিন্ন স্তর) এবং 'হালাত' (অবস্থা) নামক যেসব প্রাথমিক এবং ধারাবাহিক পর্যায় অতিক্রম করা প্রয়োজন তা নির্ধারণ করা হয়।

---

(৪০) Dictionary of Philosophy and Religion, পৃ. ৩৬৫-৬ and ৩৭৪.

(৪১) ইসলামি সুফিবাদ বিষয়ক গবেষণামূলক গ্রন্থসমূহের লেখকেরা সুফিবাদের 'ফানা' হওয়ার ধারণাকে বৌদ্ধধর্মের 'নিরভানা' লাভের ধারণার সাথে তুলনা করেছেন। তবে অন্যান্যদের মতে, এই ধরনের তুলনা একেবারেই অসঙ্গত। কারণ বৌদ্ধধর্মে নিরভানার যে ধারণা তা স্রষ্টার ধারণা থেকে মুক্ত। এই ধারণা অনুযায়ী, আত্মা এক দেহ থেকে অন্য দেহে স্থানান্তরিত হতে থাকে এবং নিরভানা লাভের মধ্য দিয়ে আত্মার দেহান্তর প্রক্রিয়ার পরিসমাপ্তি ঘটে। পক্ষান্তরে, ইসলামি সুফিবাদ অনুযায়ী, মৃত্যুর পর আত্মা অন্য কোনো দেহে প্রবেশ করে না, তবে সর্বত্র বিরাজমান স্রষ্টার ধারণা সুফিবাদে প্রকট। মুসলিমদের মাঝে প্রচলিত 'ফানা'ধারণার উৎপত্তি বরং খ্রিস্টান ধর্মে পাওয়া যায়; মূলত এখান থেকেই এই ধারণা ধার করা হয়েছে। এই ধারণার দ্বারা মূলত স্রষ্টার ইচ্ছাকে প্রাধান্য দিয়ে ব্যক্তিগত মানবীয় ইচ্ছাকে পুরোপুরি ধ্বংস করাকে বুঝায়। আর এটিই হলো সকল প্রকার খ্রিস্টীয় সুফিবাদের মূল কথা। (Shorter Encyclopedia of Islam, পৃ. ৯৮).

www.QuranerAlo.net

স্রষ্টার সাক্ষাৎ লাভের পদক্ষেপ হিসেবে আধ্যাত্মিক অনুশীলনের জন্য কিছু পদ্ধতিও প্রস্তুত করা হয়। এসব অনুশীলনের অংশ হিসেবে যে যিক্‌র[৪২] করা হয় তাতে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মাথা ও শরীর ঝাঁকানো হয়। এমনকি কখনো কখনো লাফালাফি ও নাচানাচিও করা হয় । এসব চর্চাকে বৈধতা দেওয়ার জন্য বিভিন্ন সূত্রে নাবি ﷺ থেকে হাদীস্ বর্ণনা করা হয়েছে। অথচ এসব চর্চার সমর্থনে হাদীস্ গ্রন্থগুলোতে বিশুদ্ধ কোনো বর্ণনার অস্তিত্ব নেই। এমনি করে নানা রকম নতুন নতুন পদ্ধতির উদ্ভব ঘটেছে। খ্রিষ্টানদের মতো প্রতিষ্ঠাতাদের নামানুসারে বিভিন্ন তরিকাহ্‌র আবির্ভাব হয়েছে; যেমন— কাদেরিয়া, সাবেরিয়া, চিশতিয়া, নক্‌শবন্দী, মুজাদ্দেদী, তীজানি ইত্যাদি। এছাড়াও তরিকাহ্‌গুলোর প্রতিষ্ঠাতাদেরকে ঘিরে রূপকথার মতো কিস্‌সা-কাহিনীর শতশত বই পুস্তক রচিত হয়েছে। অধিকন্তু, খ্রিষ্টান এবং হিন্দু সন্ন্যাসীরা যেভাবে ধ্যানের জন্য নির্জন আশ্রম বেছে নিয়েছে, তেমনি এসব সুফি তরিকাহ্‌গুলোও যাওইয়্যাহ্, খানকাহ্ বা দরগাহ নামে সেই একই ধরনের ব্যবস্থা গড়ে তুলেছে।

কালের বিবর্তনে 'স্রষ্টার সাথে মিলন'-এর এই মতবাদ থেকে এমন অনেক ধরনের অপবিশ্বাস জন্ম নেয়, যা মানুষকে ইসলাম থেকে বের করে দেয়। উদাহরণস্বরূপ, অধিকাংশ তরিকাহ্‌গুলো দাবি করে যে, উসূল স্তরে উন্নীত হতে পারলে আল্লাহর দর্শন লাভ করা যায়। অথচ আইশাহ ﵂ যখন নাবি ﷺ-কে জিজ্ঞেস করেছিলেন যে, তিনি মিরাজে গিয়ে আল্লাহকে দেখেছিলেন কি না; তিনি তখন না-সূচক উত্তর দিয়েছিলেন।[৪৩] নাবি মূসা ﵇ কে ওয়াহ্‌য়ি প্রদান করার সময় আল্লাহ তূর পাহাড়ের উপর নিজ সত্তার একটু তাজাল্লি প্রকাশ করেছিলেন; ফলে পাহাড় চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে ধুলায় পরিণত হয়। আর এভাবেই আল্লাহ মূসা ﵇-কে দেখিয়ে দিয়েছেন যে, কোনো মানুষের পক্ষে এই জীবনে আল্লাহকে দেখা সম্ভব নয়।[৪৪]

---

(৪২) সাধারণ অর্থে, 'যিক্‌র' বলতে আল্লাহকে স্মরণ করা বুঝায়। তবে সুফি মহলগুলোতে যিক্‌র হলো আল্লাহর গুণবাচক নামসমূহকে অনবরত মুখে জপতে থাকা।

(৪৩) সহীহ্ মুসলিম, (ইংরেজি অনুবাদ), খণ্ড ১, পৃ. ১১১-১২, হাদীস্ নং ৩৩৩৭, ৩৩৯ এবং পৃ. ১১৩, হাদীস্ নং ৩৪১।

(৪৪) সূরা আল-আরাফ, ৭:১৪৩।

www.QuranerAlo.net

অনেক ভ্রান্ত সুফি দাবি করে থাকে যে, উসূল স্তরে উন্নীত হয়ে গেলে শারীআহ্‌র বিধিবিধানগুলো পালন করা আর বাধ্যতামূলক থাকে না। এরা মনে করে, নাবি ﷺ কিংবা তথাকথিত এসব ওয়ালিদের মাধ্যমে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করা যায়। এদের অনেকেই ওয়ালিদের দরগাহ এবং মাজারকে ঘিরে তাওয়াফ[৪৫] করে এবং পশু কুরবানির মতো আরও অন্যান্য 'ইবাদাত কর্ম করতে শুরু করে। বর্তমানে মিশরে যায়নাব এবং সাইয়্যেদ আল-বাদায়ি, সুদানে মুহাম্মাদ আহ্‌মাদ (মাহ্‌দি) এবং ভারত ও পাকিস্তানে অসংখ্য ওয়ালি বুজুর্গদের কবরের চারপাশে তাওয়াফ করতে দেখা যায়।

শারীআহকে তারা মনে করে সাধারণ জনগণের জন্য প্রণীত বিধিবিধান; আর তাদের কতিপয় উঁচু শ্রেণির আলোকপ্রাপ্ত লোকদের জন্য বিশেষভাবে প্রণীত হয়েছে এই তরিকাহ্‌। সুফিবাদী ইসলাম-বিধ্বংসী ভ্রান্ত মতবাদগুলোকে সমর্থনযোগ্য করতে কুর'আনের বিভিন্ন আয়াতের উদ্দেশ্যপ্রণোদিত মনগড়া তাফসীরের আবির্ভাব ঘটে। এ সময় গ্রিক দর্শনের চিন্তাধারার সাথে জাল হাদীসের সংমিশ্রণ ঘটিয়ে ভিত্তিহীন সাহিত্য সম্ভার গড়ে তোলা হয়। এসব বইপুস্তক ইসলামের প্রথম যুগের বিশুদ্ধ শাস্ত্রীয় গ্রন্থগুলোকে প্রশ্নবিদ্ধ করে এবং অবশেষে বিশুদ্ধ গ্রন্থগুলোর জায়গায় ভিত্তিহীন লেখনীগুলো স্থান করে নেয়। অধিকাংশ সুফি মহলেই গান-বাজনার প্রচলন ঘটে এবং অনেকের মাঝে গাঁজার মতো মাদকের ব্যবহারও দেখা যায়। তারা যে কল্পিত আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা লাভের চেষ্টা করত, তাকে চূড়ান্ত পর্যায়ে নিয়ে যাওয়ার উপায় হিসেবেই তারা গাঁজা সেবন করে থাকে।

এই হলো সুফিবাদীদের পরবর্তী প্রজন্মের রেখে যাওয়া আদর্শ, যার মৌলিক ভিত্তি হলো আল্লাহর সাথে মানবাত্মার মিলনের ভ্রান্ত বিশ্বাস। আবদুল-কাদির জিলানী এবং তার মতো পূর্ববর্তী যেসব পুণ্যবানদের নামে এসব তরিকাহ্‌ চালানো হয়, এটা তাদের নামে সম্পূর্ণই অপবাদ। কেননা তারা স্রষ্টা এবং সৃষ্টির মধ্যকার পার্থক্য সম্পর্কে স্পষ্টতই অবগত ছিলেন এবং এই পার্থক্য বজায় রাখার গুরুত্ব অনুধাবন করতেন। সৃষ্টি এবং স্রষ্টা

(৪৫) ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে পবিত্র এবং মর্যাদাসম্পন্ন কোনো বস্তুর চারপাশে উপাসনার উদ্দেশ্যে প্রদক্ষিণ করা।

www.QuranerAlo.net

কখনো এক হতে পারে না। কারণ স্রষ্টা হলেন শাশ্বত, চিরন্তন এবং ভুলত্রুটি ও সকল দুর্বলতার উর্ধ্বে; আর মানুষ সসীম, সীমাবদ্ধ, ত্রুটিযুক্ত।

মানুষের সাথে স্রষ্টার একীভূত হওয়া

কোনো কিছুই আল্লাহর জ্ঞানের বাইরে নয়। অতএব, জ্ঞানী তারাই যারা এই কথা মনে রেখে জীবন যাপন করে। তারা সব সময় আল্লাহর উপস্থিতি অনুভব করে থাকে। তারা সর্বান্তকরণে তাদের উপর ফার্দ (ফরজ) 'ইবাদাতগুলো সম্পন্ন করে। এসব অবশ্যকরণীয় 'ইবাদাত করতে গিয়ে অনিবার্যভাবেই যেসব ভুলত্রুটি হয়ে যায়, সেগুলোর ক্ষতিপূরক হিসেবে শুধু স্রষ্টার সন্তুষ্টির জন্য তারা আরও অনেক নাফ্‌ল 'ইবাদাত কর্ম করে থাকে। এসব নাফ্‌ল 'ইবাদাতকর্ম তাদের অবশ্যকরণীয় 'ইবাদাতগুলোকে সুরক্ষিত রাখে। উদাহরণস্বরূপ, দুর্বল মুহূর্তে বা ঈমানের নাজুক অবস্থায় কারও 'ইবাদাতকর্মে শৈথিল্য আসতে পারে। তবে যারা নাফ্‌ল 'ইবাদাতেও অভ্যস্ত তাদের এ শৈথিল্য আসলেও তা নাফ্‌ল 'ইবাদাতের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে। ফলে তাদের অবশ্যকরণীয় 'ইবাদাতগুলো অক্ষত থাকবে। পক্ষান্তরে, নাফ্‌ল 'ইবাদাতের সুরক্ষা আবরণ না থাকা অবস্থায় কেউ যদি ঈমানের দুর্বলতায় পতিত হয়, তাহলে তার অবশ্যকরণীয় 'ইবাদাতই ছুটে যেতে পারে। নাফ্‌ল 'ইবাদাতের মাধ্যমে যে ব্যক্তি তার অবশ্যকরণীয় 'ইবাদাতগুলোকে যত বেশি সুদৃঢ় করবেন, তার জীবন তত বেশি সর্বশক্তিমান আল্লাহর ইচ্ছা অনুযায়ী পরিচালিত হবে। এই বিষয়টিই আল্লাহ তাঁর নাবি ﷺ-কে একটি হাদীসে কুদসির মাধ্যমে জানিয়ে দিয়েছেন। আল্লাহ ﷻ বলেন,

> "সবচেয়ে প্রিয় যে 'আমালের মাধ্যমে আমার বান্দা আমার নৈকট্য লাভ করতে পারে তা হলো, আমি তার উপর যা ফরজ করেছি। এরপর নাফ্‌ল 'ইবাদাতের মাধ্যমে বান্দা আমার নৈকট্য অর্জন করতেই থাকে, যতক্ষণ না আমি তাকে ভালোবাসি। আর আমি যখন তাকে ভালোবাসি, তখন আমি তার শ্রবণশক্তি হয়ে যাই, যা দিয়ে সে শোনে; আমি তার দৃষ্টিশক্তি হয়ে যাই, যা দিয়ে সে দেখে; আমি তার হাত হয়ে যাই, যা দিয়ে সে স্পর্শ করে; এবং আমি তার পা

www.QuranerAlo.net

হয়ে যাই, যা দিয়ে সে চলে। সে কিছু চাইলে, আমি তাকে তা দান করি। সে আমার কাছে আশ্রয় চাইলে, আমি তাকে আশ্রয় দান করি।"(৪৬)

অর্থাৎ আল্লাহর এই ওয়ালি শুধু তা-ই শোনেন, দেখেন, ধরেন এবং সেই দিকে হেঁটে যান; যা আল্লাহ বৈধ করেছেন। একই সাথে তিনি যা কিছু নিষিদ্ধ এবং যা কিছু সেদিকে চালিত করে, এমন সবকিছুই সতর্কভাবে এড়িয়ে চলেন। আসলে এটিই একমাত্র লক্ষ্য যা অর্জনের জন্য জীবন উৎসর্গ করতে হবে। এই লক্ষ্য অর্জনের মধ্যেই আল্লাহর বান্দা এবং পৃথিবীর প্রশাসক হিসেবে মানুষের দ্বৈত ভূমিকার পূর্ণতা নিহিত। কিন্তু হাদীসে উল্লিখিত পন্থা বাদ দিয়ে এই লক্ষ্য অর্জন করা অসম্ভব। প্রথমে অবশ্যকরণীয় 'ইবাদাতগুলো পরিপূর্ণভাবে পালন করতে হবে। তারপর নাফ্‌ল 'ইবাদাত কর্মগুলো নিয়মিতভাবে এবং সুন্নাহ অনুযায়ী পালন করতে হবে। এই বিষয়টির উপর গুরুত্ব আরোপ করে আল্লাহ ﷻ বলেনঃ

قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ...

"বলুন, যদি তোমরা আল্লাহকে ভালোবাসো, তাহলে আমার অনুসরণ করো, আল্লাহ তোমাদেরকে ভালোবাসবেন...।"

(আলি ইমরান ৩:৩১)

অতএব, আল্লাহর ভালোবাসা অর্জনের একমাত্র উপায় হলো তাঁর নাবির সুন্নাহ হুবহু অনুসরণ করা এবং 'ইবাদাতের ক্ষেত্রে সকল প্রকার বিদআতকে সতর্কতার সাথে পরিহার করা। আল্লাহর ভালোবাসা লাভের এই সূত্রটি নিম্নোক্ত হাদীসটিতে ফুটে উঠেছে। আবু নাজীহ বর্ণনা করেন যে, নাবি ﷺ বলেছেন,

"তোমরা আমার এবং খুলাফা রাশিদীনের সুন্নাহকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরবে। তোমাদের চোয়ালের দাঁত দিয়ে তা কামড়ে (ধরে রাখার মতো) ধরে রাখবে। আর 'ইবাদাতের মধ্যে উদ্ভাবিত সকল নতুন বিষয় (বিদআহ) থেকে সাবধান

(৪৬) আবু হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত। বুখারি, (আরবি-ইংরেজি), খণ্ড ৮, পৃ. ৩৩৬-৭, হাদীস নং ৫০৯।

www.QuranerAlo.net

থাকবে। কারণ এগুলো সবই হলো ভ্রষ্টতা এবং ভ্রষ্টতাই হলো বিপথগামিতা, যার গন্তব্য জাহান্নামের আগুন।"[৪৭]

যে ব্যক্তি নিষ্ঠার সাথে এই মূলনীতি অনুসরণ করবে, সে শুধু তা-ই শুনবে যা আল্লাহ তাকে শোনাবেন। কারণ সৎকর্মশীলদের বর্ণনা দিয়ে আল্লাহ ﷻ বলেছেন:

...وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا ﴿٦٣﴾

"আর রহমানের বান্দা তো তারাই যারা পৃথিবীতে নম্রভাবে চলাফেরা করে এবং অজ্ঞ লোকরা যখন তাদেরকে সম্বোধন করে তখন তারা বলে, 'সালাম'।"

(আল-ফুরক্বান; ২৫:৬৩)

কুর'আনের অন্যত্রও তিনি বলেছেন,

وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّىٰ يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِّثْلُهُمْ ...

"আর তিনি তো কিতাবে তোমাদের প্রতি নাযিল করেছেন যে, যখন তোমরা শুনবে আল্লাহর আয়াতসমূহ অস্বীকার করা হচ্ছে এবং সেগুলো নিয়ে উপহাস করা হচ্ছে, তাহলে তোমরা তাদের সাথে বসবে না, যতক্ষণ না তারা অন্য কথায় নিবিষ্ট হয়, তা না হলে তোমরাও তাদের মতো হয়ে যাবে..."

(আন-নিসা', ৪:১৪০)

এভাবে কেউ যখন শুধু সেই কথাই শোনে যা আল্লাহ তাকে শুনতে বলেছেন, তখন রূপকার্থে আল্লাহ নিজেই ওই ব্যক্তির শ্রবণশক্তি হয়ে যান। অনুরূপভাবে, ব্যক্তির দৃষ্টিশক্তি, হাত এবং পায়ের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য।

---

(৪৭) সুনান আবি দাউদ, (ইংরেজি অনুবাদ), খণ্ড ৩, পৃ. ১২৯৪, হাদীস নং ৪৫৯০ এবং তিরমিযি।

www.QuranerAlo.net

এটাই হলো উল্লিখিত হাদীসটির বিশুদ্ধ ব্যাখ্যা, যাতে আল্লাহ বলেছেন তিনি মানুষের শ্রবণশক্তি, দৃষ্টিশক্তি, হাত এবং পা হবেন। দুর্ভাগ্যবশত, সুফিবাদীরা মানুষের সাথে স্রষ্টার একীভূত হওয়ার ধারণাকে বৈধতা দেওয়ার জন্য হাদীসটির ভুল ব্যাখ্যা করেছে—নাউযুবিল্লাহ।

রূহুল্লাহঃ 'আল্লাহর আত্মা'

মিথ্যা অনুসিদ্ধান্তের ভিত্তিতে কুর'আনের কিছু আয়াতের ভুল ব্যাখ্যা করা হয়ে থাকে। এর উদ্দেশ্য হলো, মানবাত্মার সাথে আল্লাহর পুনর্মিলনের সুফীবাদী বিশ্বাসকে সত্য বলে প্রমাণ করা। নিম্নোক্ত আয়াতগুলোতে আল্লাহ ﷻ বলেছেনঃ

ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُّوحِهِ ...

"তারপর তিনি তাকে সুঠাম করেছেন এবং তাতে নিজের রূহ থেকে ফুঁকে দিয়েছেন।..." (আস-সাজদাহ, ৩২:৯ এবং সূরা সদ, ৩৮:৭২)

এবং

فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي ...

"অতএব, যখন আমি তাকে পূর্ণাঙ্গ রূপ দেবো এবং তার মধ্যে আমার রূহ ফুঁকে দেবো।" (আস-সাজদাহ, ১৫:২৯ এবং সূরা সদ, ৩৮:৭২)

উল্লিখিত আয়াতগুলোকে এই বিশ্বাসের পক্ষে প্রমাণ হিসেবে ব্যবহার করা হয় যে, প্রতিটি মানুষের দেহের ভিতর আল্লাহর একটি অংশ বিদ্যমান। আল্লাহ তাঁর রূহের যে অংশ আদামের মধ্যে ফুঁকে দিয়েছিলেন তা আদামের সকল বংশধর উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছে বলে ধরে নেওয়া হয়। নাবি ঈসা ﷺ এর প্রসঙ্গও উল্লেখ করা হয়েছে, যার মা সম্পর্কে আল্লাহ ﷻ বলেছেন,

www.QuranerAlo.net

وَالَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهَا مِن رُّوحِنَا...

"সে ছিল সতী, অতঃপর আমি আমার রূহ থেকে তার মধ্যে ফুঁকে দিয়েছিলাম...।"

(আল-আম্বিয়া, ২১:৯১ এবং সূরা আত-তাহ্‌রিম, ৬৬:১২)

এসব আয়াতের ভুল ব্যাখ্যা করে সুফিরা বিশ্বাস করে যে, মানুষের মাঝে চিরন্তন ঐশ্বরিক রূহ বিদ্যমান এবং তা যেখান থেকে এসেছে সেখানে ফিরে গিয়ে মূল উৎসের সাথে পুনর্মিলিত হতে ব্যাকুল। বাস্তবে ব্যাপারটি মোটেই এমন নয়। কোন প্রসঙ্গে ব্যবহার হয়েছে তার উপর ভিত্তি করে, বাংলা সম্বন্ধবাচক সর্বনামের (আমার, তোমার, তার, আমাদের) মতো আরবি সম্বন্ধবাচক সর্বনামেরও দুই ধরনের সাধারণ অর্থ হতে পারে। এই সর্বনামগুলো কর্তার বৈশিষ্ট্য বা তার অধিকারে থাকা এমন কোনো বস্তুকে বুঝানোর জন্য ব্যবহৃত হয়, যা কর্তার অংশ হতেও পারে আবার নাও হতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, আল্লাহ মূসা ﷺ কে আদেশ করেছিলেন,

وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلَىٰ جَنَاحِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ...

"তোমার জামার ভিতর তোমার হাত রাখো আর এটা উজ্জ্বল হয়ে বের হয়ে আসবে ক্ষতি ছাড়াই..."

(ত্ব-হা, ২০:২২)

আয়াতে উল্লিখিত 'হাত' এবং 'জামা' উভয়ই নাবি মূসার। তবে হাত তার মানবীয় বৈশিষ্ট্য, কারণ এটি তার শরীরের অংশ। অন্যদিকে জামাটি তার অধিকারগত বস্তু হলেও সেটি তার বৈশিষ্ট্য নয়, কারণ সেটি তার শরীরের অংশ নয়। স্রষ্টা সম্পর্কেও এই উপমা প্রযোজ্য। অর্থাৎ, তাঁর গুণাবলি তাঁর অংশ, কিন্তু তাঁর সৃষ্টি তাঁর অংশ নয়।[৪৮] উদাহরণস্বরূপ, নিজের অপার করুণা সম্পর্কে আল্লাহ ﷻ বলেন,

...وَاللَّهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ...

"...আর আল্লাহ যাকে ইচ্ছা তাকে বিশেষভাবে তাঁর করুণা দান করেন..."

(আল-বাক্বারাহ, ২:১০৫)

(৪৮) তাইসীর আল-আযীয আল-হামীদ, পৃ. ৮৪-৫।

www.QuranerAlo.net

আল্লাহর অন্যতম গুণ হলো তাঁর করুণা। তাঁর করুণা তাঁর সৃষ্টির অংশ নয়। পক্ষান্তরে, অনেক সময় আল্লাহ সৃষ্ট বস্তুকে "তাঁর" বলে উল্লেখ করার মাধ্যমে তিনিই যে ওই বস্তুর স্রষ্টা, সে বিষয়ের উপর গুরুত্বারোপ করেছেন। আবার অনেক কিছুকে তিনি যে মর্যাদার দৃষ্টিতে দেখেন তা ইঙ্গিত করার জন্য সেটিকে "তাঁর" বলে উল্লেখ করেছেন। উদাহরণস্বরূপ, নাবি সালিহ্ ﷺ-এর উম্মাহ সামুদ সম্প্রদায়ের কাছে পরীক্ষাস্বরূপ যে উটনী পাঠানো হয়েছিল, সে সম্পর্কে সালিহ্ ﷺ যা বলেছিলেন, আল্লাহ তা উদ্ধৃত করে বলেছেন,

...هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ...

"...এটি আল্লাহর উটনী, তোমাদের জন্য নিদর্শনস্বরূপ। সুতরাং তোমরা তাকে ছেড়ে দাও, সে আল্লাহর পৃথিবীতে আহার করুক।..." (আল-আরাফ, ৭:৭৩)

সামুদ সম্প্রদায়ের কাছে উটনীটি অলৌকিক নিদর্শনস্বরূপ পাঠানো হয়েছিল। সেটিকে পৃথিবীতে চরতে বাধা দেওয়ার কোনো অধিকার সামুদ সম্প্রদায়ের ছিল না। কারণ পুরো পৃথিবীই আল্লাহর। কাবার ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য, যার ব্যাপারে আল্লাহ নাবি ইবরাহীম ﷺ এবং ইসমা'ঈল ﷺ থেকে অঙ্গীকার গ্রহণ করেছিলেন,

...أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ ﴿١٢٥﴾

"...আর আমি ইবরাহীম ও ইসমাঈলকে দায়িত্ব দিয়েছিলাম যে, তোমরা আমার গৃহকে তাওয়াফকারী, ইতিকাফকারী ও রুকূকারী-সিজদাকারীদের জন্য পবিত্র করো।" (আল-বাক্বারাহ, ২:১২৫)

আবার কিয়ামাতের দিন সৎকর্মশীলদেরকে আল্লাহ জান্নাতে প্রবেশ করতে বলবেন এইভাবে—"আমার জান্নাতে প্রবেশ করো।"(৪৯)

রূহ বা আল্লাহর রূহ বিষয়টি হলো, এটি আল্লাহর অন্যতম সৃষ্টি। কুর'আনে আল্লাহ ঘোষণা করেছেন,

(৪৯) সূরা আল-ফাজ্‌র ; ৮৯:৩০

www.QuranerAlo.net

وَيَسْـَٔلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ ۖ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا ﴿٨٥﴾

"আর তারা আপনাকে রূহ সম্পর্কে প্রশ্ন করে। বলুন, রূহ আমার রবের আদেশ থেকে, আর তোমাদেরকে জ্ঞানের অতি সামান্যই দেওয়া হয়েছে।"

(আল-ইস্‌রা, ১৭:৮৫)

কুর'আনের অন্যত্র তিনি আরও বলেছেন,

... إِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ ﴿٤٧﴾

"তিনি যখন কোনো বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেন, তখন তাকে শুধু বলেন, 'হও', আর অমনি তা হয়ে যায়।" (আলি ইমরান ৩:৪৭)

আল্লাহ ﷻ আরও বলেছেন,

... خَلَقَهُ مِن تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُن فَيَكُونُ ﴿٥٩﴾

"...তিনি তাকে মাটি দ্বারা সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তাকে বললেন, 'হও', ফলে সে হয়ে গেল।" (আলি ইমরান ৩:৫৯)

সৃষ্টির সকল কিছুই 'হও' আদেশের মাধ্যমে সৃষ্টি হয়েছে। সুতরাং, আত্মাও সৃষ্টি হয়েছে আল্লাহর আদেশেই। অন্যান্য ভ্রান্ত দর্শনের মতো ইসলাম স্রষ্টাকে কোনো অশরীরী আত্মা হিসেবে বিবেচনা করে না। স্রষ্টার বস্তুগত বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন কোনো শরীর নেই, আবার তিনি নিরাকার কোনো আত্মাও নন। অবশ্যই তাঁর আকার-আকৃতি রয়েছে এবং তা তেমনই যা তাঁর সুমহান মর্যাদার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ; যা কোনো মানুষ কখনো দেখেনি বা কল্পনা করেনি; যে আকার শুধুমাত্র জান্নাতের অধিবাসীদের কাছে (মানুষের সীমাবদ্ধ দৃষ্টিশক্তি অনুযায়ী যতটুকু দেখা সম্ভব ততটুকুই) দৃষ্টিগোচর হবে।[৫০] ফলে

(৫০) এ প্রসঙ্গে বিস্তারিত আলোচনার জন্য এই বইয়ের ৯ম অধ্যায়, আল্লাহর দর্শন লাভ' দ্রষ্টব্য।

www.QuranerAlo.net

আল্লাহ তাঁর 'রূহ' থেকে নাবি আদাম এবং ঈসা ﷺ-এর মধ্যে রূহ ফুঁকে দেওয়ার কথা বলে তাদের রূহকে সম্মানিত করেছেন। পাশাপাশি সমগ্র মানব জাতির উপর আদাম ﷺ এর শ্রেষ্ঠত্বকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। একই সাথে মারইয়াম কুমারী হওয়া সত্ত্বেও কীভাবে নাবি ঈসা ﷺ-কে জন্ম দিলেন সে বিষয়ে সংশয় দূর করেছেন। মানুষের মধ্যে রূহ প্রবেশ করা এবং তা বের করে আনার কাজটি ফেরেশতাদের কাজ। অথচ রূহ ফুঁকে দেওয়ার কাজটি আল্লাহ নিজে করেছেন বলে উল্লেখ করেছেন। এর মাধ্যমে মূলত যে বিষয়টি ব্যাখ্যা করা হয়েছে তা হলো, আল্লাহর ইচ্ছা এবং অসীম ক্ষমতা ব্যতীত কোনো কিছুই হয় না। বিষয়টি ইব্‌ন মাসউদ থেকে বর্ণিত নিম্নোক্ত হাদীসের মাধ্যমে সুস্পষ্ট। তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন,

> "মাতৃগর্ভে চল্লিশ দিন যাবৎ তৈলাক্ত পদার্থের আকারে, এরপর চল্লিশ দিন জোঁকের আকৃতিতে আলাকাহ্‌র আকারে, এবং অনুরূপকাল গোশতপিণ্ডের আকারে—(এই তিন পর্যায়ের) মিলিতরূপে তোমার সৃষ্টি। তারপর একজন ফেরেশতা পাঠানো হয় তার মধ্যে রূহ ফুঁকে দেওয়ার জন্য..."(৫১)

এমনটি করেই আল্লাহ তাঁর ফেরেশতার মাধ্যমে প্রতিটি মানুষের মধ্যে রূহ প্রবিষ্ট করান। মূলত "তিনি ফুঁকে দিয়েছিলেন"- বলে তিনি আমাদেরকে মনে করিয়ে দেন যে, তাঁর সৃষ্টিতে যা কিছু ঘটে তার সবকিছুর প্রাথমিক কারণ তিনি নিজেই। যেমনটি তিনি বলেছেন,

وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ ﴿٩٦﴾

"অথচ আল্লাহই তোমাদেরকে এবং তোমরা যা করো তা সৃষ্টি করেছেন।"

(আস্‌-সাফ্‌ফাত, ৩৭:৯৬)

বাদ্‌র যুদ্ধ শুরু হওয়ার সময়, নাবি ﷺ এক মুঠো ধুলো কয়েক শ গজ দূরে অবস্থানকারী সমবেত শত্রু পক্ষের উদ্দেশ্যে ছুঁড়ে মারেন। কিন্তু ধুলোর কণাগুলো আল্লাহ অলৌকিকভাবে শত্রুদের চোখ পর্যন্ত পৌঁছে দেন। এক্ষেত্রে রসূল ﷺ এর কর্মপ্রচেষ্টাকে আল্লাহ নিম্নোক্ত ভাষায় বর্ণনা করেছেনঃ

(৫১) বুখারি, (আরবি-ইংরেজি), খণ্ড ৪, পৃ. ২৯০-১, হাদীস নং ৪৩০ এবং মুসলিম, (ইংরেজি অনুবাদ), খণ্ড ৪, পৃ. ১৩৯১, হাদীস নং ৬৩৯০।

www.QuranerAlo.net

...وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ...

"...আর তুমি নিক্ষেপ করোনি যখন তুমি নিক্ষেপ করেছিলে; বরং আল্লাহই নিক্ষেপ করেছিলেন...।" (আল-আনফাল, ৮:১৭)

কাজেই আল্লাহ তাঁর রূহ থেকে ফুঁকে দেওয়ার কথা বলে মূলত আদামের রূহকে অন্য সকল রূহের উপর বিশেষ মর্যাদা দান করেছেন। বিষয়টি এমন নয় যে, আল্লাহর নিজের একটি রূহ আছে এবং সেই রূহের অংশবিশেষ তিনি নাবি আদাম এবং ঈসা ﷺ এর মধ্যে ফুঁকে দিয়েছেন। বিষয়টিকে আরও সুদৃঢ় এবং সুস্পষ্ট করার জন্য আল্লাহ মারইয়ামের কাছে যে ফেরেশতাকে পাঠিয়েছিলেন তাকেও 'তাঁর রূহ' বলে উল্লেখ করেছেন। যেমন তিনি বলেন,

...فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا ﴿١٧﴾

"...তখন আমরা তার নিকট আমাদের রূহকে প্রেরণ করলাম। অতঃপর সে তাঁর সামনে পূর্ণ মানবের রূপ ধারণ করল।" (মারইয়াম, ১৯:১৭)

কুর'আনের কোনো আয়াতকে বিচ্ছিন্নভাবে বুঝা যাবে না; বরং সঠিক বুঝ পেতে হলে সামগ্রিকভাবে বিবেচনা করতে হবে। কুর'আনের প্রতিটি আয়াত একটি আরেকটির ব্যাখ্যাস্বরূপ এবং নাবি ﷺ-এর সুন্নাহ আয়াতগুলোকে আরও বেশি সুস্পষ্ট এবং সহজবোধ্য করে দেয়। যখন পূর্বাপর প্রসঙ্গকে উপেক্ষা করে কুর'আনের কোনো আয়াতকে বিবেচনা করা হয়, তখন সহজেই কুর'আনের অর্থবিকৃতি ঘটতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, সূরা আল-মাউনের ৪ নং আয়াতে বলা হয়েছে,

فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ ﴿٤﴾

"অতএব, সলাত আদায়কারীদের জন্য সর্বনাশ।" (আল-মাউন, ১০৭:৪)

শুধু যদি এই আয়াতটির কথা বিবেচনা করা হয়, তাহলে এর অর্থ সমগ্র কুর'আনের বাকি অংশ এবং ইসলামের সাথে সম্পূর্ণরূপে সাংঘর্ষিক। সমগ্র

www.QuranerAlo.net

কুর'আন জুড়ে সলাত আদায় করা বাধ্যতামূলক বলে উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন, আল্লাহ ﷻ বলেছেন,

إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي ﴿١٤﴾

"নিশ্চয়ই আমি আল্লাহ, আমি ছাড়া কোনো (সত্য) ইলাহ নেই; সুতরাং আমার ইবাদাত করো এবং আমার স্মরণার্থে সলাত কায়েম করো।" (ত্ব-হা, ২০:১৪)

অথচ আগের আয়াতটিতে সলাত আদায়কারীদেরকে অভিশাপ দেওয়া হয়েছে! তবে, আয়াতটির নিহিতার্থ সূরা আল-মাউনের পরের আয়াতগুলোর মাধ্যমে স্পষ্ট হয়ে যায়। যেমন,

الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ﴿٥﴾ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ ﴿٦﴾ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ ﴿٧﴾

"যারা নিজেদের সলাতে অমনোযোগী, যারা লোক দেখানোর জন্য তা করে এবং ছোট-খাটো সামগ্রী দানে নিষেধ করে।" (আল-মাউন, ১০৭:৫-৭)

দেখা গেল, আল্লাহর অভিশাপ সকল সলাত আদায়কারীদের উপর নয়; বরং এই অভিশাপ শুধু ওইসব কপটাচারীদের সলাতের উপর যারা মু'মিন হওয়ার ভান করে।

"তারপর তিনি তাকে (আদামকে) সুঠাম করেছেন এবং তাতে (আদামের দেহে) নিজের রূহ থেকে ফুঁকে দিয়েছেন,"—এই আয়াতের আরও অর্থপূর্ণ ভাষান্তর হলো, "তারপর তিনি তাকে সুঠাম করেছেন এবং তার মধ্যে তাঁর (সম্মানিত) রূহসমূহ থেকে (ফেরেশতাদের মাধ্যমে) একটি রূহ প্রবেশ করিয়েছেন।" কাজেই, মানবাত্মা তার উৎস তথা স্রষ্টার সাথে পুনর্মিলিত হওয়ার জন্য ব্যাকুল বলে সুফিবাদীদের যে বিশ্বাস, সেই বিশ্বাসের পক্ষে কুর'আন সুন্নাহ্য় কোনো ভিত্তি নেই। ইসলামি পরিভাষা অনুযায়ী, মানুষের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হলে, আরবি রূহ (বহুবচন, আরওয়াহ্) এবং নাফস (বহুবচন, আনফুস) এর মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই; যতক্ষণ না তা শরীরের সাথে

www.QuranerAlo.net

সংযুক্ত হয়। শরীরের মধ্যে প্রবেশের পর রূহকে সাধারণত নাফস হিসেবে উল্লেখ করা হয়ে থাকে।[৫২] কুর'আনে আল্লাহ বলেছেন:

اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا ...

"আল্লাহ জীবসমূহের মৃত্যুর সময় তাদের প্রাণ হরণ করেন এবং যারা মরেনি তাদের নিদ্রার সময়।..." (আয-যুমার, ৩৯:৪২)

উম্মু সালামাহ ﷺ থেকে বর্ণনা করা হয়েছে যে, নাবি ﷺ বলেছেন,

"নিশ্চয়ই যখন আত্মাকে (রূহ) হরণ করে নিয়ে যাওয়া হয়, চোখ তাকে অনুসরণ করে।"[৫৩]

যে সকল সৎকর্মশীল, সফলকাম আত্মাকে জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে তাদের উদ্দেশ্যে আল্লাহ বলেছেন,

يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ﴿٢٧﴾ ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً ﴿٢٨﴾ فَادْخُلِي فِي عِبَادِي ﴿٢٩﴾ وَادْخُلِي جَنَّتِي ﴿٣٠﴾

"হে প্রশান্ত আত্মা! তুমি ফিরে এসো তোমার রবের প্রতি সন্তুষ্টচিত্তে, সন্তোষজনক হয়ে। অতঃপর আমার বান্দাদের মধ্যে শামিল হয়ে যাও। আর প্রবেশ করো আমার জান্নাতে।" (আল-ফাজ্‌র; ৮৯:২৭-৩০)

কাজেই শেষ কথা হলো, প্রশান্ত মানবাত্মা স্রষ্টার মাঝে বিলীন হয়ে যাবে না, স্রষ্টার অসীম সত্তার সাথে মিলিতও হবে না; বরং একটি সসীম আত্মা হিসেবে সসীম দেহের সাথে পুনর্মিলিত হয়ে জান্নাতের সুখ উপভোগ করতে থাকবে যতদিন আল্লাহ চাইবেন।

---

(৫২) আল-আক্বীদাহ্ আত-তাহাবিয়্যাহ্, পৃ. ৩৯৪।
(৫৩) সহীহ্ মুসলিম, (ইংরেজি অনুবাদ), খণ্ড ২, পৃ. ৪৩৭, হাদীস্ নং ২০০৫।

www.QuranerAlo.net

একাদশ অধ্যায়

কবরপূজা

মানব ইতিহাসের অধিকাংশ সময় জুড়েই মৃত ব্যক্তিদের সম্মান দেখাতে গিয়ে বাড়াবাড়ি করা হয়েছে। জমকালো অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে তাদের দাফনকার্য সম্পন্ন করা হয়েছে, তাদের সমাধিকে নানাভাবে সজ্জিত করা হয়েছে। অধিকন্তু, মৃত্যু পরবর্তী স্মৃতিচারণ ও ভক্তিমূলক আচার অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তাদের প্রতি সম্মান দেখানো হয়েছে। আর এসবই ধর্মের মধ্যে বিভ্রান্তি এবং বিপথগামিতার জন্ম দিয়েছে। ফলে মানবজাতির অধিকাংশই কোনো না কোনোভাবে কবরপূজায় জড়িয়ে পড়েছে। যেমন ধরুন, চাইনিজ জাতির কথা। গোটা মানবজাতির প্রায় এক-তৃতীয়াংশ থেকে এক-চতুর্থাংশই হলো এরা। আর এদের অধিকাংশেরই ধর্ম হলো পূর্বপুরুষদের পূজা করা। তাদের অধিকাংশের ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান কবরকেন্দ্রিক এবং স্মরণীয় পূর্বপুরুষদের উপাসনামূলক।[৫৪] হিন্দু, বৌদ্ধ এবং খ্রিস্টানদের মাঝে পুণ্যবান বা ধার্মিক লোকদের কবরগুলো পুণ্যস্থানে পরিণত হয়েছে, যেগুলোতে ব্যাপকহারে পূজা, পশু উৎসর্গ এবং তীর্থযাত্রা করা হচ্ছে।

কালের আবর্তে, মুসলিম শাসকগণ ও সাধারণ জনগোষ্ঠী ইসলামি আক্বীদার মৌলিক শিক্ষা থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়ার কারণে তাদের চারপাশের

---

(৫৪) পূর্বপুরুষদের অর্চনা করা (Pai Tsu) চীনাধর্ম এবং ঐতিহ্যবাহী চীনা সমাজের সবচেয়ে প্রাচীন, ধারাবাহিক এবং প্রভাব বিস্তারকারী দিকগুলোর অন্যতম। তাদের বিশ্বাস অনুযায়ী, মৃত ব্যক্তিদের অশরীরী আত্মা, Hun এবং স্থূল আত্মা, P'o তাদের টিকে থাকা এবং সুখের জন্য জীবিত বংশধরদের দেওয়া আত্মামূল্য, ধূপকাঠি জ্বালানো, খাদ্য এবং পানীয় উৎসর্গের উপর নির্ভরশীল। বিনিময়ে, অশরীরী আত্মাটি একটি দেবতা হিসেবে তার অতিপ্রাকৃতিক যোগাযোগের মাধ্যমে পরিবারের জন্য ব্যাপক কল্যাণ বয়ে আনতে পারে। সাধারণ পূর্বপুরুষদের ক্ষেত্রে এই সম্পর্ক তিন থেকে পাঁচ প্রজন্ম পর্যন্ত বজায় থাকে বলে বিবেচনা করা হয়। এই সময়ের পর, আগের আত্মাগুলোর স্থানে সর্বসাম্প্রতিককালে মৃত্যুবরণকারী পূর্বপুরুষদের আত্মাগুলো স্থলাভিষিক্ত হয়। (Dictionary of Religions, পৃ. ৩৮).

www.QuranerAlo.net

অমুসলিম জাতিগুলোর পৌত্তলিক রীতিনীতির অনুকরণ করতে শুরু করেছে। আলি ﷺ এর মতো সহাবি, ইমাম আবু হানীফা এবং ইমাম আশ শাফিঈ ﷺ এর মতো বিশিষ্ট ফাকীহ এবং সুফিদের কাছে 'ওয়ালি' উপাধিপ্রাপ্ত জুনায়েদ এবং আব্দুল-কাদির জিলানীর কবরের উপর বিশালাকৃতির সৌধ (গম্বুজ) নির্মাণ করা হয়েছে। সাম্প্রতিককালে, বিভিন্ন সামাজিক আন্দোলনের নেতা যেমন, পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠাতা মুহাম্মাদ আলি জিন্নাহ এবং সুদানের তথাকথিত মাহদি, মুহাম্মাদ আহমাদের কবরকেও মাজার হিসেবে নির্মাণ করা হয়েছে। অনেক অজ্ঞ মুসলিম দূরদূরান্ত থেকে এসব সমাধিতে আসে এগুলোকে তাওয়াফ করার জন্য। অনেকেই এসবের ভিতরে অথবা বাইরে সলাত আদায় করে। অনেকে আবার এসব অভিশপ্ত স্থানে কুরবানি করার জন্য সঙ্গে করে পশুও নিয়ে আসে। যারা কবরে এসে 'ইবাদাত করে তাদের অধিকাংশের বিশ্বাস হলো, পুণ্যবান মৃত ব্যক্তিরা আল্লাহর এতটাই নৈকট্যপ্রাপ্ত যে, তাদের সমাধির আশেপাশে দুআ করলে তা কবুল হওয়ার সম্ভাবনা খুবই বেশি। অর্থাৎ, এই মৃত ব্যক্তিরা যেহেতু আল্লাহর অনুগ্রহপ্রাপ্ত, তাই তাদের আশেপাশে যা কিছু থাকে, সেগুলোও অবশ্যই অনুগ্রহপ্রাপ্ত। এমনকি তাদের কবর এবং তার আশপাশের সবকিছুতেই সে বরকতের ছটা ছড়িয়ে আছে। এই বিশ্বাসের কারণে, কবর পূজারীরা কবরের দেওয়ালে হাত বুলায়, তারপর সেই হাত নিজেদের শরীরে বুলিয়ে থাকে। নিষ্ফল বিশ্বাস নিয়ে তারা অনেক সময় কবরের আশেপাশের মাটি সংগ্রহ করে। তাদের ধারণা, এই মাটিতে যারা শুয়ে আছে, তাদের বরকতের প্রভাব সেই মাটিতেও বিদ্যমান। শিয়া সম্প্রদায়ের মধ্যে কিছু গোষ্ঠী আছে যাদের অনেকেই হুসাইন ﷺ কারবালার যে স্থানে শহীদ হয়েছিলেন, সেখান থেকে কাদা এনে শুকিয়ে মাটির ফলক তৈরি করে এবং সলাতের মধ্যে সেগুলোর উপর সিজদা করে।

মৃতের কাছে প্রার্থনা করা

যারা কবর পূজা করে তারা দুইভাবে নিজেদের 'ইবাদাতকর্মকে মৃত ব্যক্তির উদ্দেশ্যে নিবেদন করে থাকেঃ

www.QuranerAlo.net

১. অনেকেই মৃত ব্যক্তিদেরকে সুপারিশকারী হিসেবে গ্রহণ করে। মৃত ব্যক্তিদের কাছে তাদের এই প্রার্থনা করাটা ক্যাথলিক খ্রিস্টানদের মতো, যারা যাজকদের কাছে নিজেদের পাপের স্বীকারোক্তি দিয়ে থাকে। এরপর যাজকরা পাপীর পক্ষ থেকে স্রষ্টার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে। এমনি করে যাজকরা স্রষ্টা এবং মানুষের মাঝে মধ্যস্থতাকারী হিসেবে কাজ করে।

ইসলামপূর্ব আরবের লোকেরাও তাদের মূর্তিগুলোকে একইভাবে দেখত। মাক্কার পৌত্তলিকদের সে উদ্দেশ্য সম্পর্কে তাদের নিজেদের বক্তব্যকেই আল্লাহ উদ্ধৃত করেছেন,

...مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ...

"...আমরা কেবল এজন্যই তাদের 'ইবাদাত করি যে, তারা আমাদেরকে আল্লাহর নিকটবর্তী করে দেবে।..." (আয-যুমার, ৩৯:৩)

কিছু কবরপূজারী মৃত ব্যক্তিদের কাছে এই জন্য প্রার্থনা করে, যেন তারা তাদের আবেদন-নিবেদনগুলো আল্লাহর কাছে পৌঁছে দেয় এবং আল্লাহ তা কবুল করে নেন। এই ধরনের চর্চার মূল ভিত্তি হলো তাদের অপবিশ্বাস। তারা মনে করে, পুণ্যবান ব্যক্তিরা আল্লাহর শুধু নিকটবর্তীই নয়; বরং মৃত্যুর পরও তারা জীবিতদের অনুরোধ শুনতে এবং সেগুলো পূরণ করতে সক্ষম! এভাবেই মৃত ব্যক্তি এমন মধ্যস্থতাকারী মূর্তি হয়ে ওঠে, যে জীবিতদের উপকার করতে সক্ষম বলে বিশ্বাস করা হয়।

২. এমন অনেক লোকও আছে যারা মৃত ব্যক্তির কাছে নিজের কৃত পাপের জন্য সরাসরি ক্ষমা প্রার্থনা করে। এমনটি করার মাধ্যমে তারা আল্লাহর আত-তাওয়াব (যিনি একমাত্র তাওবা গ্রহণকারী) এবং আল-গাফূর (যিনি একমাত্র পাপ ক্ষমাকারী) নামসমূহের বৈশিষ্ট্যকে মৃত মানুষের উপর আরোপ করে। এসব কবরপূজারী এবং ক্যাথলিক খ্রিস্টানদের চর্চার মধ্যে দারুণ মিল রয়েছে। আর তা হলো, এরা উভয়েই নিজেদের অভাব-অভিযোগ পূরণের জন্য ওয়ালি সাধকদেরকে স্মরণ করে থাকে। উদাহরণস্বরূপ, কোনোকিছু হারিয়ে গেলে খুঁজে পেতে সাহায্য করার জন্য থীবজ এর সেন্ট অ্যান্টোনির

www.QuranerAlo.net

কাছে প্রার্থনা করা হয়।[৫৫] সেন্ট জুড থ্যাডিউস হলো অসম্ভব সাধনের প্রধান সেন্ট এবং দুরারোগ্য ব্যাধি, অসম্ভব বিয়ে ইত্যাদিতে তার হস্তক্ষেপ কামনা করে তার কাছে প্রার্থনা করা হয়।[৫৬] কেউ ভ্রমণে বের হলে ভ্রমণকারীদের রক্ষাকারী প্রধান সেন্ট হিসেবে সেন্ট ক্রিস্টোফারের কাছে নিরাপত্তা কামনা করা হতো। তবে ১৯৬৯ সালে যখন জানা গেলো যে, ওই নামের বাস্তবে কোনো সেন্ট নেই, তখন পোপের নির্দেশক্রমে আনুষ্ঠানিকভাবে তার নাম সেন্টদের তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয়।[৫৭] নাবি ঈসা ﷺ সম্পর্কে খ্রিস্টানদের দৃষ্টিভঙ্গি বিবেচনা করলে সাধারণভাবে তাদের সবাই এই শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত যারা তাকে মানুষের রূপ ধারণকারী ঈশ্বর বলে বিশ্বাস করে। অধিকাংশ খ্রিস্টানই স্রষ্টার পরিবর্তে যিশুর কাছে প্রার্থনা করে। পৃথিবীজুড়ে খ্রিস্টানদের মতো এমন অনেক অজ্ঞ মুসলিম আছে যারা নাবি মুহাম্মাদ ﷺ এর কাছে প্রার্থনা করে থাকে।

উল্লিখিত উভয় প্রকার কবরপূজাই ইসলামের দৃষ্টিতে প্রত্যাখ্যাত। কারণ ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী, যে মারা গেল সে বারযাখ জগতে প্রবেশ করল; যেখানে মৃত ব্যক্তির সকল কর্ম বন্ধ হয়ে যায়। জীবিতদের জন্য কোনোকিছু করা আর তার পক্ষে কিছুতেই সম্ভব নয়। তবে জীবিত থাকতে তার করে যাওয়া আমাল সে মারা যাওয়ার পরও অন্যদেরকে প্রভাবিত করতে পারে এবং তার পুরস্কার বা শাস্তিকে বৃদ্ধি করতে পারে। আবু হুরায়রা ﷺ বর্ণনা করেন যে, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন,

> "কোনো মানুষ যখন মারা যায়, তার 'আমালসমূহ বন্ধ হয়ে যায়; তবে তিনভাবে চলতে থাকে। ১. এমন দান যার দ্বারা মানুষ উপকার পেতে থাকে; ২. এমন জ্ঞান যার দ্বারা মানুষ অনবরত উপকৃত হয়; ৩. কোনো সৎকর্মশীল সন্তান যে তার জন্য দুআ করে।"[৫৮]

---

(৫৫) The World Book Encyclopedia, (Chicago: World Book, Inc., 1987), vol. 1, পৃ. ৫০৯.

(৫৬) The World Book Encyclopedia, (Chicago: World Book, Inc., 1987), vol. 11, পৃ. ১৪৬.

(৫৭) The World Book Encyclopedia, (Chicago: World Book, Inc., 1987), vol. 3, পৃ. ৪১৭.

(৫৮) সহীহ্ মুসলিম, (ইংরেজি অনুবাদ), খণ্ড ৩, পৃ. ৮৬৭, হাদীস্ নং ৪০০৫।

www.QuranerAlo.net

নাবি ﷺ এই বিষয়টিও সম্ভাব্য সকল উপায়ে বুঝানোর চেষ্টা করেছেন যে, সম্পর্কের দিক থেকে কেউ তাঁর সাথে যত ঘনিষ্ঠই হোক না কেন, তিনি কারও উপকার করতে সক্ষম নন। আল্লাহ কুর'আনে তাঁকে নির্দেশ দিয়েছেন, তিনি যেন তাঁর অনুসারীদের জানিয়ে দেনঃ

قُل لَّا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ ۚ وَلَوْ كُنتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ ۚ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿١٨٨﴾

"বলুন, আমি আমার নিজেরও কোনো উপকার বা ক্ষতি করার ক্ষমতা রাখি না; তবে আল্লাহ যা চান। আর আমি যদি গাইব জানতাম, তাহলে অধিক কল্যাণ লাভ করতাম এবং আমাকে কোনো ক্ষতি স্পর্শ করত না। আমি তো একজন সতর্ককারী ও সুসংবাদদাতা এমন কওমের জন্য, যারা বিশ্বাস করে।"

(আল-আরাফ, ৭:১৮৮)

বিশিষ্ট সহাবি আবু হুরায়রা ﷺ বর্ণনা করেন যে,

وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ ﴿٢١٤﴾

"আর তুমি তোমার নিকটাত্মীয়দেরকে সতর্ক করো।"

(আশ-শু'আরা', ২৬:২১৪)

এই আয়াত যখন নাবি ﷺ এর উপর অবতীর্ণ হলো, তিনি বললেন,

"হে কুরাইশ গোত্রের লোকেরা! আল্লাহর কাছে (ভালো কাজের মাধ্যমে) তোমাদের মুক্তি নিশ্চিত করো। হে আবদুল-মুত্তালিবের বংশধর! আমি কোনোভাবেই আল্লাহর বিরুদ্ধে তোমাদেরকে সাহায্য করতে পারব না। হে (আমার চাচা) 'আব্বাস ইব্ন আবদুল-মুত্তালিব! হে (আমার ফুফু) সাফীয়্যাহ! আমি কোনো অবস্থাতেই আল্লাহর বিরুদ্ধে তোমাদেরকে সাহায্য করতে পারবো না। হে মুহাম্মাদের কন্যা, ফাতিমা! যা কিছু চাও, চেয়ে নাও, তবে আমার

www.QuranerAlo.net

কাছে এমন কিছুই নেই যা দিয়ে আমি তোমাদেরকে আল্লাহর সামনে সাহায্য করতে পারি!"(৫৯)

অন্য এক ঘটনায়, এক সহাবি নাবি ﷺ এর সামনে তার কথা শেষ করে বললেন, "এটি আল্লাহর ইচ্ছা এবং আপনার ইচ্ছা।" নাবি ﷺ তাৎক্ষণিকভাবে তাকে শুধরে দিয়ে বলেছিলেন,

"তুমি কি আমাকে আল্লাহর সমতুল্য বানাচ্ছ? বলো, 'এটি শুধুই আল্লাহর ইচ্ছা।" (৬০)

আল্লাহ যা নির্ধারণ করেছেন তা পরিবর্তন করার কোনো ক্ষমতা নাবি ﷺ এরও নেই—এমন সুস্পষ্ট বক্তব্য থাকা সত্ত্বেও অনেক মুসলিম শুধু নাবির কাছেই নয়, বরং তথাকথিত ওয়ালি আওলিয়াদের কাছেও প্রার্থনা করে থাকে। এমন ঈমান বিধ্বংসী চর্চার ভিত্তি হলো সুফিদের এই দাবি যে, ওয়ালিগণ মহাবিশ্বের শৃঙ্খলা বজায় রাখে। এদেরকে রিজাল আল-গাইব (অদৃশ্য জগতের মানুষ) বলা হয়। যখনই তাদের মধ্যে কারও মৃত্যু হয়, তৎক্ষণাৎ তার স্থান অন্য একজনের মাধ্যমে পূরণ হয়ে যায়। এদের পদবিন্যাসের সর্বোচ্চে যিনি থাকেন তিনি হলেন 'কুত্‌ব' (খুঁটি বা পৃথিবী নিয়ন্ত্রণের মূল অক্ষ) বা 'গাউস' (রক্ষাকারী)। আব্দুল-কাদির জিলানীকে (মৃত্যু ১১৬৬ সাল) জনপ্রিয়তার সাথে 'আল-গাউস আল-আ'জাম' বা সর্বোচ্চ ত্রাণকর্তা হিসেবে উল্লেখ করা হয় এবং বিপদের সময়, "ইয়া আব্দুল-কাদির, আগিসনী!" (হে আবদুল-কাদির, আমাকে রক্ষা করুন!)—বলে চিৎকার করে তার কাছে সাহায্য প্রার্থনা করা হয়। এমন সুস্পষ্ট শির্কি কর্মকাণ্ড ব্যাপকভাবে প্রচলিত হয়ে পড়েছে, যদিও মুসলিমরা তাদের সলাতে দৈনিক কমপক্ষে সতেরো বার করে বলে যে, "ইয়্যাকা নাবুদু ওয়া ইয়্যাকা নাস্‌তাঈন" (আমরা শুধুমাত্র আপনারই 'ইবাদাত করি এবং শুধুমাত্র আপনার কাছেই আমরা সাহায্য চাই)।

মৃত ব্যক্তিকে সুপারিশকারী হিসেবে গ্রহণ করা কিংবা তার কাছে সরাসরি প্রার্থনা করা উভয়টিই 'শির্ক আল-আকবার' বা গুরুতর শির্ক। ইসলাম

(৫৯) বুখারি, (আরবি-ইংরেজি), খণ্ড ৪, পৃ. ৪৭৮-৯, হাদীস নং ৭২৭-৮ এবং মুসলিম, (ইংরেজি অনুবাদ), খণ্ড ১, পৃ. ১৩৬, হাদীস নং ৪০২।

(৬০) আহমাদ কর্তৃক সংকলিত।

www.QuranerAlo.net

সর্বাবস্থায় এসবের ঘোর বিরোধিতা করে। অথচ উভয় প্রকার শির্কই বর্তমানের মুসলিমদের মধ্যে কোনো না কোনোভাবে অনুপ্রবেশ করেছে। এ ধরনের চর্চার দ্বারা মুসলিমরা অসাবধানতাবশত কুর'আনে আল্লাহর সেই বক্তব্যকে সত্য বলেই প্রমাণ করছে, যেখানে তিনি বলেছেন,

وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُّشْرِكُونَ ﴿١٠٦﴾

"তাদের অধিকাংশ আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস (দাবি) করা সত্ত্বেও মুশরিক।"

(ইউসুফ, ১২:১০৬)

অধিকন্তু, আবু সাঈদ আল-খুদরি ﷺ থেকে বর্ণিত নাবি ﷺ এর সাবধানবাণীকেও তারা সত্য বলে প্রমাণ করছে, যেখানে তিনি বলেছেন, "তোমরা তোমাদের পূর্বপুরুষদের রীতিনীতিকে এতটাই অন্ধের মতো অনুসরণ করবে যে, তারা যদি গুইসাপের গর্তে প্রবেশ করে থাকে, তবে তোমরাও তা করবে।" তিনি ইহুদি ও খ্রিস্টানদের প্রতি ইঙ্গিত করে একথা বললেন কিনা, তা জানতে চাওয়া হলে তিনি বলেন, "তারা নয়তো আর কারা?"(৬১)

এই ভবিষ্যদ্বাণী শুধু বর্তমানের মুসলিমদের মধ্যে প্রচলিত বিভিন্ন ধরনের কবরপূজার প্রতিই ইঙ্গিত করছে না, বরং তাদের দ্বারা সরাসরি খ্রিস্টানদের মূর্তিপূজাকে অনুকরণ করারও আশঙ্কা প্রকাশ করা হয়েছে। আর এটা সবারই জানা যে, ক্যাথলিকরা তাদের সেইন্টদের মূর্তি বানিয়ে সেগুলোর প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পণ করে থাকে। সাওবান ﷺ বর্ণনা করেন যে, নাবি ﷺ বলেছেন,

> "কিয়ামাত সংঘটিত হবে না, যতক্ষণ না আমার উম্মতের কিছু লোক মূর্তি পূজা করবে।"(৬২)

এছাড়াও আবু হুরায়রা ﷺ বর্ণনা করেন যে, তিনি আরও বলেছেন,

---

(৬১) বুখারি, (আরবি-ইংরেজি), খণ্ড ৯, পৃ. ৩১৪-১৫, হাদীস নং ৪২২ এবং মুসলিম, (ইংরেজি অনুবাদ), খণ্ড ৪, পৃ. ১৪০৩, হাদীস নং ৬৪৪৮।

(৬২) সুনান আবি দাউদ, (ইংরেজি অনুবাদ), খণ্ড ৩, পৃ. ১১৮০-১, হাদীস নং ৪২৩৯, ইবন মাজাহ্ এবং তিরমিযি।

www.QuranerAlo.net

"দাওস গোত্রের নারীরা আল-খালাশা মূর্তির[৬২] মন্দিরের চারপাশে তাদের নিতম্ব দুলিয়ে প্রদক্ষিণ (তাওয়াফ) না করা পর্যন্ত কিয়ামাত আসবে না।"[৬৩]

অতএব, ইসলামি দৃষ্টিকোণ থেকে ধর্ম, ধর্মের উৎপত্তি ও এর ঐতিহাসিক ক্রমবিকাশ সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা থাকা মুসলিমদের জন্য অত্যাবশ্যক। এ বিষয়গুলো সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা লাভের পর, এসব চর্চার সঠিক পটভূমি উপলব্ধি করা যাবে এবং সে সবের ব্যাপারে ইসলামের বিধান কী, তাও তাদের কাছে সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে।

ধর্ম সম্পর্কে বিবর্তনবাদী মতবাদ

ডারউইনের বিবর্তনবাদ দ্বারা প্রভাবিত অধিকাংশ সমাজবিজ্ঞানী এবং নৃতাত্ত্বিকগণ এই সিদ্ধান্তে এসেছেন যে, আদিম মানুষদের দ্বারা বিভিন্ন প্রাকৃতিক শক্তির উপর সর্বেশ্বরবাদী ঐশ্বরিক ক্ষমতা আরোপের মধ্য দিয়ে প্রাচীনকালে ধর্মের যাত্রা শুরু হয়েছে।[৬৪] তাদের ধারণা অনুযায়ী, আদিম মানুষেরা মেঘের বিদ্যুৎ, বজ্রপাত, আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত, ভূমিকম্প ইত্যাদির মতো বিভিন্ন প্রাকৃতিক শক্তি দেখে অতিমাত্রায় বিস্মিত হয়ে পড়েছিল এবং এগুলোকে তারা অতিপ্রাকৃতিক সত্তা মনে করেছিল। ফলে এসব শক্তিকে সন্তুষ্ট করার জন্য তারা বিভিন্ন পথ ও পন্থা খুঁজতে থাকে, ঠিক যেভাবে নিজেদের মধ্যকার অধিক শক্তিশালী ব্যক্তি বা গোত্রদের সাহায্য লাভের চেষ্টা করত। এভাবেই আদিম মানুষদের মাঝে বিভিন্ন উপাসনাকর্ম যেমন, পূজা করা, পশু উৎসর্গ করা ইত্যাদির উদ্ভব ঘটেছিল বলে এই বিবর্তনবাদীরা ধারণা করে। ধর্মের উৎপত্তির প্রাথমিক অবস্থার উদাহরণ হিসেবে উত্তর অ্যামেরিকার ইন্ডিয়ানদের কথা উল্লেখ করা হয়। আর তারা

---

(৬৩) Ibn Atheer, an-Hihyah fi Ghareeb al-Hadeeth wa al-Athar, (Beirut: al-Maktabah al-Islamiyah, 1963), vol, 1, পৃ. ৬৪.

(৬৪) বুখারি, (আরবি-ইংরেজি), খণ্ড ৯, পৃ. ১৭৮, হাদীস নং ২৩২ এবং মুসলিম, (ইংরেজি অনুবাদ), খণ্ড ৪, পৃ. ১৫০৬, হাদীস নং ৬৯৪৪।

(৬৫) ডেভিড হিউম (১৭১১-৭৬) তার Natural History of Religion গ্রন্থে এই তত্ত্ব উপস্থাপন করতে গিয়ে টমাস হব্‌জের (১৫৮৮-১৬৭৯) অনুসরণ করেছেন (Dictionary of Religions, পৃ. ২৫৮)।

www.QuranerAlo.net

মনে করে যে, নদী, বন-জঙ্গল ইত্যাদি সবকিছুর আত্মা রয়েছে। তাদের এই ধারণা সর্বপ্রাণবাদ (animism) বলে পরিচিত।[৬৬]

বিবর্তনবাদীদের দাবি অনুযায়ী, সর্বপ্রাণবাদ স্তরে প্রতিটি মানুষেরই কিছু ব্যক্তিগত দেবতা ছিল। পরিবার প্রথার উদ্ভব হওয়ার মধ্য দিয়ে ব্যক্তিগত দেবতাদের জায়গায় পারিবারিক দেবতারা স্থান করে নেয়। ভারতের বহু-ঈশ্বরবাদী হিন্দুদেরকে এই স্তরের উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করা হয় যাদের প্রতিটি পরিবারের নিজস্ব দেবতা রয়েছে। অর্থনৈতিক চাহিদা এবং টিকে থাকার সংগ্রামের মধ্য দিয়ে পারিবারিক পরিমণ্ডল বিস্তৃতি লাভ করে গোত্রীয় ব্যবস্থার উদ্ভব ঘটে। গোত্রীয় দেবতারা ক্রমেই পারিবারিক দেবতাদের স্থান দখল করে নিতে থাকে। প্রতিটি নতুন প্রজন্মের মধ্য দিয়ে গোত্রগুলোর আকার বড় হতে থাকে। ফলে গোত্রীয় দেবতাদের সংখ্যাও ক্রমশ কমতে থাকে এবং পরিশেষে দ্বি-ঈশ্বরবাদের উদ্ভব হয়, যাতে সকল প্রাকৃতিক শক্তিগুলোকে দু'জন দেবতার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা হয়—একজন ভালোর দেবতা, অন্যজন মন্দের দেবতা। বিবর্তনবাদীদের মতে, ধর্মীয় বিকাশের এই স্তরের দৃষ্টান্ত খুঁজে পাওয়া যায় পারস্যের যরাথুস্ট্রবাদীদের ধর্মে। পার্সিয়ান সংস্কারকযরাথুস্ট্রের (গ্রিক উচ্চারণ, যোরোআস্টার) আবির্ভাবের পূর্ব পর্যন্ত পারস্যের লোকজন বিভিন্ন প্রাকৃতিক আত্মা এবং পারিবারিক ও গোত্রীয় দেবতায় বিশ্বাস করত বলে ধারণা করা হয়। নৃতাত্ত্বিকদের সংগৃহীত তথ্য-প্রমাণ এবং সেগুলোর ব্যাখ্যা অনুযায়ী, যরাথুস্ট্রের সময়ে গোত্রীয় দেবতাদের সংখ্যা দুটিতে নামিয়ে আনা হয়। একটি হলো 'আহুরা মাযদা', যাকে জগতের সকল ভালো কিছুর স্রষ্টা; অন্যটি হলো 'আংগ্রা মানিয়ু', যাকে সকল মন্দের স্রষ্টা বলে তারা বিশ্বাস করত।[৬৭]

গোত্রগুলো যখন একটি বৃহত্তর জাতিতে পরিণত হয়েছে, তখন একজন মাত্র জাতীয় দেবতা গোত্রীয় দেবতাগুলোর স্থান দখল করে নিয়েছে এবং এভাবেই একেশ্বরবাদের জন্ম হয়েছে বলে ধারণা করা হয়। ওল্ড টেস্টামেন্ট অনুযায়ী, ইসরায়েলীদের দেবতা একজন জাতীয় সত্তা, যিনি তার জাতির পক্ষে তাদের শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত। আবার ইসরায়েলীদেরকে তার

(৬৬) Dictionary of Philosophy and Religion, পৃ. ১৬, ১৯৩.
(৬৭) Dictionary of Religions, পৃ. ২৮ & ৪২.

www.QuranerAlo.net

মনোনীত সন্তান বলে উল্লেখ করা হয়েছে। চতুর্থ আমেনহোটেপ হিসেবে পরিচিত খ্রিষ্টপূর্ব চতুর্দশ অব্দের মিশরীয় শাসক আখিনাতেনকেও ধর্ম সম্পর্কে বিবর্তনবাদী ধারণার প্রমাণ হিসেবে উল্লেখ করা হয়। মিশরীয়দের মধ্যে যখন বহু-ঈশ্বরবাদী বিশ্বাস প্রচলিত ছিল, তখন তিনিই 'রা' নামক দেবতার একেশ্বরবাদী উপাসনার প্রচলন ঘটান এবং সেই দেবতাকে সূর্যের গোলাকার প্রতীকের মাধ্যমে প্রকাশ করেন।(৬৮)

অতএব, সমাজ বিজ্ঞানী এবং নৃতাত্ত্বিকদের মতে, ধর্মের কোনো ঐশ্বরিক ভিত্তি নেই। ধর্ম হলো আদিম মানুষদের বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের অভাবে জন্ম নেওয়া কুসংস্কারের ক্রমবিকাশের একটি ফসল। তাদের বিশ্বাস হলো, বিজ্ঞান একদিন সকল প্রাকৃতিক রহস্যের দ্বার উন্মোচন করবে এবং সেদিন ধর্মের বিলুপ্তি ঘটবে।

ধর্মের অধঃপতনবাদী রূপরেখা

ধর্ম এবং ধর্মের ক্রমবিকাশ সম্পর্কে ইসলামি দৃষ্টিভঙ্গি উল্লিখিত মতের সম্পূর্ণ বিপরীত। ইসলামের বক্তব্য অনুযায়ী, ধর্ম থেকে বিচ্যুতি এবং পুনরায় ধর্মীয় আদর্শকে গ্রহণ করার একটি চলমান প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে ধর্মের ক্রমবিকাশ হয়েছে। এটা মোটেই কোনো বিবর্তনবাদী প্রক্রিয়া নয়। মানুষের যাত্রা শুরু হয়েছে একেশ্বরবাদী হিসেবে। কিন্তু মানুষ এক সময় নানা ধরনের বহু-ঈশ্বরবাদী অপচর্চায় জড়িয়ে পড়েছে। এই বহু-ঈশ্বরবাদ কখনো ছিল দ্বি-ঈশ্বরবাদ (ditheism), কখনো ত্রি-ঈশ্বরবাদ (tritheism), কখনো আবার সর্বেশ্বরবাদ (pantheism)। বিপথগামী মানুষকে একেশ্বরবাদের সঠিক পথ দেখানোর জন্য স্রষ্টা পৃথিবীর সকল জাতি এবং গোত্রের কাছে তার নাবি পাঠিয়েছেন। কালের আবর্তে, মানুষ পুনরায় বিপথগামী হয়েছে এবং নাবিদের শিক্ষাকে তারা বদলে ফেলেছে, নয়তো সেগুলো হারিয়ে গেছে। এই বাস্তবতার প্রমাণ হলো, এ যাবৎ যত প্রাচীন গোত্রের সন্ধান পাওয়া গেছে, তাদের সবগুলোই একজন সর্বোচ্চ সত্তায় বিশ্বাস করে বলে দেখা গেছে। বিবর্তনবাদী তত্ত্ব অনুযায়ী তাদের ধর্মীয় বিকাশ যে স্তরেরই হোক

(৬৮) Dictionary of Philosophy and Religion, পৃ. ১৪৩.

www.QuranerAlo.net

না কেন, তাদের অধিকাংশই তাদের অন্যান্য সকল দেবতা বা অতিপ্রাকৃত সত্তার উপর একজন সর্বোচ্চ সত্তায় বিশ্বাস করে। মধ্য অ্যামেরিকার মায়াদের[৬৯] স্রষ্টা দেবতা 'ইটসাম্না' (Itzmna) থেকে শুরু করে সিয়েরা লিওনের মেন্ডেদের[৭০] মহাবিশ্ব এবং সকল আত্মার স্রষ্টা, 'নাজেয়ূ' (Ngewo); হিন্দুধর্মের অব্যক্তিবাচক পরম সত্তা[৭১] ব্রহ্মা (Brahma) থেকে শুরু করে দেবতাদের নগরী বলে খ্যাত প্রাচীন ব্যাবিলন ও প্যান্থিওনের[৭২] সর্বোচ্চ দেবতা 'মারদুক' (Marduk)—সবক্ষেত্রেই একজন সর্বোচ্চ সত্তার উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। এমনকি যরাথুস্ট্রবাদীদের দ্বি-ঈশ্বরবাদী ধর্মেও মঙ্গালের দেবতা আহুরা মাযদা মন্দের দেবতা আংগ্রা মানিয়ু থেকে বেশি ক্ষমতাসম্পন্ন। তাছাড়া তাদের বিশ্বাস অনুযায়ী, চূড়ান্ত বিচারের দিন আহুরা মাযদা আংগ্রা মানিয়ুকে পরাজিত করবে! সুতরাং আহুরা মাযদাই হলো তাদের প্রকৃত সর্বোচ্চ দেবতা।[৭৩]

বিবর্তনবাদী মতবাদ অনুযায়ী, ব্যাপারটি আসলে তেমন নয়। কারণ তাদের মতে, একজন মাত্র সর্বোচ্চ স্রষ্টার প্রতি বিশ্বাসের উৎপত্তি হয়েছে সীমিত বহু-ঈশ্বরবাদ থেকে এবং এই বিশ্বাস সর্বপ্রাণবাদী বিশ্বাসের সাথে সহাবস্থান করতে পারেনি। মোট কথা হলো, একজন মাত্র সর্বোচ্চ সত্তার ধারণা সকল ধর্মেই রয়েছে। এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, মানুষেরা নাবিদের একত্ববাদী শিক্ষা থেকে বিচ্যুত হয়েই সর্বোচ্চ স্রষ্টার বৈশিষ্ট্য এবং গুণাবলিকে সৃষ্টির উপর আরোপ করেছে। এসব সৃষ্টিকে তারা কখনো ক্ষুদ্রতর দেবতা, কখনো আবার স্রষ্টার কাছে তাদের জন্য সুপারিশকারী হিসেবে গ্রহণ করেছে।

একেশ্বরবাদী ইহুদি ধর্ম রূপান্তরিত হয়ে বহু-ঈশ্বরবাদী খ্রিষ্টধর্মে পরিণত হওয়ার ঘটনা মানুষের ধর্ম থেকে বিচ্যুতির স্বপক্ষে আরেকটি জ্বলন্ত প্রমাণ। নাবি ঈসা ﷺ একত্ববাদের যে শিক্ষা দিয়েছিলেন তা অধঃপতিত হয়ে তাদের কাছে দ্বি-ঈশ্বরবাদে পরিণত হয়; যারা ধারণা করেছিল যে, যিশুখ্রিষ্ট আসলে স্বর্গের পিতা, ঈশ্বর নন; বরং তিনি তার মানুষরূপী পুত্র। গ্রিকদের ক্ষেত্রেও

(৬৯) Dictionary of Religions, পৃ. ৯৩.
(৭০) Dictionary of Religions, পৃ. ২১০.
(৭১) Dictionary of Religions, পৃ. ৬৮.
(৭২) Dictionary of Religions, পৃ. ২০৪.
(৭৩) Dictionary of Religions, পৃ. ২৮.

www.QuranerAlo.net

একই ঘটনা ঘটেছে যারা যিশুখ্রিষ্টকে লোগোস (Logos) বলে আখ্যায়িত করেছে। অ্যানাজাগোরাস (Anaxagoras) থেকে শুরু করে অ্যারিস্টটল পর্যন্ত, সবার দর্শনেই এর প্রমাণ খুঁজে পাওয়া যায়।[৭৪] পরবর্তীতে এই ধারণার আরও অধঃপতন ঘটে এবং রোমানদের মাঝে ত্রি-ঈশ্বরবাদের (Tritheism) উদ্ভব হয়, যারা স্রষ্টা সম্পর্কিত ত্রি-ঈশ্বরবাদী ধারণাকে (Trinitarian concept) সরকারিভাবে স্বীকৃতি প্রদান করে।[৭৫] এই ধারণা চূড়ান্ত অধঃপতনের মধ্য দিয়ে রোমান ক্যাথলিক চার্চে এসে পুরোপুরিভাবে বহু-ঈশ্বরবাদে পরিণত হয়েছে, যেখানে যিশুখ্রিষ্টের মা মেরি এবং একদল তথাকথিত সেইন্টদের উপর মানুষকে রক্ষা করা এবং স্রষ্টার কাছে তাদের জন্য সুপারিশ করার ক্ষমতা আরোপ করা হয়েছে।

অনুরূপভাবে, আমরা নাবি মুহাম্মাদ ﷺ এর আনীত দীনের প্রতি লক্ষ্য করলে এবং বর্তমানের মুসলিমদের আক্বীদাহ্ বিশ্বাসের সাথে তার তুলনা করলে দেখতে পাই যে, মুসলিমদের অধিকাংশের বিশ্বাস এবং চর্চায় ভয়ানক অধঃপতন ঘটেছে। কালের আবর্তে ইসলামের প্রাথমিক যুগের বিশুদ্ধ একত্ববাদেও অবক্ষয় ধরেছে। যেসব দল ও গোষ্ঠীর উদ্ভব হয়েছে তারা নাবি ﷺ এর উপর, তাঁর উত্তরসূরীদের উপর, এমনকি পরবর্তী প্রজন্মের তথাকথিত অনেক ওয়ালিদের উপর আল্লাহর বৈশিষ্ট্য এবং গুণাবলি আরোপ করেছে।

ডারউইনের জৈবিক বিবর্তনের ধারণা অনুযায়ী, বর্তমানের পৃথিবীতে যত প্রাণের অস্তিত্ব আছে, সবগুলোর উৎপত্তি হয়েছে অ্যামিবার মতো এককোষী জীব থেকে। পরবর্তীতে টিকে থাকার তাগিদে এই সরল জীবগুলো ক্রমান্বয়ে জটিল থেকে জটিলতর রূপ লাভ করেছে। সরল থেকে জটিলের দিকে অগ্রগতির এই ধারণা যদি সরাসরি ধর্মের ক্রমবিকাশের ক্ষেত্রে প্রয়োগ

---

(৭৪) এসব দার্শনিকদের মতে, নূস (Nous) হলো মহাবিশ্বে প্রেরণা সৃষ্টিকারী অশরীরী মূলসত্তা আর লোগোস (Logos) হলো সেই অশরীরী সত্তার দৈহিক প্রকাশ। (Dictionary of Philosophy and Religion, পৃ. ৩১৪).

(৭৫) ক্যাপাডোশীয়দের (Cappadocian) দ্বারা উদ্ভাবিত এবং ৩৮১ সালে কনস্টান্টেনিপলের রোমান কাউন্সিল কর্তৃক অনুমোদিত ত্রি-ঈশ্বরবাদের চূড়ান্ত সূত্রানুযায়ী, স্রষ্টা হলেন একক সত্তা যিনি বাহ্যিকভাবে তিনজন ব্যক্তির মধ্যে অস্তিত্ববান, পিতা, পুত্র এবং পবিত্র আত্মা (Dictionary of Philosophy and Religion, পৃ. ৫৮৬).

www.QuranerAlo.net

করা হয়, তবে তা নিজেই ধর্মের অধঃপতনবাদকে সমর্থন করে। কারণ অধঃপতনবাদের বক্তব্য অনুযায়ী, ধর্ম তার সরলতম রূপ একেশ্বরবাদ হিসেবেই শুরু হয়েছিল। এরপর ক্রমান্বয়ে পরিবর্তিত হয়ে বহু-ঈশ্বরবাদের জটিলতর রূপ লাভের মধ্য দিয়ে সরলতা হারিয়েছে। আর এভাবেই বিভিন্ন জনপদ এবং লোকালয়ের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উপর ভিত্তি করে দ্বি-ঈশ্বরবাদ, ত্রি-ঈশ্বরবাদ, বহু-ঈশ্বরবাদ এবং সর্বেশ্বরবাদের উদ্ভব ঘটেছে।

শির্ক যেভাবে শুরু হয়

নাবি আদাম ﷺ এর মাধ্যমে পৃথিবীতে একত্ববাদের সূচনা হয়েছিল। তার পরে যেভাবে সর্বপ্রথম মানবজাতির মধ্যে বহু-ঈশ্বরবাদের প্রবেশ ঘটে, সে সম্পর্কে নাবি ﷺ বর্ণনা দিয়েছেন। নাবি নূহ ﷺ যখন তাঁর সম্প্রদায়ের লোকদেরকে এক আল্লাহর 'ইবাদাত করার আহ্বান করেছিলেন, তখন তাঁর লোকেরা যে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছিল, আল্লাহ ﷻ তা সূরা নূহ-এ বর্ণনা করেছেন। সহাবিগণ উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যার মাধ্যমে আমাদের সামনে সেইসব লোকদের প্রতিক্রিয়ার চিত্র তুলে ধরেছেনঃ

وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا ﴿٢٣﴾

"আর তারা বলে, 'তোমরা তোমাদের উপাস্যদের বর্জন করবে না; বর্জন করবে না ওয়াদ, সুওয়া, ইয়াগূস, ইয়াঊক ও নাস্‌রকে।" (নূহ: ৭১:২৩)

এই আয়াতের ব্যাখ্যায় ইব্‌ন 'আব্বাস ﷺ বলেছেন,

"এগুলো ছিল নাবি নূহের লোকজনদের মূর্তি, যেগুলো কালের আবর্তে আরবদের মূর্তি হয়ে যায়। 'ওয়াদ' হয়ে যায় দাওমাতুল-জান্দাল অঞ্চলের কাল্‌ব গোত্রের দেবতা, হুযাইল গোত্র তাদের দেবতা হিসেবে 'সুওয়া'-কে গ্রহণ করে, 'ইয়াগূসকে' গ্রহণ করে জারফ এর নিকটবর্তী সাবা এলাকার গুতাইফ গোত্র, 'ইয়াঊক'-কে গ্রহণ করে হামদান গোত্র এবং 'নাস্‌র' হয়ে যায়

www.QuranerAlo.net

হিমইয়ার গোত্রের যুল-কালা[৭৬] বংশের দেবতা। এই মূর্তিগুলোর নামকরণ করা হয়েছিল নূহের কওমের প্রয়াত পুণ্যবান ব্যক্তিদের নামানুসারে। তাদের মৃত্যুর পর, শয়তান তাদের মূর্তি তৈরির জন্য লোকজনকে কুমন্ত্রণা দেয়। নেককার লোকদের মাজলিসগুলোতে সৎকর্মশীলতার স্মারক চিহ্ন হিসেবে মূর্তিগুলোকে স্থাপন করা হয়। সে প্রজন্মের কেউই এসব মূর্তির পূজা করেনি। এরপর ওই প্রজন্মের সকল মানুষ যখন মৃত্যুবরণ করল এবং এসব মূর্তি নির্মাণের উদ্দেশ্য সবাই ভুলে গেল, তখন শয়তান পরবর্তী প্রজন্মের কাছে এসে বলল যে, তাদের পূর্বপুরুষরা এসব মূর্তির পূজা এ কারণেই করত যে, এদের কারণেই বৃষ্টি বর্ষিত হতো। এভাবে তারা শয়তানের ধোঁকার শিকার হলো এবং দেবতা হিসেবে মূর্তিগুলোকে পূজা করতে শুরু করল।[৭৭] পরবর্তী প্রজন্মও তাদের পূজা করা অব্যাহত রাখল।"[৭৮]

প্রসিদ্ধ দুজন সহাবি থেকে বর্ণিত উল্লিখিত আয়াতের তাফসীর সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরে যে, কীভাবে বিশুদ্ধ একত্ববাদী বিশ্বাসের মধ্যে মূর্তিপূজা এবং বহু-ঈশ্বরবাদের অনুপ্রবেশ ঘটেছিল। এই তাফসীর ধর্ম সম্পর্কে অধঃপতনবাদী মতবাদকে স্বীকৃতি দেয়। পূর্বপুরুষদেরকে পূজা করার ঐতিহাসিক উৎপত্তিকে সনাক্ত করে এবং ইসলাম কেন এত কঠোরভাবে মানুষ এবং জীবজন্তুর চিত্র বা মূর্তি তৈরির বিরোধিতা করে তারও ব্যাখ্যা দেয়। নাবি মূসা ﷺ কে যে 'দশটি বিধান' (Ten Commandments) দেওয়া হয়েছিল যা ওল্ড টেস্টামেন্টে লিপিবদ্ধ আছে, তাতেও প্রতিমূর্তি তৈরি করাকে নিষিদ্ধ করা হয়েছেঃ

"তুমি আপনার নিমিত্তে খোদিত প্রতিমা নির্মাণ করো না; উপরিস্থ স্বর্গে, নীচস্থ পৃথিবীতে ও পৃথিবীর নীচস্থ জলমধ্যে যা যা আছে, তাদের কোনো মূর্তি নির্মাণ করো না।"[৭৯]

গ্রিক-রোমান চিন্তাধারার সংমিশ্রণে নাবি ঈসা ﷺ এর দীন বিকৃত না হওয়া পর্যন্ত আদি খ্রিস্টধর্ম উপরোক্ত নির্দেশনা মেনে চলত। এই বিকৃতির ফলে

---

(৭৬) ইয়েমেনের হিমায়রীয় বংশের রাজা (Muhamad ibn Mandhurm Lisan al-Arab, Beirut: Dar Sadir, n.d., vol. ৮, পৃ. ৩১৩).

(৭৭) মুহাম্মাদ ইব্ন কায়েস থেকে বর্ণিত এবং আত-তাবারি কর্তৃক সংকলিত।

(৭৮) বুখারি, (আরবি-ইংরেজি), খণ্ড ৬, পৃ. ৪১৪-৫, হাদীস নং ৪৪২।

(৭৯) Exodus, 20:4.

www.QuranerAlo.net

মূর্তি নির্মাণের হিড়িক পড়ে যায়। এর ফলে ধর্মযুদ্ধে নিহত যোদ্ধা, সাধক, ধর্ম সংস্কারক, মেরি, যিশুখ্রিস্ট, এমনকি স্রষ্টারও মূর্তি নির্মাণ করা হয়।[৮০]

অন্য দিকে, যারা চিত্রকর্ম এবং মূর্তি নির্মাণ করে এবং যারা সেগুলোকে প্রদর্শনীর জন্য ঝুলিয়ে রাখে তাদেরকে নাবি ﷺ পরকালে মর্মন্তুদ শাস্তির হুঁশিয়ারি দিয়েছেন। নাবি ﷺ এর স্ত্রী আইশাহ ﵂ বলেন,

> "একবার নাবি ﷺ আমাকে দেখতে এলেন। আমি আমাদের ভেতরের ঘরটি এমন একটি উলের পর্দা দিয়ে ঢেকে রেখেছিলাম যাতে পাখাওয়ালা ঘোড়ার ছবি ছিল। পর্দাটি দেখে তাঁর চেহারার রং বদলে গেল এবং তিনি বললেন, হে আইশাহ! কিয়ামাতের দিন তারাই সবচেয়ে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি পাবে যারা আল্লাহর সৃষ্টিকর্মের সাথে প্রতিযোগিতা করে। তাদেরকে শাস্তি দেওয়া হবে এবং তারা যা সৃষ্টি করেছিল সেগুলোকে জীবন দিতে বলা হবে। নাবি ﷺ আরও বললেন, যে বাড়িতে ছবি কিংবা মূর্তি থাকে সেই বাড়িতে (রহমতের) ফেরেশতা প্রবেশ করে না।"
>
> তারপর আইশাহ বলেন,
>
> "তাই আমরা সে পর্দাটিকে ছোট ছোট করে কাটলাম এবং সেগুলো দিয়ে দুটি বা একটি বালিশ তৈরি করি।"[৮১]

পুণ্যবানদের মাত্রাতিরিক্ত প্রশংসা করা

নাবি নূহ ﷺ এর সম্প্রদায়ের মধ্যে শির্কের উৎপত্তি সম্পর্কে উল্লিখিত ঘটনা ইঙ্গিত করে যে, পুণ্যবানদের অতিরঞ্জিত প্রশংসা এবং তাদের প্রতি

---

(৮০) নাইসিয়ার দ্বিতীয় কাউন্সিল (৭৮৭ সাল) মানুষরূপে স্রষ্টার পৃথিবীতে আগমনের (incarnation) ধারণায় বিশ্বাসের প্রতীক হিসেবে প্রতিমার (icon বা পবিত্র রূপক চিত্রকর্ম) প্রতি সম্মান প্রদর্শন করাকে আনুষ্ঠানিকভাবে অনুমোদন করেছিল। তাদের মতে, স্বর্গীয় লোগোস (Logos — আক্ষ. শব্দ) যিশুখ্রিস্টের আকৃতিতে সম্পূর্ণ মানুষে পরিণত হয়েছিল, তাই যিশুর আকৃতিতে স্রষ্টাকে চিত্রিত করা যাবে। (Dictionary of Religions, পৃ. ১৫৯).

(৮১) বুখারি, (আরবি-ইংরেজি), খণ্ড ৭, পৃ. ৫৪২, হাদীস নং ৮৩৮ এবং পৃ. ৫৪৫-৬, হাদীস নং ৮৪৪ এবং মুসলিম, (ইংরেজি অনুবাদ), খণ্ড ৩, পৃ. ১১৫৮, হাদীস নং ৫২৫৪।

www.QuranerAlo.net

মাত্রাতিরিক্ত ভালোবাসার উপর ভিত্তি করেই মূর্তিপূজা আরম্ভ হয়েছিল।[৮২] এই অতিভক্তির খারাপ পরিণতির আরেকটি জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত হলো বৌদ্ধধর্মে বুদ্ধের এবং খ্রিস্টধর্মে যিশুর মূর্তির পূজা করা। অতিরঞ্জিত প্রশংসার মধ্যে নিহিত বিপদের কারণে নাবি ﷺ মুসলিমদের নির্দেশ দিয়েছেন, যেন তারা তাঁরও মাত্রাতিরিক্ত প্রশংসা না করে। উমার ইবনুল-খাত্তাব ﷺ বর্ণনা করেন যে, নাবি ﷺ বলেছেন,

> "তোমরা আমার মাত্রাতিরিক্ত প্রশংসা করবে না, যেমনটি খ্রিস্টানরা ঈসা ইব্ন মারইয়ামের ক্ষেত্রে করেছে। নিশ্চয়ই আমি কেবলই একজন বান্দা, তাই আমাকে বরং আব্দুল্লাহ ওয়া রসূলুল্লাহ (আল্লাহর বান্দা এবং তাঁর রসূল) বলেই ডাকো।"[৮৩]

ওই সময়ের ইহুদি এবং খ্রিষ্টানরা যেসব কবরকে নাবি বা নেককারদের কবর বলে বিশ্বাস করত, সেগুলোর উপর উপাসনালয় নির্মাণ করত। এ পাপাচারের কারণে নাবি ﷺ তাদেরকে অভিশাপ দিয়েছেন। ভবিষ্যতে যারা এমনটি করবে তিনি তাদেরকেও অভিশাপ দিয়েছেন। এর মাধ্যমে স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, ইসলাম সকল প্রকার শির্কি কর্মকাণ্ডের বিরোধী। পাশাপাশি পুণ্যবানদের মাত্রাতিরিক্ত প্রশংসা করার মধ্যে কী বিরাট বিপদ নিহিত সে সম্পর্কেও তিনি মানুষকে এর মাধ্যমে হুঁশিয়ার করে দিয়েছেন।

একবার নাবি ﷺ এর স্ত্রী উম্মু সালামাহ্[৮৪] ﷺ তাঁকে ইথিওপিয়ার একটি গির্জার কথা বললেন যেটির দেওয়ালে তিনি অনেকগুলো ছবি দেখেছিলেন। তার কথা শুনে নাবি ﷺ বললেন,

---

(৮২) তাইসীর আল-আযীয আল-হামীদ, পৃ. ৩১১।

(৮৩) বুখারি এবং মুসলিম উভয়েই সংকলন করেছেন। বুখারি, (আরবি-ইংরেজি), খণ্ড ৪, পৃ. ৪৩৫, হাদীস নং ৬৫৪ দ্রষ্টব্য।

(৮৪) উম্মু সালামাহ্‌র নাম ছিল হিন্দ বিনতু আবি উমাইয়্যাহ্ এবং তিনি ছিলেন কুরাইশ বংশোদ্ভূত। তিনি এবং তার স্বামী আবু সালামাহ্ কুরাইশ পৌত্তলিকদের নির্যাতন থেকে বাঁচার জন্য ইথিওপিয়ায় গিয়ে আশ্রয় নেন। পরবর্তীতে নাবি ﷺ মাদীনায় হিজরাত করলে তারাও মাদীনায় চলে আসেন। মাদীনায় আসার চতুর্থ বছরে তার স্বামী মৃত্যুবরণ করলে, নাবি ﷺ তাকে বিয়ে করেন। উম্মু সালামাহ্ ছিলেন তার সময়ের সবচেয়ে বিদুষী নারীদের অন্যতম। নাবি ﷺ এর মৃত্যুর পর থেকে শুরু করে ৬৮৪ সালে (৬২ হিজরি) তার নিজের মৃত্যু অবধি তিনি ইসলামি আইনের (শারীআহ) শিক্ষা দিয়েছেন (Ibn al-Jawazi, Sifah as-Safwah, Cairo: Dar al-Wa'ee ১st ed., ১৯৭০, vol. ২, পৃ. ৪০-২).

www.QuranerAlo.net

"তাদের মধ্যে কোনো পুণ্যবান ব্যক্তি মারা গেলে তারা তাদের কবরের উপর উপাসনালয় নির্মাণ করে এবং এ ধরনের চিত্রাঙ্কন করে। আল্লাহর দৃষ্টিতে তারা হলো নিকৃষ্টতম সৃষ্টি।"(৮৫)

উল্লেখ্য যে, উম্মু সালামাহ ﵂ যখন নাবিকে সেই গির্জার কথা বলেন, তখন নাবি ﷺ ছিলেন মৃত্যুশয্যায় শায়িত এবং গির্জার ওইসব নির্মাতাদের 'সর্বনিকৃষ্ট সৃষ্টি' বলে উল্লেখ করে নাবি ﷺ স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, এ ধরনের চর্চা মুসলিমদের জন্য কঠোরভাবে নিষিদ্ধ এবং এক্ষেত্রে কোনো ব্যতিক্রম নেই। নাবি ﷺ তাদেরকে এত কঠোর অভিশাপ দেওয়ার কারণ হলো, তাদের এই ধরনের চর্চার মধ্যে পৌত্তলিকতার দুটি প্রধান ধারা বিদ্যমানঃ

১. কবরের উপর সৌধ নির্মাণ করে এগুলো শোভা বর্ধন করা।

২. ছবি, চিত্র, প্রতিমা, প্রতিমূর্তি ইত্যাদি তৈরি করা।(৮৬)

উল্লিখিত কাজগুলোর দুটিই সমানভাবে শির্কের পথ খুলে দেয়, যেমনটি নাবি নূহ ﵇ এর সময়ের মূর্তিগুলোর ঘটনা থেকে সুস্পষ্ট।

কবর জিয়ারাতের ক্ষেত্রে বিধি-নিষেধ

নাবি ﷺ পৃথিবী থেকে বিদায় নেওয়ার পূর্ব মুহূর্তে যেসব বিষয়ে সতর্ক করেছিলেন, কবরপূজা তার অন্যতম। এ থেকেই ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, কবরপূজা তাঁর উম্মাহর জন্য একদিন একটি সাঙ্ঘাতিক পরীক্ষা হয়ে দাঁড়াবে। প্রথম দিকে নাবি ﷺ তাঁর সহাবিদের জন্য কবর জিয়ারাত করাকে নিষিদ্ধ করে দিয়েছিলেন। যতদিন পর্যন্ত তাদের মধ্যে আল্লাহর একত্ব সুদৃঢ়ভাবে

(৮৫) আইশাহ ﵂ থেকে বর্ণিত। বুখারি, (আরবি-ইংরেজি), খণ্ড ১, পৃ. ২৫১, হাদীস নং ৪১৯ এবং খণ্ড ২, পৃ. ২৩৮, হাদীস নং ৪২৬ এবং মুসলিম, (ইংরেজি অনুবাদ), খণ্ড ১, পৃ. ২৬৮, হাদীস নং ১০৭৬।

(৮৬) তাইসীর আল-আযীয আল-হামীদ, পৃ. ৩২১ -তে ইব্ন তাইমিয়ার এই কথাগুলো উদ্ধৃত করা হয়েছে।

www.QuranerAlo.net

প্রতিষ্ঠিত হয়নি, ততদিন পর্যন্ত সে নিষেধাজ্ঞা বলবৎ ছিল। এরপর নাবি ﷺ এ নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করে বলেন,

"ইতিপূর্বে আমি তোমাদেরকে কবর জিয়ারাত করতে নিষেধ করেছিলাম, তবে এখন থেকে তোমরা জিয়ারাত করতে পারো, কারণ নিশ্চয়ই তা পরকালের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।"(৮৭)

তবে এই অনুমতি সত্ত্বেও, নাবি ﷺ কবর জিয়ারাতের উপর কিছু বিধি-নিষেধ আরোপ করেছেন; যেন কবর জিয়ারাতের পথ ধরে পরবর্তী প্রজন্মের মাঝে আবার কবরপূজার সূচনা না হয়। সে বিধি-নিষেধসমূহ হলোঃ

১. কবরস্থানে সলাত আদায় করা (উদ্দেশ্য যা-ই থাকুক না কেন) সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। আবু সাঈদ আল খুদ্‌রি ﷺ বর্ণনা করেন যে, নাবি ﷺ বলেছেন,

"পুরো পৃথিবীই হলো একটি মাসজিদ ('ইবাদাতের স্থান), তবে কবরস্থান এবং শৌচাগার ছাড়া।"(৮৮)

ইব্‌ন উমার ﷺ থেকেও বর্ণিত হয়েছে যে, নাবি ﷺ বলেছেন,

"তোমাদের ঘরে তোমরা (নাফ্‌ল) সলাত আদায় করো; সেগুলোকে গোরস্থানে পরিণত করো না।"(৮৯)

পরিবারের অন্যান্যদের উৎসাহিত করার জন্য নাফ্‌ল সলাত বাড়িতে আদায় করাকে উৎসাহিত করা হয়েছে। বাড়িতে যদি কোনো সলাত আদায় করা না হয়, তাহলে তা গোরস্থানের মতো মনে হয়—যেখানে সলাত আদায় করা নিষিদ্ধ। যদিও কবরস্থানে বসে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করলে তা এমনিতেই শির্ক হয়ে যায় না, তবে শয়তানের প্ররোচনায় অজ্ঞ লোকেরা মনে

---

(৮৭) বুরাইদা ইব্‌ন আল-হুসাইব থেকে বর্ণিত। মুসলিম, (ইংরেজি অনুবাদ), খণ্ড ২, পৃ. ৪৬৩-৪, হাদীস্ নং ২১৩১, সুনান আবি দাউদ, (ইংরেজি অনুবাদ), খণ্ড ২, পৃ. ৯১৯, হাদীস্ নং ৩২২৯, আন-নাসাঈ, আহ্‌মাদ এবং আল-বায়হাকি।

(৮৮) তিরমিযি, সুনান আবি দাউদ, (ইংরেজি অনুবাদ), খণ্ড ১, পৃ. ১২৫, হাদীস্ নং ৪৯২ এবং ইব্‌ন মাজাহ্।

(৮৯) বুখারি, (আরবি-ইংরেজি), খণ্ড ২, পৃ. ১৫৬, হাদীস্ নং ২৮০, মুসলিম, (ইংরেজি অনুবাদ), খণ্ড ১, পৃ. ৩৭৬, হাদীস্ নং ১৭০৪।

www.QuranerAlo.net

করতে পারে যে, কবরস্থানে যে প্রার্থনা করা হয় তা আল্লাহর কাছে নয় বরং মৃত ব্যক্তিদের কাছে। এ কারণেই কবরস্থানে বসে প্রার্থনা করা কঠোরভাবে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। একবার দ্বিতীয় খলিফা উমার ইবনুল-খাত্তাব ﷺ আনাস ইব্ন মালিক ﷺ কে কবরের কাছে সলাত আদায় করতে দেখে চিৎকার করে উঠেছিলেন, "ওই যে কবর! ওই যে কবর!"(৯০)

২. দ্বিতীয় পদক্ষেপ হিসেবে জেনে-শুনে কবরের দিকে মুখ করে সলাত আদায় করার উপর নাবি ﷺ নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছেন। কারণ এই ধরনের কাজ দেখে মূর্খ লোকেরা ভেবে বসতে পারে যে, মৃত ব্যক্তিদের সন্তুষ্টির জন্য ওই সলাত আদায় করা হয়েছে। আবু মারসাদ আল ঘানাওয়ি বর্ণনা করেন যে, নাবি ﷺ বলেছেন,

"কবরের দিকে মুখ করে সলাত আদায় করবে না, সেগুলোর উপর বসবেও না।"(৯১)

---

(৯০) বুখারি (আরবি-ইংরেজি), খণ্ড ১, পৃ. ২৫১, হাদীস নং ৪৮। এই হাদীসগুলো আরও নিশ্চিত করে যে, কবরস্থানে সলাত আদায়ের ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা এ কারণে নয় যে, সেখানের মাটি 'ইবাদাতের জন্য অপবিত্র। নাবিদের কবরসমূহ পবিত্র, কারণ নাবি ﷺ এর বক্তব্য অনুযায়ী, আল্লাহ মাটিকে নাবিদের শরীরকে খেয়ে ফেলার অনুমতি দেননি। তাই ইহুদি খ্রিস্টানরা তাদের নাবিদের কবরগুলোকে 'ইবাদাতের স্থান হিসেবে গ্রহণ করায় তাদেরকে অভিশাপ দেওয়ার কারণ এই নয় যে, 'ইবাদাতের জন্য কবরস্থান পবিত্র নয় বরং এই জন্য যে, এমনটি করা শিরক। (তাইসীর আল-আযীয আল-হামীদ, পৃ. ৩২৮)।

(৯১) সহীহ মুসলিম, (ইংরেজি অনুবাদ), খণ্ড ২, পৃ. ৪৬০, হাদীস নং ২১২২, সুনান আবি দাউদ, (ইংরেজি অনুবাদ), খণ্ড ২, পৃ. ৯১৭, হাদীস নং ৩২২৩, আন-সানাঈ এবং ইব্ন মাজাহ্। কবরের দিকে মুখ করে দুআ করাও এই নিষেধাজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত, কারণ নাবি ﷺ বলেছেন যে, দুআ হলো 'ইবাদাত। বুখারির আল-আদাব আল-মুফরাদ, সুনান আবি দাউদ, (ইংরেজি অনুবাদ), খণ্ড ১, পৃ. ৩৮৭, হাদীস নং ১৪৭৪, তিরমিযি, এবং ইব্ন মাজাহ্। যে দিকে মুখ ফিরিয়ে সলাত আদায় করা হয়, সেই দিকে অর্থাৎ কিবলার (মাক্কার) দিকে মুখ ফিরিয়েই দুআ করতে হবে।

টীকা : আরও লক্ষণীয় যে, ইসলামে জানাযার সলাত কবরস্থানে অনুষ্ঠিত হয় না; বরং কবরস্থানের পাশে জামাআতবদ্ধভাবে সলাত আদায়ের জন্য নির্ধারিত স্থানে অথবা মাসজিদে জানাযা সলাত আদায় করা হয়। অধিকন্তু, লাশ যেহেতু উপস্থিত মুসাল্লিদের সামনে এবং সরাসরি ইমামের সামনে রাখা হয়, তাই জানাযার সলাতে কোনো রুকু বা সিজদা নেই। তাই এই সলাত আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য নয় বরং মৃতব্যক্তির সন্তুষ্টির জন্য আদায় করা হচ্ছে এমন ধারণা করার কারও কোনো সুযোগ নেই। তাছাড়া জানাযা সলাতে যে দুআ পাঠ করা হয়, তার বক্তব্য থেকেই বিষয়টি সুস্পষ্ট।

www.QuranerAlo.net

৩. কবরস্থানে কুর'আন তিলাওয়াত করারও অনুমতি নেই। কারণ নাবি ﷺ কিংবা তাঁর সহাবিদের কেউ এমনটি করেননি। যখন নাবি ﷺ এর স্ত্রী, আইশাহ ﷺ কবর জিয়ারাতের সময় কী বলতে হয় তা জানতে চেয়েছিলেন, তখন নাবি ﷺ তাকে কবরে শায়িত ব্যক্তিকে সালাম দিতে এবং মৃতের জন্য দুআ করতে বলেছিলেন। নাবি তাকে আল-ফাতিহাহ বা কুর'আনের অন্য কোনো সূরা তিলাওয়াত করতে বলেননি।(৯২)

এছাড়া আবু হুরায়রা ﷺ থেকেও বর্ণিত রয়েছে যে, নাবি ﷺ বলেছেন,

"তোমাদের ঘরগুলোকে গোরস্থান বানিয়ে দিও না, কারণ নিশ্চয়ই যে ঘরে সূরা আল-বাকারাহ তিলাওয়াত করা হয় সে ঘর থেকে শয়তান পালিয়ে যায়।"(৯৩)

এই হাদীসটি সহ আরও অনেক হাদীস রয়েছে, যেগুলো ইঙ্গিত করে যে, কবরস্থানে কুর'আন পাঠ করা যাবে না। বাড়িতে কুর'আন তিলাওয়াত করাকে উৎসাহিত করা হয়েছে যেন তা কবরস্থানে পরিণত না হয়, যেহেতু কবরস্থানে কুর'আন তিলাওয়াত করা নিষিদ্ধ।(৯৪)

৪. কবর বাঁধানো, তাতে চুনকাম করা, কবরের উপর সৌধ বা অন্য কিছু নির্মাণ করা(৯৫), কবরের গায়ে লিখা(৯৬) কিংবা কবরকে মাটি থেকে উঁচু রাখা

---

(৯২) নাসির আদ-দীন আল-আলবানি, আহকাম আল-জানাইয, (Beirut: al-Maktab al-Islami, 1st ed., ১৯৬৯), পৃ. ১৯১। দুআটির শব্দগুলো নিম্নরূপ:

(এই আবাসগুলোয় বসবাসকারীদের মধ্য থেকে যারা মু'মিন এবং মুসলিম, তাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক। আল্লাহ তাদের উপর করুণা বর্ষণ করুন যারা আমাদের আগেই চলে গিয়েছে এবং তাদের উপরও, যারা আমাদের পরে আসবে এবং আল্লাহর ইচ্ছায় আমরাও শিগগিরই তোমাদের সাথে মিলিত হবো) মুসলিম, (ইংরেজি অনুবাদ), খণ্ড ২, পৃ. ৪৬১-২, হাদীস নং ২১২৭।

(৯৩) সহীহ মুসলিম, (ইংরেজি অনুবাদ), খণ্ড ১, পৃ. ৩৭৭, হাদীস নং ১৭০৭, তিরমিযি এবং আহমাদ।

(৯৪) কবরস্থানে সূরা ইয়াসীন তিলাওয়াত করা সম্পর্কে কোনো হাদীস নেই এবং মুমূর্ষু ব্যক্তির মৃত্যুশয্যায় এই সূরা তিলাওয়াত করা সম্পর্কিত হাদীসটি দুর্বল (দ'ঈফ)। আহকাম আল-জানাইয, পৃ. ১১ এবং পৃ. ১৯২ এর ২ নং পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

(৯৫) জাবির ﷺ থেকে বর্ণিত। মুসলিম, (ইংরেজি অনুবাদ), খণ্ড ২, পৃ. ৪৫৯, হাদীস নং ২১১৬ এবং সুনান আবি দাউদ, (ইংরেজি অনুবাদ), খণ্ড ২, পৃ. ২১৬-৭, হাদীস নং ৩২১৯-২০।

(৯৬) জাবির ﷺ থেকে বর্ণিত। সুনান আবি দাউদ, (ইংরেজি অনুবাদ), খণ্ড ২, পৃ. ২১৬, হাদীস নং ৩২১৯ এবং আন-নাসাঈ।

www.QuranerAlo.net

যাবে না।[৯৭] কারণ নাবি ﷺ এসব করতে নিষেধ করেছেন। তিনি আরও নির্দেশ দিয়েছেন যে, কবরের উপর সব ধরনের নির্মাণ কাঠামো ভেঙে ফেলে কবরকে মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হবে। আলি ইব্ন আবি তালিব ﷺ বর্ণনা করেন যে, নাবি ﷺ তাকে আদেশ করেছিলেন, তিনি যত মূর্তি দেখবেন সবগুলোকে যেন ভেঙে গুঁড়িয়ে দেন এবং মাটি থেকে আধ হাতের বেশি উঁচু সকল কবরকে মাটির সাথে মিশিয়ে দেন।[৯৮]

৫. কবরের উপর মাসজিদ নির্মাণ করাকে নাবি ﷺ দ্ব্যর্থহীন ভাষায় নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছেন। আইশাহ ﷺ বর্ণনা করেন যে, যখন আল্লাহর রসূলের ইন্তেকাল হচ্ছিল, তিনি তখন তার ডোরাকাটা জুব্বাটি নিজের চেহারার উপর টেনে নিচ্ছিলেন এবং বলছিলেন,

> "ইহুদি ও খ্রিষ্টানদের উপর আল্লাহর অভিসম্পাত, যারা তাদের নাবিদের কবরগুলোকে 'ইবাদাতের স্থান বানিয়ে ফেলেছে।"[৯৯]

৬. কবরপূজা বন্ধ করার জন্য নাবি ﷺ তাঁর নিজের কবরের চারপাশে কোনো বার্ষিক বা মৌসুমি সমাবেশ করতে নিষেধ করেছেন। আবু হুরায়রা ﷺ বর্ণনা করেন যে, তিনি ﷺ বলেছেন,

> "তোমরা আমার কবরকে ঈদে (উৎসবের স্থান) পরিণত করো না, আর তোমাদের বাড়িগুলোকেও কবরস্থানে পরিণত করো না। যেখানেই থাকো,

---

(৯৭) জাবির ﷺ থেকে বর্ণিত। মুসলিম, (ইংরেজি অনুবাদ), খণ্ড ২, পৃ. ৪৫৯-৬০, হাদীস নং ২১১৬ এবং সুনান আবি দাউদ, (ইংরেজি অনুবাদ), খণ্ড ২, পৃ. ২১৬, হাদীস নং ৩২১৯ এবং আন-নাসাঈ।

(৯৮) সহীহ মুসলিম, (ইংরেজি অনুবাদ), খণ্ড ২, পৃ. ৪৫৯, হাদীস নং ২১১৫, সুনান আবি দাউদ, (ইংরেজি অনুবাদ), খণ্ড ২, পৃ. ৯১৪-১৫, হাদীস নং ৩২১২, আন-নাসা'ঈ এবং তিরমিযি। হাদীসের মূল বক্তব্যটি আবু আল-হাইয়াজ আল-আসাদি থেকে বর্ণিত হয়েছে যাতে তিনি বলেছেন যে, আলি ইব্ন আবি তালিব তাকে বলেছিলেন, "আমি কি আপনাকে প্রেরণ করব যেভাবে আল্লাহর রসূল আমাকে প্রেরণ করেছিলেন? বাড়িগুলোতে যত ছবি বা মূর্তি আছে সেগুলোকে ভেঙে দেওয়ার জন্য এবং সব উঁচু কবরগুলো মাটির সাথে মিশিয়ে দেওয়ার জন্য।"

(৯৯) বুখারি, (আরবি-ইংরেজি), খণ্ড ১, পৃ. ২৫৫, হাদীস নং ৪২৭, মুসলিম, (ইংরেজি অনুবাদ), খণ্ড ১, পৃ. ২৬৯, হাদীস নং ১০৮২, সুনান আবি দাউদ, (ইংরেজি অনুবাদ), খণ্ড ২, পৃ. ৯১৭, হাদীস নং ৩২২১, এবং আদ-দারিমি।

www.QuranerAlo.net

আমার উপর সলাত ও সালাম প্রেরণ করবে, কারণ সেগুলো আমার কাছে পৌঁছে যাবে।"(১০০)

৭. কবর জিয়ারাতের উদ্দেশ্যে ভ্রমণ করাকেও নাবি ﷺ নিষিদ্ধ করেছেন। এই ধরনের চর্চাই হলো অন্যান্য ধর্মে পৌত্তলিক কর্মকাণ্ড সম্বলিত তীর্থযাত্রার ভিত্তি। আবু হুরায়রা এবং আবু সাঈদ আল-খুদ্‌রি ﷺ উভয়েই বর্ণনা করেন যে, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন,

"তিনটি মাসজিদ ছাড়া অন্য কোথাও (সাওয়াবের উদ্দেশ্যে) সফর করবে না, মাসজিদুল হারাম, রসূলের মাসজিদ এবং মাসজিদ আল-আক্‌সা।"(১০১)

---

(১০০) সুনান আবি দাউদ, (ইংরেজি অনুবাদ), খণ্ড ২, পৃ. ৫৪২-৩, হাদীস্ নং ২০৩৭ এবং আহ্‌মাদ। নাবি ﷺ এর কবরের চারপাশে বার্ষিক সমাগম করাই যদি নিষিদ্ধ হয়, তাহলে তথাকথিত ওয়ালিদের মাজারের চারপাশে তাদের জন্মদিন, মৃত্যুদিন ইত্যাদি বিভিন্ন উপলক্ষে বিশাল আয়োজন করে সেগুলো উদ্‌যাপন করা নিঃসন্দেহে ইসলাম বহির্ভূত চর্চা। নাবি ﷺ তার সহাবি আলিকে যেমনটি নির্দেশ দিয়েছিলেন সেই অনুযায়ী, এসব মাজারগুলোকে ভেঙে মাটির সাথে মিশিয়ে দিলেই শুধু চলবে না; বরং ধর্মের নামে এসব নবউদ্ভূত আচার অনুষ্ঠানকেও বন্ধ করতে হবে।

টীকা : অধিকাংশ মুসলিম দেশের মুসলিমরা এই হাদীস্‌গুলো ভুলে গেছে। বিধর্মীদের অনুকরণে নির্মিত মাজার এবং সৌধ বিশিষ্ট কবরে দেশগুলো ছেয়ে গেছে। মিশরের মতো কিছু দেশে গোরস্থানগুলোকে দেখলে সুবিন্যস্ত সড়ক বিশিষ্ট শহর বলে মনে হয়। মাজারগুলোকে দেখে এতটাই বাড়ির মতো মনে হয় যে, অনেক স্থানে গরিব পরিবারগুলো মাজারগুলোর মধ্যে ঢুকে পড়েছে এবং নিজেদের বসবাসের জন্য সেগুলোকে স্থায়ী বাসগৃহ বানিয়ে ফেলেছে। উল্লিখিত হাদীস্ এবং এ সম্পর্কিত অন্যান্য হাদীস্‌গুলোর উপর ভিত্তি করে, শুধু এ ধরনের মাজারগুলোই ভেঙে দেওয়া যথেষ্ট হবে না; বরং ভারতের তাজমহল, পাকিস্তানের মুহাম্মাদ আলি জিন্নাহ্‌র মাজার, সুদানে অবস্থিত তথাকথিত মাহ্‌দি সাইয়্যেদ আল-বাদাবির মাজার ইত্যাদি সবগুলোকে ভেঙে গুঁড়িয়ে দিতে হবে। এই ধরনের পদক্ষেপের ফলে মাজারের সাদানাহদের (খাদেম) পেশাবৃত্তির অবসান হবে যারা মাজার জিয়ারাতকারীদের বিপুল পরিমাণ দান সাদাকাহ্‌র উপর ভিত্তি করে জীবিকা নির্বাহ করে। জিয়ারাতকারীরা এসব খাদেমদেরকে উদার হস্তে দান করে থাকে; কারণ তারা বিশ্বাস করে যে, তাদের প্রতি উদারতা দেখালে ওয়ালি সহজেই দুআ কবুল করবে এবং নিশ্চিতভাবে তাদের মনোবাসনা পূর্ণ হবে।

(১০১) বুখারি, (আরবি-ইংরেজি), খণ্ড ২, পৃ. ১৫৭, হাদীস্ নং ২৮১, মুসলিম, (ইংরেজি অনুবাদ), খণ্ড ২, পৃ. ৬৯৯, হাদীস্ নং ৩২১৮, সুনান আবি দাউদ, (ইংরেজি অনুবাদ), খণ্ড ২, পৃ. ৫৪০, হাদীস্ নং ২০২৮, তিরমিযি, আন-নাসাঈ এবং ইব্‌ন মাজাহ্।

www.QuranerAlo.net

আবু বাশ্‌রাহ্ আল-গিফারি ﷺ সফর থেকে ফেরার পথে আবু হুরায়রা ﷺ এর সাথে দেখা হলে তিনি জানতে চান যে, তিনি কোথা থেকে এলেন। আবু বাশ্‌রাহ্ বললেন যে, তিনি আত্-তুরে গিয়েছিলেন সলাত আদায় করার জন্য। আবু হুরায়রা ﷺ বললেন,

"তুমি রওয়ানা দেওয়ার আগে যদি আমি তোমাকে আটকাতে পারতাম! কারণ আমি আল্লাহর রসূল ﷺ কে বলতে শুনেছি,

তিনটি মাসজিদ ছাড়া অন্য কোথাও (সাওয়াবের উদ্দেশ্যে) সফর করবে না..."(১০২)

কবরস্থানকে 'ইবাদাতের স্থান হিসেবে গ্রহণ করা

ইব্ন মাসঊদ ﷺ বর্ণনা করেন যে, নাবি ﷺ বলেছেন,

"মানব জাতির মধ্যে সর্বনিকৃষ্ট প্রজন্ম হলো তারা যারা জীবিত থাকা অবস্থায় কিয়ামাত আসবে এবং যারা কবরগুলোকে 'ইবাদাতের স্থান হিসেবে গ্রহণ করে।"(১০৩)

জুন্দুব ইব্ন আব্দুল্লাহ ﷺ বর্ণনা করেন যে, নাবি ﷺ এর মৃত্যুর পাঁচদিন পূর্বে তিনি তাঁকে বলতে শুনেছিলেন,

"তোমাদের আগের লোকেরা তাদের নাবিদের কবরগুলোকে 'ইবাদাতের স্থান হিসেবে গ্রহণ করেছিল। তোমরা কবরগুলোকে তোমাদের 'ইবাদাতের স্থান হিসেবে গ্রহণ করো না। আমি কঠোরভাবে তোমাদেরকে তা করতে নিষেধ করছি।"(১০৪)

উল্লিখিত হাদীসগুলো থেকে সুস্পষ্ট যে, কবরকে 'ইবাদাতের স্থান হিসেবে গ্রহণ করাকে নাবি ﷺ নিষিদ্ধ করেছেন। এখন গুরুত্বপূর্ণ হলো, "কবরকে 'ইবাদাতের স্থান হিসেবে গ্রহণ করা" বলতে কী বুঝানো হচ্ছে,

(১০২) আহমাদ এবং আত-তায়ালাসি কর্তৃক সংকলিত। আল-আলবানি হাদীসটিকে সহীহ মূল্যায়ন করেছেন। আহকাম আল-জানায়েয, পৃ. ২২৬ দ্রষ্টব্য।

(১০৩) আহমাদ কর্তৃক সংকলিত।

(১০৪) সহীহ মুসলিম, (ইংরেজি অনুবাদ), খণ্ড ১, পৃ. ২৬৯, হাদীস নং ১০৮৩।

www.QuranerAlo.net

তা নির্ধারণ করা। হাদীসে উল্লিখিত আরবি শব্দগুলোর তিন ধরনের ব্যাখ্যা সম্ভবঃ

১. কবরের উপরে কিংবা কবরের দিকে মুখ করে সলাত আদায় করা অথবা সিজদা করাঃ

ইতিপূর্বে আবু মারসাদ ﷺ থেকে বর্ণিত হাদীস এবং ইব্ন 'আব্বাস ﷺ থেকে বর্ণিত নিম্নোক্ত হাদীসের মাধ্যমে কবরের উপর সলাত আদায় করা সুস্পষ্টভাবে নিষিদ্ধ, যে হাদীসে নাবি ﷺ বলেছেন,

"কবরের দিকে মুখ করে সলাত আদায় করবে না, সেগুলোর উপর বসবেও না।"(১০৫)

২. কবরের উপর মাসজিদ নির্মাণ করা অথবা মাসজিদের ভেতরে কাউকে কবর দেওয়াঃ

কবরের উপর মাসজিদ নির্মাণ করা নিষিদ্ধ। কারণ উম্মু সালামাহ্ থেকে বর্ণিত হাদীসে নাবি ﷺ সুস্পষ্টভাবে বলে দিয়েছেন যে, আল্লাহর দৃষ্টিতে সর্বনিকৃষ্ট হলো তারাই, যারা কবরের উপর 'ইবাদাতের স্থান নির্মাণ করে। আইশাহ ﷺ কর্তৃক নাবির জীবনের সর্বশেষ বক্তব্যের ব্যাখ্যা অনুযায়ী, মাসজিদের ভেতর কবর দেওয়াও নিষিদ্ধ। কারণ রসূল ﷺ বলেছেন,

"ইহুদি এবং খ্রিষ্টানদের উপর আল্লাহর অভিসম্পাত, যারা তাদের নাবিদের করবগুলোকে 'ইবাদাতের স্থান বানিয়ে নিয়েছে।"(১০৬)

মৃত্যুর পর যখন নাবি ﷺ কে তাঁর মাসজিদের মধ্যে কবর দেওয়ার প্রস্তাব করা হয়েছিল, তখন নাবি ﷺ এর শেষ কথাগুলোর উপর ভিত্তি করেই আইশাহ ﷺ সেই প্রস্তাবের বিরোধিতা করেছিলেন।

---

(১০৫) আত-তাবারানি কর্তৃক সংকলিত।

(১০৬) বুখারি, (আরবি-ইংরেজি), খণ্ড ১, পৃ. ২৫৫, হাদীস নং ৪২৭ এবং খণ্ড ২, পৃ. ২৩২ হাদীস নং ৪১৪, মুসলিম, (ইংরেজি অনুবাদ), খণ্ড ১, পৃ. ২৬৯, হাদীস নং ১০৮২, সুনান আবি দাউদ, (ইংরেজি অনুবাদ), খণ্ড ২, পৃ. ৯১৭ হাদীস নং ৩২২১, এবং আহমাদ।

www.QuranerAlo.net

৩. ভেতরে কবর আছে এমন মাসজিদে সলাত আদায় করাঃ

যেহেতু কবরের উপর মাসজিদ নির্মাণ করাই নিষিদ্ধ, সেহেতু ভেতরে কবর আছে এমন মাসজিদে সলাত আদায় করা সঙ্গত কারণেই নিষিদ্ধ হয়ে যায়। কারণ যে পথে চলাই নিষিদ্ধ, সে পথের শেষ ঠিকানায় যা থাকে তা অনিবার্যভাবেই নিষিদ্ধ হয়ে যায়। উদাহরণস্বরূপ, নাবি ﷺ তারযুক্ত এবং বাতাস চালিত বাদ্যযন্ত্রকে নিষিদ্ধ করেছেন। আবু মালিক আল আশআরি বর্ণনা করেন যে, তিনি নাবি ﷺ কে বলতে শুনেছেন,

> "আমার অনুসারীদের মধ্য থেকে কিছু মানুষ যিনা করা, (পুরুষদের জন্য) রেশম পরিধান করা, মাদক গ্রহণ করা এবং বাদ্যযন্ত্রের (মাআযিফ) ব্যবহারকে বৈধ করে ফেলবে।"(১০৭)

এসব বাদ্যযন্ত্র বাজানো এবং এর বাজনা শোনা—উভয়ই নিষিদ্ধ, কারণ এ দুটি উদ্দেশ্যেই বাদ্যযন্ত্র তৈরি করা হয়। অনুরূপভাবে, কোনোকিছু নির্মাণ করাই যেহেতু নিষিদ্ধ কাজ নয়, তাই উদ্দেশ্যের কারণেই মাসজিদ নির্মাণ করাকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে, সেটিই নিষেধাজ্ঞার মূল কারণ। মূলত কবরের উপর নির্মিত মাসজিদে সলাত আদায়ে নিষেধাজ্ঞার কারণে কবরের উপর মাসজিদ নির্মাণ করাকেই নিষিদ্ধ করা হয়েছে। কারণ মাসজিদ নির্মাণের উদ্দেশ্যই হলো সলাত আদায় করা। সুতরাং, কবরের উপর মাসজিদ নির্মাণে নিষেধাজ্ঞার দ্বারা ওইসব মাসজিদে সলাত আদায় করাও নিষিদ্ধ বলে প্রমাণিত হয়।

যেসব মাসজিদে কবর আছে

মৌলিকভাবে এসব মাসজিদ দুই ধরনের হতে পারেঃ

১. যেসব মাসজিদ কবরের উপর নির্মাণ করা হয়েছে, এবং

২. যেসব মাসজিদ নির্মাণের পর সেগুলোর মধ্যে কবর দেওয়া হয়েছে।

(১০৭) বুখারি, (আরবি-ইংরেজি), খণ্ড ৭, পৃ. ৩৪৫, হাদীস নং ৪৮৪।

www.QuranerAlo.net

শুধু সলাত আদায়ের কথা বিবেচনা করলে, স্বাভাবিকভাবেই এই দুই ধরনের মাসজিদের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। উল্লিখিত দুই ধরনের মাসজিদেই কবরের প্রতি সম্মান না দেখালেও, সেগুলোতে সলাত আদায় করা চরমভাবে ঘৃণিত ও ধিক্কৃত একটি কাজ। তবে কবরের উদ্দেশ্যে সলাত আদায় করলে, সেগুলোতে সলাত আদায় করা সম্পূর্ণরূপে হারাম। যাই হোক, এসব মাসজিদের সংস্কার পদ্ধতিও ভিন্ন হতে পারে। যেমনঃ

১. মাসজিদ কবরের উপর নির্মাণ করা হয়ে থাকলে তা ভেঙে গুঁড়িয়ে দিতে হবে এবং কবরের উপর কোনো নির্মাণ কাঠামো তৈরি করা হয়ে থাকলে সেটাও ভেঙে মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হবে। কারণ মৌলিকভাবেই এই মাসজিদটি একটি কবর এবং এটিকে তার পূর্বের অবস্থায় ফিরিয়ে নিতে হবে।

২. যে মাসজিদ নির্মাণ করার পর তার মধ্যে কবর দেওয়া হয়েছে, সেই মাসজিদকে অক্ষত রেখে এর ভেতর থেকে কবর সরিয়ে দিতে হবে। এক্ষেত্রে মাসজিদটি শুরু থেকেই একটি মাসজিদ যা মূলত কোনো কবর নয়। সুতরাং মাসজিদটিকে তার মৌলিক অবস্থায় ফিরিয়ে নিতে হবে।

নাবির কবর

মাদীনায় নাবি ﷺ এর মাসজিদে তাঁর কবর বিদ্যমান থাকার উপর ভিত্তি করে, অন্য কোনো মাসজিদে কারও কবর দেওয়া বা কবরের উপর মাসজিদ নির্মাণের সপক্ষে কোনো প্রমাণ গ্রহণ করা যাবে না। নাবি ﷺ নিজে মাসজিদের মধ্যে তাঁকে কবর দেওয়ার নির্দেশ দিয়ে যাননি, তাঁর সহাবিরাও মাসজিদের ভেতর তাঁর কবর দেননি। আবার পরবর্তী প্রজন্মের লোকজন নাবি ﷺ এর কবরের প্রতি অতিমাত্রায় ঝুঁকে পড়ার আশঙ্কায় সহাবিগণ তাঁকে স্থানীয় সাধারণ কোনো কবরস্থানে দাফন করেননি। গাফ্‌রার মুক্তিপ্রাপ্ত গোলাম উমার ﷺ বর্ণনা করেন যে, নাবি ﷺ কে কোথায় দাফন করা হবে সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য যখন সহাবিরা সমবেত হলেন, তখন একজন বললেন, "তিনি যেখানে সলাত আদায় করতেন, তাঁকে সেখানেই দাফন করা হোক।" উত্তরে আবু বাক্‌র ﷺ বললেন, "তাঁকে পূজার মূর্তিতে পরিণত

www.QuranerAlo.net

করা থেকে আল্লাহ আমাদেরকে রক্ষা করুন।" অন্যান্যরা বললেন, "তাঁকে আল-বাকি (মাদীনার একটি কবরস্থান) -তে দাফন করা হোক, যেখানে তাঁর মুহাজির ভাইদেরকে দাফন করা হয়েছে।" উত্তরে আবু-বাক্‌র বললেন:,

"নিশ্চয়ই নাবি ﷺ কে আল-বাকিতে দাফন করার প্রস্তাব খুবই অপছন্দনীয়, কারণ কিছু মানুষ তাঁর কাছে গিয়ে আশ্রয় কামনা করবে, অথচ তা কেবলমাত্র আল্লাহর অধিকার। তাই আমরা যদি রসূল ﷺ কে বাইরে দাফন করি, তবে তাঁর কবরকে আমরা যত সতর্কতার সাথেই পাহারা দিই না কেন, আমরা আল্লাহর অধিকার ক্ষুণ্ন করব।" তারপর তারা জিজ্ঞেস করলেন, "হে আবু বাক্‌র! আপনার মতামত কী?" তিনি উত্তরে বললেন, "আমি আল্লাহর রসূলকে বলতে শুনেছি,

আল্লাহ তাঁর প্রত্যেক নাবিকে যে স্থানে মৃত্যু দান করেছেন, সেখানেই তাদেরকে দাফন করা হয়েছে।"

তাদের অনেকেই তখন বলেন, "আল্লাহর কসম! আপনি যা বলেছেন তা সন্তোষজনক এবং বিশ্বাসযোগ্য।" তারপর তারা (আইশাহর ঘরে) নাবি ﷺ এর বিছানার চারপাশে দাগ দিলেন এবং তাঁর বিছানার স্থানে কবর খুঁড়লেন। আলি, আল-'আব্বাস, আল-ফাদ্‌ল ﷺ এবং নাবির পরিবার তাঁর মৃতদেহ নিয়ে গেলেন এবং দাফনের জন্য প্রস্তুত করলেন।[১০৮]

'আইশাহ ﷺ এর ঘর এবং মাসজিদের মধ্যে পার্থক্য ছিল একটি মাত্র দেওয়াল যাতে ছোট্ট একটি দরজা ছিল। নাবি ﷺ সলাত পরিচালনার জন্য সেই দরজা দিয়ে মাসজিদে প্রবেশ করতেন। নাবি এর দাফনের পর তাঁর কবর থেকে মাসজিদকে পুরোপুরিভাবে পৃথক করার জন্য সহাবিগণ সেই দরজাটি বন্ধ করে দেন। ফলে, কেবল মাসজিদের বাইরে থেকেই তখন নাবির কবর জিয়ারাত করা সম্ভব ছিল।

দ্বিতীয় খলিফা উমার এবং তৃতীয় খলিফা উসমান ﷺ এর সময়ে মাসজিদে নববী সম্প্রসারণ কাজ করা হয়। তবে তারা দু'জনেই আইশাহ কিংবা নাবি ﷺ এর অন্যান্য স্ত্রীদের ঘরকে মাসজিদের অন্তর্ভুক্ত করা থেকে সাবধানতার সাথে বিরত থেকেছিলেন। কারণ তাদের ঘরগুলোকে

(১০৮) ইব্‌ন যানজূইয়াহ্ কর্তৃক সংকলিত এবং আল-আলবানি কর্তৃক তাহযীর আস-সাজিদ, (Beirut: al-Maktab al-Islami, 2nd ed., 1972), পৃ. ১৩-৪ –এ উদ্ধৃত।

www.QuranerAlo.net

সম্প্রসারণের আওতায় আনলে স্বাভাবিকভাবেই নাবির কবরটিও মাসজিদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যেত। তবে মাদীনায় বসবাসকারী সকল সহাবির মৃত্যুর পর,[১০৯] খলিফা আল-ওয়ালিদ ইব্ন আব্দুল-মালিক (শাসনামল ৭০৫-৭১৫ সাল) সর্বপ্রথম মাসজিদকে পূর্বদিকে বর্ধিত করেন। তিনি আইশাহ ﵂ এর ঘরটিকে মাসজিদের অন্তর্ভুক্ত করলেও নাবি ﷺ এর অন্যান্য স্ত্রীদের ঘরগুলোকে ভেঙে দেন। এই সম্প্রসারণ কাজটি আল-ওয়ালিদের গভর্নর, উমার ইব্ন আব্দুল-আযীযের তত্ত্বাবধানে সম্পন্ন হয়েছিল বলে বর্ণিত রয়েছে।

আইশাহ ﵂ এর ঘরটিকে মাসজিদের অন্তর্ভুক্ত করার পর তার চারপাশে একটি উঁচু দেওয়াল নির্মাণ করা হয়েছিল যেন ঘরটিকে মাসজিদের ভেতর থেকে কোনোভাবেই না দেখা যায়। পরবর্তীতে উত্তর দিকের দুই কোণ থেকে আরও দুটি দেওয়াল এমনভাবে নির্মাণ করা হয়েছিল যেন দেওয়াল দুটি পূর্বের বৃত্তাকার দেওয়ালের সাথে মিলে একটি ত্রিভুজ তৈরি হয়। এর উদ্দেশ্য ছিল, কেউ যেন সরাসরি কবরের দিকে মুখ করতে না পারে।[১১০]

অনেক বছর পর, বর্তমানের সুপরিচিত গম্বুজটি মাসজিদের ছাদে সংযোজন করা হয়েছে, যা নাবি ﷺ এর কবরের ঠিক উপরেই স্থাপিত।[১১১] পরবর্তীতে কবরটিকে দরজা-জানালা বিশিষ্ট ব্রোঞ্জের তৈরি বেষ্টনী দিয়ে ঘিরে দেওয়া হয়েছে এবং সরাসরি কবরের দেওয়ালেই সবুজ কাপড় টাঙিয়ে ঢেকে দেওয়া হয়। কবরের চারপাশে এমন প্রতিবন্ধকতা স্থাপন করা সত্ত্বেও, ভুল এখনও রয়েই গেছে, যা সংশোধন করা দরকার। কবরটিকে মাসজিদ থেকে পৃথক করার জন্য আবারও দেওয়াল নির্মাণ করা উচিত, যেন কেউ সেটির দিকে মুখ করে সলাত আদায় করতে না পারে এবং মাসজিদের ভেতর থেকেও যেন কেউ সেটিকে জিয়ারাত করতে না পারে।

---

(১০৯) মাদীনায় মৃত্যুবরণকারী সর্বশেষ সহাবির নাম জাবির ইব্ন আব্দুল্লাহ। তিনি ৬৯৯ সালে খলিফা আব্দুল-মালিকের (শাসনামল ৬৮৫-৭০৫ সাল) সময়ে সেখানে মৃত্যুবরণ করেন।

(১১০) আল-কুরতুবি থেকে বর্ণিত এবং তাইসির আল-আযীয আল-হামীদ, পৃ. ৩২৪ —এ উদ্ধৃত।

(১১১) ১২৮২ সালে সুলতান কালাবূন আস-সালাহি সর্বপ্রথম নাবি ﷺ এর ঘরের উপর গম্বুজটি নির্মাণ করেন এবং ১৮৩৭ সালে সুলতান আব্দুল-হামীদের আদেশে সেটিকে সর্বপ্রথম সবুজ রং করা হয়। (Ali Hafiz, Chapters fromt the History of Madinah, Jeddah: al-Madinah Printing and Publication Co., 1st ed., 1987, পৃ. ৭৮-৯).

www.QuranerAlo.net

নাবি ﷺ-এর মাসজিদে সলাত আদায়

এই মাসজিদে সলাত আদায়ের বিশেষ মর্যাদা রয়েছে। নাবি ﷺ নিজেই তাঁর মাসজিদের বিশেষ মর্যাদার কথা উল্লেখ করে বলেছেন,

"তিনটি মাসজিদ ছাড়া অন্য কোনো মাসজিদে (সওয়াবের উদ্দেশ্যে) ভ্রমণ করবে না। আল-মাসজিদ আল-হারাম, আল-মাসজিদ আল-আক্সা এবং আমার এই মাসজিদ।"(১১২)

তিনি আরও বলেছেন,

"আমার এই মাসজিদের এক সলাত অন্য মাসজিদের ১০০০ সলাতের চেয়ে উত্তম, আল-মাসজিদ আল-হারাম ব্যতীত।"(১১৩)

এমনকি তিনি তাঁর মাসজিদের একটি নির্দিষ্ট অংশকে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ হিসেবে উল্লেখ করে বলেছেন,

"আমার ঘর এবং আমার মিম্বরের মধ্যবর্তী স্থানটুকু হলো জান্নাতের বাগানগুলোর একটি।"(১১৪)

নাবির মাসজিদে সলাত আদায় করা মাকরূহ হলে তাঁর মাসজিদের মর্যাদা বাতিল করে দেওয়া হতো এবং সেটিকে অন্য সাধারণ মাসজিদের সমান করে নেওয়া হতো। যেমন নির্দিষ্ট কিছু সময়ে সালাহ আদায় নিষিদ্ধ করা হলেও বিশেষ কারণে কিন্তু তা বৈধ। যেমন জানাযার সলাত। অনুরূপভাবে, ব্যতিক্রমধর্মী বৈশিষ্ট্য এবং মর্যাদার কারণে নাবি ﷺ এর মাসজিদে সলাত আদায় করাও মুস্তাহাব।(১১৫) অধিকন্তু, আল্লাহ না করুন! যদি আল-মাসজিদ

---

(১১২) আবু হুরায়রা ﷺ থকে বর্ণিত। বুখারি, (আরবি-ইংরেজি), খণ্ড ২, পৃ. ১৫৭, হাদীস নং ২৮১, মুসলিম, (ইংরেজি অনুবাদ), খণ্ড ২, পৃ. ৬৯৯, হাদীস নং ৩২১৮ এবং সুনান আবি দাউদ, (ইংরেজি অনুবাদ), খণ্ড ২, পৃ. ৬৯৯, হাদীস নং ৩২১৮।

(১১৩) বুখারি, (আরবি-ইংরেজি), খণ্ড ২, পৃ. ১৫৭, হাদীস নং ২৮২ এবং মুসলিম, (ইংরেজি অনুবাদ), খণ্ড ২, পৃ. ৬৯৭, হাদীস নং ৩২০৯।

(১১৪) বুখারি, (আরবি-ইংরেজি), খণ্ড ৩, পৃ. ৬১-২, হাদীস নং ১১২ এবং মুসলিম, (ইংরেজি অনুবাদ), খণ্ড ২, পৃ. ৬৯৬, হাদীস নং ৩২০৪।

(১১৫) তাহযীর আস-সাজিদ, পৃ. ১৯৬-২০০।

www.QuranerAlo.net

আল-হারাম কিংবা আল-মাসজিদ আল-আক্সাতেই কোনো কবর থাকত, তারপরও আল্লাহর দৃষ্টিতে এই স্থানগুলোর বিশেষ মর্যাদা এবং সম্মানের কারণে সেগুলোতে সলাত আদায় করা মুস্তাহাবই হতো।

www.QuranerAlo.net

শেষ কথা

আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য ঈমান অবশ্যই হতে হবে তাওহীদ ভিত্তিক, সকল ধরনের শির্ক থেকে মুক্ত ও মানসম্পন্ন। কুর'আন ও হাদীসে এমনটিই উল্লেখ করা হয়েছে। পূর্বের অধ্যায়গুলোতে বিষয়টি সবিস্তারে তুলে ধরা হয়েছে। আল্লাহর সাথে অংশীদার স্থাপনকারীরা যত দৃঢ়ভাবেই আল্লাহর প্রতি ঈমানের ঘোষণা দিক, কিংবা যত দক্ষতার সাথেই নিজেদের বাতিল কর্মকাণ্ডের পক্ষে যুক্তি দেখাক না কেন, উল্লিখিত মানদণ্ড থেকে সামান্যতম বিচ্যুতি ঘটলেই তা হবে কুফ্‌রি নয়তো পৌত্তলিকতা। আত্মিক, বুদ্ধিবৃত্তিক এবং ব্যবহারিক সকল অর্থে, মানব জীবনে প্রতিটি ক্ষেত্রে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য যা কিছু করা হয়, সবকিছুতেই অপরিহার্যভাবে 'আল্লাহর একত্ব' বজায় রাখতে হবে। আল্লাহর নাবিগণ স্রষ্টার যে একত্ব নিয়ে এসেছিলেন, তা কেবল দার্শনিক দৃষ্টিকোণ থেকে প্রশংসা পাওয়া কিংবা আবেগিভাবে সমর্থনের তত্ত্ব নয়; বরং তা হলো সর্বশক্তিমান স্রষ্টা, আল্লাহর ইচ্ছার কাছে আত্মসমর্পণের মাধ্যমে মানবজাতির টিকে থাকার বাস্তবিক রূপরেখা। মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্যের পেছনে এই তাৎপর্যপূর্ণ সত্যটিই নিহিত। আল্লাহ ﷻ বলেছেন,

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿٥٦﴾

"জিন এবং মানুষকে শুধুমাত্র আমার 'ইবাদাতের জন্যই সৃষ্টি করেছি।"

(আয-যারিয়াত, ৫১:৫৬)

যাই হোক, খোদ মানুষ সৃষ্টি করাই আল্লাহর অনুপম বৈশিষ্ট্য এবং গুণাবলির বহিঃপ্রকাশ। তিনি সৃষ্টিকর্তা (আল-খলিক্); তিনিই মানুষকে অনস্তিত্ব থেকে অস্তিত্বে এনেছেন। তিনি পরম করুণাময় (আর-রহ্‌মান); তাই তিনি মানুষকে পৃথিবীর সকল সুখ ভোগ করতে দিয়েছেন। তিনি সর্বজ্ঞানী (আল-হাকীম); তাই তিনি মানুষের জন্য ক্ষতিকর এমন সবকিছু মানুষের জন্য নিষিদ্ধ করেছেন এবং যা কিছু ক্ষতিকর নয়, তা বৈধ করেছেন। তিনি পরম ক্ষমাশীল (আল-গাফূর); তাই যারা বিশুদ্ধ অন্তর নিয়ে তাঁর

www.QuranerAlo.net

দিকে ফিরে আসে, তিনি তাদেরকে ক্ষমা করে দেন। আবু আইয়্যুব এবং আবু হুরায়রা ﷺ উভয়ে বর্ণনা করেন যে, নাবি ﷺ বলেছেন,

> "তোমরা যদি পাপ না করতে, তবে আল্লাহ তোমাদেরকে সরিয়ে দিয়ে এমন এক জাতিকে তোমাদের স্থলাভিষিক্ত করতেন, যারা পাপ করত এবং আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইতো এবং আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা করে দিতেন।"(১১৬)

অনুরূপভাবে, মানুষকে সৃষ্টি করার মধ্য দিয়ে স্রষ্টার অন্য সকল ঐশ্বরিক বৈশিষ্ট্য এবং গুণাবলি প্রকাশিত হয়।

পক্ষান্তরে, নিজের কল্যাণের জন্যই মানুষকে আল্লাহর 'ইবাদাত করতে হয়, কারণ আল্লাহর মানুষের 'ইবাদাতের কোনো প্রয়োজন নেই। স্রষ্টার 'ইবাদাত করার মাধ্যমে মানুষ পার্থিব এবং আত্মিক উভয় ধরনের কল্যাণ লাভ করে এবং সংক্ষিপ্ত পার্থিব যাত্রার শেষ গন্তব্যে গিয়ে লাভ করে পরম সুখের এক চিরন্তন আবাস। আল্লাহর দেওয়া জীবনাদর্শ, ইসলাম প্রতিটি মানবীয় কর্মকে—তা যত তুচ্ছ বা নগণ্যই মনে হোক না কেন—'ইবাদাত কর্মে পরিণত করার সুযোগ করে দিয়েছে। নিম্নোক্ত শর্ত দুটি পূরণ করে যে কাজই করা হোক না কেন, তা 'ইবাদাত কর্ম বলে গণ্য হবেঃ

১. কাজটি শুধুমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য করতে হবে, এবং

২. কাজটি আল্লাহর রসূলের সুন্নাহ অনুযায়ী করতে হবে।

জীবনের প্রতিটি কাজেই যদি এ শর্ত দুটি পূরণ করা হয়, তবে সমগ্র মানব জীবনই আল্লাহর 'ইবাদাতে পরিণত হয়। যেমনটি তিনি ﷻ নির্দেশ দিয়েছেন:

قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٦٢﴾

"বলুন, নিশ্চয়ই আমার সলাত, আমার কুরবানি, আমার জীবন ও আমার মৃত্যু আল্লাহর জন্য, যিনি সকল সৃষ্টির রব।" (আল আনআম; ৬:১৬২)

(১১৬) সহীহ মুসলিম, (ইংরেজি অনুবাদ), খণ্ড ৪, পৃ. ১৪৩৬-৭, হাদীস নং ৬৬২০-২২।

www.QuranerAlo.net

তবে তাওহীদের জ্ঞান এবং আল্লাহর রসূল মুহাম্মাদ ইব্‌ন আব্দুল্লাহ ﷺ এর শেখানো পদ্ধতি অনুযায়ী সেই জ্ঞানের বাস্তবায়নের মাধ্যমেই কেবল এই অবস্থায় উন্নীত হওয়া সম্ভব।

সুতরাং, এক আল্লাহর উপর আস্থা ও বিশ্বাস স্থাপনকারী প্রতিটি মু'মিনের কর্তব্য হলো, নিজের সাংস্কৃতিক অভিজ্ঞতা এবং পারিবারিক, গোত্রীয় কিংবা জাতীয় অনুভূতিকে প্রাধান্য না দিয়ে, আল্লাহর তাওহীদের ব্যবহারিক জ্ঞান অর্জন করা। কেননা তাওহীদই হলো ঈমানের ভিত্তি এবং কেবলমাত্র তাওহীদের জ্ঞানের বাস্তবিক প্রয়োগের মাধ্যমেই চিরন্তন পরিত্রাণ লাভ করা যেতে পারে।

www.QuranerAlo.net

গ্রন্থপঞ্জি

'আবদুল-ওয়াহ্হাব, সুলাইমান ইব্ন / তাইসীর আল-'আযীয আল-হামীদ, (বৈরুত: আল-মাকতাব আল-ইসলামি, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৭০)।

আলবানি, নাসির উদ-দীন আল- / সিলসিলাহ আল-আহাদীস্ আস্-সাহীহাহ, (কুয়েত, আদ-দার আস-সালাফীয়াহ ও আমান: আল-মাকতাবাহ আল-ইসলামিয়াহ, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৮৩), খণ্ড ৪।

———, / আহকাম আল-জানা'ইয, (বৈরুত: আল-মাকতাব আল-ইসলামি, প্রথম সংস্করণ, ১৯৬৯)।

———, / মুখতাসার আল-'উলূম, (বৈরুত: আল-মাকতাব আল-ইসলামি, প্রথম সংস্করণ, ১৯৮১)।

———, / সহীহ্ সুনান আত-তিরমিযি, (রিয়াদ: আরব ব্যুরো অব এডুকেশন ফর দ্যা গালফ স্টেটস, প্রথম সংস্করণ, ১৯৮৮)।

———, / তাহজীর আস-সাজিদ, (বৈরুত: আল-মাকতাব আল-ইসলামি, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৭২)।

'আলি, আ. ইউসুফ, / দ্যা হলি কুর'আন (অনুবাদ), (বৈরুত, দার আল-কুর'আন আল-কারীম)

আরবেরি, এ.জে., / মুসলিম সেইন্টস অ্যান্ড মিসটিকস, (লন্ডন: রুটলেজ অ্যান্ড কিগান পল, ১৯৭৬)।

আশ'আরি, আবুল-হাসান 'আলি আল, / মাকালাত আল-ইসলামিয়্যীন, (কায়রো: মাকতাবাহ আন-নাহদাহ আল-মিসরীয়্যাহ, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৬৯)।

আসকালানি, আহমাদ ইব্ন 'আলি ইব্ন হাজার আল-, / তাহজীব আত-তাহজীব, (হায়দ্রাবাদ, ১৩২৫-৭)

আশকার, 'উমার আল, / আল-'আকীদাহ ফি আল্লাহ, (কুয়েত: মাকতাবাহ আল-ফালাহ, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৭৯)

www.QuranerAlo.net

বাগদাদি, 'আবদুল-কাহির ইব্ন তাহির আল-, / আল-ফারক বাইন আল-ফিরাক, (বেরুত: দার আল-মা'রিফাহ)

বায়হাকি, আহমাদ ইব্ন আল-হুসাইন আল-, / কিতাব আল-আসমা' ওয়াস-সিফাত (বেরুত: দার আল-কুতুব আল-'ইলমিয়াহ, প্রথম সংস্করণ, ১৯৮৪)।

কোয়ান, জে.এম., / দ্যা হ্যান্স ওয়েহ্র ডিকশনারি অব মডার্ন রিটেন অ্যারাবিক, (নিউ ইয়র্ক: স্পোকেন ল্যাঙ্গুয়েজ সার্ভিসেস ইনস., তৃতীয় সংস্করণ, ১৯৭৬)।

এসিয়েন-উডম, ই.ইউ., / ব্ল্যাক ন্যাশনালিজম, (শিকাগো: ইউনিভার্সিটি অব শিকাগো প্রেস, ১৯৬২)

গুনাইমান, 'আবদুল্লাহ আল, / শারহ্ কিতাব আত-তাওহীদ মিন সহীহ আল-বুখারি, (মাদীনাহ: মাকতাবাহ আদ-দার, ১৯৫৩)

গিব, এইচ.এ.আর., / শর্টার এনসাইক্লোপিডিয়া অফ ইসলাম, (ইথাকা, নিউ ইয়র্ক: কর্নেল ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৫৩)।

হাফিজ, 'আলি, / চ্যাপ্টারস ফ্রম দ্যা হিসট্রি অব মাদিনা, (জেদ্দাহ: আল-মাদীনাহ প্রিন্টিং অ্যান্ড পাবলিকেশন কো., প্রথম সংস্করণ, ১৯৮৭)।

হাসান, আহমাদ, / সুনান আবি দাউদ, (ইংলিশ অনুবাদ), (লাহোর: শাইখ মুহাম্মাদ আশরাফ পাবলিশার্স, প্রথম সংস্করণ, ১৯৮৪)।

হিনেলস, জন, / ডিকশনারি অব রিলিজিয়নস, (ইংল্যান্ড: পেঙ্গুইন বুকস, ১৯৮৪)

হিচিং, ফ্র্যান্সেস, / দ্যা নেক অব দ্যা জিরাফ, (নিউ ইয়র্ক: টিকনর অ্যান্ড ফিল্ডস, ১৯৮২।

হলি বাইবেল, রিভাইজড স্ট্যান্ডার্ড ভার্শন (নেলসন, ১৯৫১)

হাজউঈরি, 'আলি ইব্ন 'উসমান আল-, / কাশফ আল-মাহজুব, নিকোলসন কর্তৃক অনূদিত, (লন্ডন: লুযাক, রেপ. ১৯৭৬)

www.QuranerAlo.net

ইব্ন আবিল-'এয আল-হানাফি, / শারহ আল-'আকীদাহ আত-তাহাউইয়াহ, (বেরুত: আল-মাকতাব আল-ইসলামি, অষ্টম সংস্করণ, ১৯৮৪)।

ইব্ন আসীর, / আন-নিহায়াহ ফি গারীব আল-হাদীস্ ওয়া আল-আসার, (বেরুত: আল-মাকতাবাহ আল-ইসলামিয়াহ, ১৯৬৩)।

ইব্ন আল-জাওযি, / সিফাহ আস্-সাফওয়াহ, (কায়রো: দার আল-ওয়া'ঈ, প্রথম সংস্করণ, ১৯৭০)।

ইব্ন হানবাল, আহমাদ, / আর-রাদ 'আলা আল-জাহমিয়াহ, (রিয়াদ: দার আল-লিওয়া, প্রথম সংস্করণ, ১৯৭৭)।

ইব্ন তায়মিয়্যাহ, আহমাদ, / আত-তাওয়াসসুল ওয়াল ওয়াসীলাহ, (রিয়াদ: দার আল-ইফতা, ১৯৮৪)

জনসন-ডেভিস, ডেনিস, / আন-নাওয়াউই'স ফরটি হাদীস্, (ইংলিশ অনুবাদ), দামাস্কাস, সিরিয়া: দ্যা হলি কোরান পাবলিশিং হাউজ, ১৯৭৬)।

খান, মুহাম্মাদ মুহসিন, / সহীহ আল-বুখারি, (অ্যারাবিক-ইংলিশ), (রিয়াদ: মাকতাবাহ আর-রিয়াদ আল-হাদীসাহ, ১৯৮১)

খোমেনি, আয়াতুল্লাহ মূসাভি আল-, / আল-হুকূমাহ আল-ইসলামিয়াহ, (বেরুত: আত-তালী'আহ প্রেস, অ্যারাবিক সংস্করণ, ১৯৭৯)

লেন, এডওয়ার্ড উইলিয়াম, / অ্যারাবিক-ইংলিশ লেক্সিকন (ক্যামব্রিজ, ইংল্যান্ড: ইসলামিক টেক্সটস সোসাইটি, ১৯৮৪)

মানজুর, মুহাম্মাদ ইবন, / লিসান আল-'আরাব, (বেরুত: দার সাদির)

মুহাম্মাদ এলিয়াহ, / আওয়ার স্যাভিয়র হ্যাজ অ্যারাইভড, (শিকাগো: মুহাম্মাদ'স টেম্পল অব ইসলাম নং.২, ১৯৭৪)।

মুযাফ্ফার, মুহাম্মাদ রিদা আল-, / ফেইথ অব শি'আ ইসলাম, (ইউএসএ: মুহাম্মাদি ট্রাস্ট অব গ্রেট ব্রিটেন অ্যান্ড নর্দার্ন আয়ারল্যান্ড, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৮৩)

www.QuranerAlo.net

ফিলিপস, আবু আমীনাহ বিলাল, / ইব্ন তায়মিয়্যাহ'স এসে অন দ্যা জিন, (রিয়াদ: তাওহীদ পাবলিকেশন, ১৯৮৯)।

রাহীমুদ্দিন, মুহাম্মাদ, / মুয়াত্তা ইমাম মালিক (ইংলিশ অনুবাদ), (লাহোর: শাইখ মুহাম্মাদ আশরাফ, ১৯৮০)

রিডার্স ডাইজেস্ট গ্রেট এনসাইক্লোপেডিয়া ডিকশনারি, (নিউ ইয়র্ক: ফাংক অ্যান্ড ওয়াগনালস পাবলিশিং কোম্পানি, দশম সংস্করণ, ১৯৭৫)।

রিসে, ডব্লিউ.এল., / ডিকশনারি অব ফিলসফি অ্যান্ড রিলিজিয়ন, (নিউ জার্সি: হিউম্যানিটিস প্রেস, ১৯৮০)।

রিযভি, সৈয়দ সা'ঈদ আখতার, / ইসলাম, (তেহরান: এ গ্রুপ অব মুসলিম ব্রাদার্স, ১৯৭৩)

শাহরাসতানি, মুহাম্মাদ ইব্ন 'আবদুল-কারীম আশ-, / আল-মিলাল ওয়ান-নিহাল, (বৈরুত: দার আল-মা'রিফাহ, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৭৫)

সিদ্দীকি, আবদুল হামীদ, / সহীহ মুসলিম, (ইংলিশ অনুবাদ), (লাহোর: শাইখ মুহাম্মাদ আশরাফ পাবলিশার্স, ১৯৮৭)

তাবারি, ইব্ন জারীর আত-, / জামি' আল-বায়ান 'আন তাও'উইল আল-কুর'আন, (ইজিপ্ট: আল-হালাবি পাবলিশিং কো., তৃতীয় সংস্করণ, ১৯৭৯)

উইলসন কলিন, / দ্যা অকাল্ট, (নিউ ইয়র্ক: র‍্যানডম হাউজ, ১৯৭১)।

যিরিকলি, খায়রুদ্দিন আয-, / আল-আ'লাম (বৈরুত: দার আল-'ইল্ম লিল-মালায়ীন, সপ্তম সংস্করণ, ১৯৮৪)।

www.QuranerAlo.net